প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীচঞ্চল ভাওয়াল, বি. এস-সি
প্রেস্টিজ প্রিন্টার্স
২, রামনাথ বিশ্বাস লেন,
কলিকাতা-৯

সূ চি প ত্র

রামায়ণ প্রসঙ্গে
৯
রামায়ণের সংক্ষিপ্ত কাহিনী
১১
রামায়ণ কাহিনী
১৬
রামায়ণের জানা-অজানা
১৩৪
রামায়ণ অভিধান
১৬৩
পরিশিষ্ট ১: ইক্ষ্বাকু বংশ
২৬২

রামায়ণ প্রসঙ্গে

রামায়ণ বিশ্বের আদি মহাকাব্য। ভগবান ব্রহ্মার নির্দেশে, এবং দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে রামের জীবন-বৃত্তান্ত শুনে, বিশ্বের আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি সংস্কৃত ভাষায় এই মহাকাব্যটি রচনা করেন। চব্বিশ হাজারেরও বেশি শ্লোকে, সপ্তকাণ্ডে লেখা হয়েছিল মূল রামায়ণ।

প্রাচীনত্বের দিক থেকে, রামায়ণ মহাভারতের অনেক আগেকার রচনা বলেই মনে হয়। যদিও, এ নিয়ে বিতর্ক আছে। আছে নানা রকম মত।

মার্কণ্ডেয় মুনি যুধিষ্ঠিরকে রামায়ণ শুনিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞেও বিভীষণ নিমন্ত্রিত ছিলেন। ভীমের সঙ্গে তাঁর অগ্রজ হনুমানের দেখা হয়েছিল। এ থেকে এটা পরিষ্কার, যে, রামায়ণ মহাভারতের আগে লেখা। কিন্তু, ঠিক কতদিন আগে লেখা, বিতর্কটা সেখানেই।

মূল সংস্কৃত থেকে বাংলায় কবি কৃত্তিবাস ওঝা যে অনুবাদ করেছেন, তাতে কিছু পরিবর্তন আছে। যেমন, তরণীসেনের প্রসঙ্গ বা রামের দুর্গোৎসবের প্রসঙ্গ মূল বাল্মীকি রামায়ণে নেই। কিন্তু, কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে।

তুলসীদাসের রামচরিতমানসের সঙ্গেও, মূল বাল্মীকি রামায়ণের কিছু কিছু পার্থক্য আছে। তবে, ভক্তিরসই সব রামকথার মূল সম্পদ।

রামায়ণ-মহাভারত যে যুগ যুগ ধরে সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়ে আসছে, তার কারণ, এই দুই মহাকাব্যের অন্তর্ধৃত আদর্শবাদ, কাহিনীর নিপুণ বিন্যাস, সুললিত ছন্দ, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

জনমদুখিনী সীতার কথা পড়তে পড়তে, আমাদের চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। পিতৃসত্য পালনে এবং প্রজাদের জন্য সীমাহীন স্বার্থত্যাগে রামের নিষ্ঠা আমাদেরকে বিস্মিত করে।

হনুমানের অসামান্য বীরত্ব এবং রাম-ভক্তি আমাদের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। লক্ষ্মণ এবং ভরতের ভ্রাতৃভক্তি এবং স্বার্থত্যাগ আমাদের কাছে অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

রাবণ এবং মেঘনাদের বীরত্বে আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু, রাবণের অহঙ্কার থেকে আমরা শিক্ষা নিই। সতর্ক হই।

সীতার অগ্নিপরীক্ষা, বিভীষণের ভূমিকা, বালীবধ, শম্বুকবধ ইত্যাদি নানা বিষয়ে আমরা তর্কে মেতে উঠি।

এই কালজয়ী মহাকাব্যের শেকড় ইতিহাসের পাতায় আছে, কি নেই, এ মহাকাব্য শুধুই কবির কল্পনার ডানায় ভর দিয়ে এতকাল উড়ে এসেছে, কি না, ইত্যাকার কঠিন বিতর্কে পণ্ডিতেরা চিরকালই মেতে উঠলেও, সাধারণ পাঠক সে বিতর্ককে পাশে সরিয়ে রেখে, আঁজলা ভরে অমৃত পান করেছেন। এই অমৃতকুম্ভ থেকে। তা সে

ভক্তিতেই হোক, বা ভালবাসাতেই হোক।

রামায়ণের রচনাকাল নিয়ে নানা মত। সমগ্র রামায়ণ বাল্মীকি একাই লিখেছেন কি না, প্রশ্ন উঠেছে সেই নিয়েও। তবে, 'উত্তরকাণ্ড' পরবর্তিকালে বাল্মীকির তুল্য প্রতিভাধর এক বা একাধিক কবির দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে বলেই মনে হয়। অর্থাৎ, বাল্মীকি সীতাকে দু' বার নয়, মাত্র একবারই, অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন! লঙ্কায়। রাবণবধের পরেই।

লঙ্কা থেকে রাম-সীতাকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে দিয়ে, রামকে সিংহাসনে বসিয়েই বাল্মীকি 'রামায়ণ' শেষ করেছেন। সীতাকে তিনি নির্বাসনে পাঠাননি। সে-কাণ্ড বাধিয়েছেন অন্য কেউ। বাল্মীকি নন।

এ মত যে প্রশ্নাতীত, তা মোটেই নয়। তবে, অনেকটাই যুক্তিগ্রাহ্য।

যুক্তি-তর্কের যুদ্ধে পণ্ডিতরা নামুন। আমরা বরং, অপার বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করি, কী প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বের এই আদিকাব্যকে যুগ যুগ ধরে অগণিত মানুষ মাথায় তুলে রেখেছেন।

এখানেই এই কালজয়ী মহাকাব্যের সার্থকতা। এখানেই এর শ্রেষ্ঠত্ব।

রামায়ণের সংক্ষিপ্ত কাহিনী

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠের জন্য যাঁরা মিনিট পনেরো-কুড়ির বেশি সময় বরাদ্দ করতে অপারক, অথবা, যাঁরা সমগ্র রামায়ণের মুল কাঠামোটিতে একবারটি চোখ বুলিয়ে নিয়ে রামায়ণের মূল কাহিনীর অন্দরমহলে ঢুকে পড়তে চান, এবং অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এসে, স্মৃতির জাবর কাটার সুবিধের জন্য, সেই মূল কাঠামোর ছবিটিকেই জিইয়ে রাখতে চান স্মৃতিপটে, তাঁদের কথা মাথায় রেখেই পরম শ্রদ্ধায় নিবেদিত হল এই অধ্যায়।

বালকাণ্ড

দেবর্ষি নারদ মহর্ষি বাল্মীকিকে শোনালেন ভগবান বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র জীবনকথা। ব্রহ্মার বরে কবিত্ব লাভ করলেন বাল্মীকি। শরবিদ্ধ পাখিকে দেখে, নিজের অজান্তেই, বাল্মীকির মুখ থেকে বেরিয়ে এল বিশ্বসাহিত্যের প্রথম শ্লোক।

বাল্মীকি দস্যু রত্নাকর থেকে মহামুনি হয়েছিলেন। এখন হলেন আদি কবি। ব্রহ্মার নির্দেশে রামের জীবনকাহিনী ' রামায়ণ' লিখে ফেললেন বাল্মীকি।

অযোধ্যার ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা দশরথের তিন রানি। কৌশল্যা, কৈকেয়ী আর সুমিত্রা। কোনও ছেলে নেই।

জামাই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির সাহায্যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেন দশরথ। চার ছেলে হল।

কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত, আর সুমিত্রার গর্ভে দুই যমজ ছেলে, লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্নের জন্ম হল।

একমাত্র মেয়ে শান্তাকে দশরথ দত্তক হিসেবে দিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু লোমপাদকে। লোমপাদ শান্তার বিয়ে দেন অপাপবিদ্ধ ব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে।

রাক্ষস মারীচ আর সুবাহুকে বধ করার জন্য রামকে নিয়ে যেতে, দশরথের রাজসভায় এলেন ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র। অনিচ্ছাসত্ত্বেও, বশিষ্ঠের পরামর্শে, সম্মতি দিলেন দশরথ। রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে চললেন বিশ্বামিত্র। পথে ভয়ঙ্কর তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করলেন রাম। বিশ্বামিত্রের আশ্রমে যজ্ঞে বাধা দিতে এসে, রামের বাণে ধরাশায়ী হলেন সুবাহু। মারীচ গিয়ে পড়লেন এক শো যোজন দূরের সমুদ্রে।

মিথিলায় ঢুকেই, গৌতম মুনির আশ্রমে শাপগ্রস্তা পাষাণী অহল্যাকে শাপমুক্ত করলেন রাম।

মিথিলার রাজা জনকের পালিতা মেয়ে সীতা। জনক ঘোষণা করলেন, যে 'হরধনু'-তে শর জুড়তে পারবে, তার গলায় সীতা মালা দেবে।

রাম ভাঙলেন সেই হরধনু। রামের গলায় মালা দিলেন সীতা। জনকের নিজের মেয়ে উর্মিলার সঙ্গে বিয়ে হল লক্ষ্মণের। জনকের ভাই কুশধ্বজের দুই মেয়ে মাণ্ডবী

আর শ্রুতকীর্তি মালা দিলেন যথাক্রমে ভরত আর শত্রুঘ্নের গলায়।

পরশুরামের দর্প ছিল, তাঁর 'বিষ্ণুধনু'তে কেউ জ্যা আরোপ করতে পারবে না। সে দর্প চূর্ণ করলেন রাম। সবাই মিলে ফিরে এলেন অযোধ্যায়। রাম অযোধ্যার সবার নয়নের মণি হয়ে উঠলেন।

অযোধ্যাকাণ্ড

দশরথের আদেশে, রামকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করার আয়োজন শুরু হল। কুব্জা দাসী মন্থরা কৈকেয়ীর মন বিষিয়ে দিল। দশরথের কাছে প্রাপ্য দুই বর চেয়ে নিলেন কৈকেয়ী। এক বরে, ভরতকে রাজা করতে হবে। দ্বিতীয় বরে, রামকে চোদ্দো বছরের জন্য বনবাসে যেতে হবে।

পিতৃসত্য পালনে রাম চললেন বনে। সঙ্গে চললেন সীতা আর লক্ষ্মণ। পুত্রশোকে প্রাণ ত্যাগ করলেন দশরথ।

ভরত আর শত্রুঘ্ন ছিলেন মামার বাড়িতে। ফিরে এসে, সব শুনে, রেগেই আগুন। চিত্রকূটে গিয়ে ভরত কেঁদে জড়িয়ে ধরলেন রামের দু'পা। রাম কিছুতেই ফিরতে রাজি হলেন না। রামের পাদুকা মাথায় নিয়ে এসে, অযোধ্যার সিংহাসনে বসিয়ে, রামের প্রতিনিধি হয়ে, রাজকার্য দেখা শোনা করতে লাগলেন ভরত।

অরণ্যকাণ্ড

দণ্ডকারণ্যে এলেন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা। রাক্ষস বিরাধকে বধ করলেন রাম। অগস্ত্য মুনির পরামর্শে, চললেন পঞ্চবটী। পথে দশরথের বন্ধু জটায়ুর সঙ্গে পরিচয় হল।

লঙ্কার রাক্ষস-রাজা রাবণের বিধবা বোন শূর্পণখা সুন্দরী নারীর রূপ ধরে এসে প্রথমে রামকে, তারপর লক্ষ্মণকে বিয়ে করতে চাইলেন। শূর্পণখার নাক আর কান কেটে দিলেন লক্ষ্মণ।

প্রতিশোধ নিতে, শূর্পণখা ছুটলেন দাদা রাবণের কাছে। রাবণের আদেশে, খর, দূষণ আর ত্রিশিরা নামের তিন রাক্ষস মহাবীর ছুটে এলেন পঞ্চবটীতে। তিনজনকেই যমালয়ে পাঠালেন রাম। রাক্ষস অকম্পনের পরামর্শে, সীতাকে অপহরণ করার চক্রান্ত করলেন রাবণ। মারীচকে মায়ামৃগের রূপ ধারণ করে পঞ্চবটীতে ঘুরে বেড়াতে আদেশ করলেন। রাবণের ফাঁদে কাজ হল। 'সোনার হরিণ চাই'—বায়না ধরলেন সীতা।

রাম চললেন হরিণকে ধরতে। মারীচ রামের গলা নকল করে আর্ত চিৎকার করলেন। রামের বিপদের আশঙ্কায় সীতা লক্ষ্মণকে পাঠালেন রামকে ফেরাতে। সেই সুযোগে সন্ন্যাসীর ভেক ধরে রাবণ এসে হরণ করলেন সীতাকে। লঙ্কায় নিয়ে চললেন। পুষ্পক রথে।

পথে জটায়ুর সঙ্গে রাবণের ঘোরতর লড়াই হল। রাবণ জটায়ুর ডানা কেটে দিলেন। রাম-লক্ষ্মণ সীতার খোঁজে বেরিয়ে মুমূর্ষু জটায়ুর কাছ থেকে সব শুনলেন।

শুরু হল পাগলের মতো সীতাকে খোঁজা। পথে কবন্ধকে বধ করলেন রাম। কবন্ধ

দিলেন সুগ্রীবের খবর।

পম্পা সরোবরের তীরে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে রামের প্রতীক্ষায় দিন গুনছিলেন বৃদ্ধা তাপসী শবরী। তাঁকে দেখা দিলেন রাম। তারপর চললেন সুগ্রীবের খোঁজে।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

বানররাজ সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল রামের। সুগ্রীব কথা দিলেন, সীতাকে খুঁজে বার করবেন। রাম কথা দিলেন, সুগ্রীবের দাদা বালীকে বধ করে, তাঁর কাছ থেকে রাজ্য আর সুগ্রীবের স্ত্রী রুমাকে আবার ফিরেয়ে দেবেন সুগ্রীবের কাছে। কথা রাখলেন রাম।

সুগ্রীব কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। লক্ষ্মণের ভয়ে শুরু করলেন জোরদার সীতা-অন্বেষণ। জটায়ুর দাদা সম্পাতির কাছ থেকে সীতার সুলুক-সন্ধান পেলেন বালীর ছেলে অঙ্গদ। ঠিক হল, হনুমান যাবেন লঙ্কায়।

সুন্দরকাণ্ড

মহেন্দ্র পর্বতের মাথা থেকে এক মহালাফ দিলেন মহাবীর হনুমান। এক লাফেই সাগরপার। এলেন লঙ্কায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর, সীতাকে দেখতে পেলেন অশোক বনে।

সীতাকে প্রণাম করে, রাম-নাম লেখা রামের আংটি সীতার হাতে তুলে দিলেন হনুমান। সীতাও আঁচল থেকে একটা গয়না বার করে হনুমানের হাতে দিলেন, রামকে দেওয়ার জন্য।

সীতাকে উদ্ধারের নিশ্চিত আশ্বাস দিয়ে হনুমান ফিরে এলেন। সীতার খবর পেয়ে অনেকটা আশ্বস্ত হলেন রাম-লক্ষ্মণ। বানররা আনন্দে হই-চই লাগিয়ে দিল।

লঙ্কাকাণ্ড (যুদ্ধকাণ্ড)

যুদ্ধযাত্রার তোড়জোড় শুরু করলেন রাম। এ দিকে, রাবণের ধর্মভীরু ভাই বিভীষণ সীতাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দিতে অনেক অনুরোধ করলেন দাদাকে। ব্যর্থ, অপমানিত হয়ে, বিভীষণ যোগ দিলেন রামের পক্ষে।

বানরদের ইঞ্জিনিয়ার নল বানর আর ভল্লুকদের সাহায্যে বড় বড় পাথরের চাঁই আর বড় বড় গাছ দিয়ে, সাগরের ওপর দিয়ে লঙ্কা পর্যন্ত সেতু তৈরি করে ফেললেন।

রাবণের দুই গুপ্তচর, শুক আর সারণ, রাবণকে গিয়ে সব খবর দিলেন।

সুগ্রীব দূর থেকে রাবণকে দেখতে পেয়েই, চড়-কিল-ঘুষিতে রাবণকে ব্যতিব্যস্ত করে আবার রামের কাছে ফিরে এলেন। অঙ্গদও একবার গিয়ে শাসিয়ে দিয়ে এলেন রাবণকে।

সাঙ্ঘাতিক যুদ্ধ করলেন রাবণের বীরপুত্র ইন্দ্রজিৎ। মেঘের আড়াল থেকে নাগপাশে অচেতন করে ফেললেন রাম-লক্ষ্মণকে। খবর পেয়ে, সাপের যম গরুড় ছুটে

এলেন সেখানে। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল সব সাপ। চেতনা ফিরে পেলেন রাম-লক্ষ্মণ।

রাম-লক্ষ্মণ আর বানরদের সঙ্গে যুদ্ধে একে একে প্রাণ হারালেন ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, প্রহস্ত ইত্যাদি রাক্ষস-পক্ষের রথী-মহারথীরা।

এবার রাবণ নিজেই চললেন যুদ্ধে। সঙ্গে চললেন, ইন্দ্রজিৎ, অতিকায়, মহোদর, কুম্ভ, নিকুম্ভ ইত্যাদি বীররা।

হনুমানের ঘুষিতে সংজ্ঞা হারালেন রাবণ। রাবণের শক্তিশেলে সংজ্ঞা লোপ হল লক্ষ্মণের। সেদিনের যুদ্ধে নাস্তানাবুদ হয়ে ফিরে গেলেন রাবণ।

রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণকে অসময়ে ঘুম থেকে টেনে তোলা হল। অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে রামের হাতে প্রাণ দিলেন কুম্ভকর্ণ।

পরদিন। এলেন ইন্দ্রজিৎ। তাঁর তীরে অচৈতন্য হলেন রাম-লক্ষ্মণ। জাম্ববানের আদেশে, হনুমান ঔষধিপর্বত থেকে মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী আর সন্ধানী—এই চার ওষুধের গাছ আনতে গেলেন। ওষুধের গাছ চিনতে না পারায়-হনুমান গোটা পর্বতটাই মাথায় করে নিয়ে এলেন। ওষুধের গন্ধে রাম-লক্ষ্মণসহ সব বানর-সেনা সংজ্ঞা ফিরে পেলেন।

বিভীষণের পরামর্শে, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ বধ করলেন অসহায় ইন্দ্রজিৎকে। এবার রাবণ নিজেই এলেন যুদ্ধে। তাঁর শক্তিশেলে লক্ষ্মণের বুক বিদীর্ণ হল। সবাই ভাবলেন, লক্ষ্মণ মারা গেছেন। কান্নায় ভেঙে পড়লেন রাম। বানরদের ডাক্তার সুষেণের পরামর্শে, হনুমান আবার সেই ঔষধির গন্ধমাদন পর্বতশৃঙ্গ তুলে নিয়ে এলেন। বেঁচে উঠলেন লক্ষ্মণ।

রাম-রাবণে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল। ইন্দ্র স্বর্গ থেকে রথ পাঠিয়ে দিলেন রামকে। রাম যত বার রাবণের মাথা কাটেন, তত বারই সেখানে আবার মাথা গজায়। তখন রাম ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। রাবণ প্রাণ হারালেন।

বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করা হল। সীতা রাবণের কাছে এতদিন ছিলেন বলে, রাম লোকনিন্দার ভয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিতে চাইলেন না। আগুনে আত্মাহুতি দিতে চাইলেন সীতা। কিন্তু, আগুন জ্বালতেই, স্বয়ং অগ্নিদেব সীতাকে কোলে করে রামের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, 'সীতা অপাপবিদ্ধা! শুদ্ধা! পবিত্রতাস্বরূপিণী!'

সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরলেন রাম আর লক্ষ্মণ। রাম রাজা হলেন। ভরত হলেন যুবরাজ। অযোধ্যায় আনন্দের বন্যা বয়ে গেল।

উত্তরকাণ্ড

সীতাকে নিয়ে কিছু দুষ্ট প্রজার কানাঘুষোর কথা রামের কানে এল। রাম লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন, সীতাকে তমসা নদীর তীরে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে রেখে আসতে।

বাল্মীকির আশ্রমে সীতার দুই যমজ ছেলে হল—কুশ আর লব।

অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন রাম।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ মতে, যজ্ঞের ঘোড়াটাকে আটকে রেখে একে একে হনুমান সহ, শত্রুঘ্ন, ভরত, লক্ষ্মণ, রাম সকলকে পরাস্ত করলেন বালক কুশ আর লব। বাল্মীকি মুনির মধ্যস্থতায় সবাইকে মুক্তি দেওয়া হল।

এ কাহিনী বাল্মীকি রামায়ণে নেই।

যজ্ঞক্ষেত্রে ঋষিবালকের বেশে লব-কুশ শোনালেন বাল্মীকি রচিত রামায়ণ। বাল্মীকি রামকে জানালেন লব-কুশ এবং সীতার কথা। সীতাকে আবার শুদ্ধতার পরীক্ষা দিতে বলা হল। দুঃখে, ক্ষোভে, মা বসুন্ধরার কোলে, পাতালে ফিরে গেলেন সীতা।

কালপুরুষের কৌশলে, রামকে দুর্বাসার আগমন-বার্তা দিতে গিয়ে, পূর্বশর্ত মতো লক্ষ্মণকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হল সরযূ নদীতে।

অনুতপ্ত, শোক-বিহ্বল রাম কুশকে কোশল, আর লবকে উত্তর দেশের রাজা করে দিয়ে, নিজেও প্রাণ বিসর্জন দিলেন। সরযূর জলে। ভরত আর শত্রুঘ্নও রামের পথই অনুসরণ করলেন। শেষ হল রামায়ণ কথা।

রামায়ণ কাহিনী

অল্প কথায় অনেক কাহিনী শোনানোই এ বইয়ের মূল উদ্দেশ্য। আর তাই, রামায়ণের মূল কাহিনী শোনাতে গিয়ে, কথক ঠাকুরকে মূল কাহিনীর প্রতিমা থেকে অনেক মেদ ছাঁটাই করতে হয়েছে। আর এই মেদ ছাঁটতে গিয়ে, মূলের শরীর থেকে রক্ত-মাংস বিশেষ কিছু খসে পড়েনি, এমনটাই কথক ঠাকুরের বিশ্বাস।

কথক ঠাকুর হলফ করে বলতে পারেন, মেদ ছাঁটতে গিয়ে রক্ত-মাংস খসে পড়ার মতো ঘটনা যাতে না ঘটে, সে বিষয়ে তিনি যৎপরোনাস্তি সতর্ক ছিলেন। তথাপিও, তা ঘটে থাকলে, তিনি গললগ্নীকৃতবাস হয়ে সবার কাছে মার্জনাপ্রার্থী।

বালকাণ্ড

দেবর্ষি এলেন মহর্ষির কাছে

দেবর্ষি নারদ এসেছেন মহর্ষি বাল্মীকির কাছে। দু'জনে নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলছেন।

এ কথা সে কথার পর বাল্মীকি বললেন, 'আচ্ছা দেবর্ষি, আপনার জানা মতো পৃথিবীতে এমন কেউ কি আছেন, রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, সততায়, নিষ্ঠায় যাঁর কোনও তুলনা নেই?'

নারদ বললেন, 'আছেন বই কী! খুব আছেন! তাঁর নাম রাম!'

বাল্মীকি বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে বললেন, 'রাম! রাম কে?'

নারদ বললেন, 'ও হরি! রামের নাম শোনোনি? রাম হলেন আমাদের দশরথের বড় ছেলে। ইক্ষ্বাকু বংশের 'অজ-র নাতি । আহা! ছেলের মতো ছেলে বটে । কী তাঁর রূপ! কী তাঁর গুণ! খুব ধার্মিক । আর খুব সত্যবাদী। কখনও কোনও মিথ্যে কথা বলেন না। আর বীরত্ব? তাঁর মতো বীর এ পৃথিবীতে আর দুটি নেই। আর কী বুদ্ধি!

'তবে হ্যাঁ, একবার রাগলে কিন্তু একেবারে অগ্নিশর্মা। আবার ক্ষমাও করতে পারেন খুব। একেবারে পৃথিবীর মতো।'

নারদ বাল্মীকিকে শোনালেন রামের জীবন-কাহিনী। বাল্মীকি তো শুনে মহা খুশি। নারদও খুশি হয়ে ফিরে গেলেন স্বর্গে।

সৃষ্টি হল রামায়ণ

নারদ বিদায় নেওয়ার পর, শিষ্য ভরদ্বাজকে নিয়ে বাল্মীকি চললেন তমসা নদীতে। স্নান করতে।

যেতে যেতে একটা গাছের ওপর দুটো 'ক্রৌঞ্চ' পাখিকে (কোঁচ বক) দেখতে পেলেন বাল্মীকি। পাখি দুটো নিজেদের মধ্যে খেলা করছিল। কামাসক্ত হয়ে, পরস্পর পরস্পরকে বেঁধেছিল প্রেমের দৃঢ় বাঁধনে।

ভারী সুন্দর সে দৃশ্য!

হঠাৎ, কোথা থেকে একটা তীর ছুটে এল। দুটো পাখির মধ্যে পুরুষ পাখিটার (ক্রৌঞ্চ) গায়ে লাগল সে তীর। আহত পাখিটি পড়ে গেল মাটিতে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। স্ত্রী পাখিটা (ক্রৌঞ্চী) খুব কাঁদতে লাগল।

পাখি দুটো ছিল স্বামী-স্ত্রী। তাদের নিবিড় ভালবাসার বাঁধন ছিন্নভিন্ন করে দিল ব্যাধের তীর।

ক্রৌঞ্চীর কান্নায় ভারী হয়ে উঠল বনের বাতাস।

এক ব্যাধ ছুটে এল কোথা থেকে। তীরে-বেঁধা পাখিটাকে নিতে এসেছে সে। তাকে দেখে, রাগে, দুঃখে, বাল্মীকি নিজের অজান্তে বলে ফেললেন—

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥'

অর্থাৎ—

'তোর ভাল হবে না কখনও
ওরে ব্যাধ! শোন বলি তোরে!
দুটো পাখি করছিল খেলা
একটার প্রাণ নিলি তীরে?'

কথাগুলো বলেই, চমকে উঠলেন বাল্মীকি! 'এ আমি কী বললাম! এ যে ছন্দে ভরা! এ যে কবিতা!'

হ্যাঁ। ঠিকই তাই। বাল্মীকি সৃষ্টি করলেন বিশ্বের প্রথম শ্লোক। প্রথম কবিতা।

আশ্রমে ফিরে, ধ্যানে বসলেন বিশ্বের প্রথম কবি। বাল্মীকি। ব্রহ্মা এসে দেখা দিলেন তাঁকে। বললেন, 'বাল্মীকি! এই যে ছন্দ তুমি পেলে, এ আমারই ছন্দ। এই ছন্দ আর কবিত্ব শক্তি নিয়ে তুমি রামের কথা লেখো। সে লেখা মানুষ পড়বে যুগ যুগ ধরে। তোমাকে আর তোমার লেখাকে তারা চিরকাল মাথায় তুলে রাখবে।'

বাল্মীকি লিখলেন রামের জীবনচরিত—'রামায়ণ'।

রামায়ণই হয়ে রইল বিশ্বের আদি মহাকাব্য। আর বাল্মীকির মাথায় উঠে এল 'আদি কবি'-র শিরোপা।

বাল্মীকি নারদের মুখে যা শুনেছিলেন, তা-ই লিখে ফেললেন। নারদ যা বলেননি, তা জেনে নিলেন ধ্যানে। ছন্দের সুতো দিয়ে, কথার পর কথা গেঁথে, সৃষ্টি করলেন রামায়ণ।

রামের দুই ছেলে লব আর কুশ তখন বাল্মীকির কাছেই মানুষ হচ্ছে। একদিন। বাল্মীকি বসে ভাবছেন, কীভাবে রামায়ণ প্রচার করবেন। ঠিক তখনই, লব আর কুশ এসে প্রণাম করল তাঁকে। বাল্মীকি উপায় খুঁজে পেলেন। লব আর কুশকে রামায়ণ গান শেখালেন।

রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে নেমন্তন্ন পেয়ে বাল্মীকি লব আর কুশকে নিয়ে গেলেন অযোধ্যায়। সেখানে দু'ভাই রামায়ণ গান গেয়ে বেড়াতে লাগল। অযোধ্যার পথে

পথে।

রাম দু'ভাইকে আদর করে নিয়ে এলেন। নিজের যজ্ঞ-সভায়। সেখানে দু'ভাই রোজ একটু একটু করে গেয়ে শোনাতে লাগল। রামায়ণ।

রাম তো শুনে মুগ্ধ! রাম কিন্তু তখনও জানেনই না, যে, লব আর কুশ তাঁরই ছেলে। জেনেছিলেন। পরে। কী ভাবে জেনেছিলেন, সে কথা আমরা পরে বলব।

রামের যজ্ঞ-সভায় লব আর কুশ যে 'রাম-কথা' গান করে শুনিয়ে, সবার মন জয় করে নিয়েছিল, তা-ই আমরা এখন বলছি। রামের সেই পবিত্র জীবনকথাই 'রামায়ণ'। শুরু হল সেই অমৃত কথা।

রাজা দশরথ

রাজা দশরথ ছিলেন উত্তর কোশলের রাজা। অযোধ্যা ছিল উত্তর কোশলের রাজধানী। সরযূ নদীর ধারে মনু নিজের হাতে করে তৈরি করেছিলেন এই অসামান্য সুন্দর নগরী। অযোধ্যা।

দশরথের বাবা ছিলেন অজ। অজ-র বাবা রঘু। রঘুর বাবা দিলীপ। এঁরা সবাই ছিলেন ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা। ইক্ষ্বাকু ছিলেন সূর্যের নাতি। সে হিসেবে এঁরা সকলেই সূর্যের বংশধর।

রাজা দশরথ ছিলেন খুব ধার্মিক আর বীর। তাঁর রথ দশ দিকে ছুটত বলেই, তাঁর নাম হয়েছিল 'দশরথ'।

(কিন্তু, সে তো অনেক পরের কথা। বড় হওয়ার পর। জন্মেই তো আর তাঁর রথ তিনি দশ দিকে ছোটাননি! তা হলে? তা হলে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই 'দশরথ' হলেন কী করে? প্রশ্ন উঠতেই পারে।)

প্রজারা তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত । দেবতারাও শ্রদ্ধা করতেন।

রাজার তিন রানি। কৌশল্যা, কৈকেয়ী আর সুমিত্রা । কিন্তু কোনও ছেলে ছিল না। তাই দশরথের মনে খুব দুঃখ ছিল।

অশ্বমেধ আর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ

মন্ত্রী আর পুরোহিতদের সঙ্গে পরামর্শ করে দশরথ ঠিক করলেন , তিনি 'অশ্বমেধ' আর 'পুত্রেষ্টি' যজ্ঞ করবেন।

আগেকার দিনে অনেক রাজাই এ রকম 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' করতেন। একটা বেশ তেজী শক্তিশালী ঘোড়াকে ছেড়ে দেওয়া হত। ঘোড়া তার ইচ্ছে মতো নানা দেশ ঘুরে বেড়াত। ঘোড়ার পেছন পেছন চলত রাজার সেনাবাহিনী।

ঘোড়া যখন যে দেশে যেত, সেই দেশের রাজা যদি ঘোড়াকে বাধা দিতেন, তা হলে, যুদ্ধ করে তাঁকে হারাতে হত। সে দেশের রাজা বিনা বাধায় ঘোড়াকে তাঁর দেশের ওপর দিয়ে চলে যেতে দিলে, ধরে নেওয়া হত, যে, তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞকারী রাজার বশ্যতা স্বীকার করেছেন।

এ ভাবে, এক বছর পর আবার ঘোড়া ফিরে আসত যজ্ঞকারী রাজার কাছে। তখন

সে-ঘোড়াকে বলি দেওয়া হত। আর ঘোড়ার দেহটাকে যজ্ঞের আগুনে উৎসর্গ করা হত।

'পুত্রেষ্টি যজ্ঞ' করা হত পুত্রলাভের কামনা করে। অনেক রাজাই করতেন এ যজ্ঞ।

দশরথের 'শান্তা' নামে এক মেয়ে ছিল। ছোট বেলাতেই, শান্তাকে তিনি দত্তক হিসেবে দিয়েছিলেন। তাঁর বন্ধু অঙ্গরাজ লোমপাদ-কে।

একবার অঙ্গদেশে খুব অনাবৃষ্টি হওয়ায়, খরা আর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তখন লোমপাদ, সবার পরামর্শে, কশ্যপ মুনির নাতি আর বিভাণ্ডক মুনির ছেলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে, অনেক কৌশলে, নিজের রাজ্যে আনিয়ে এক যজ্ঞ করান। ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গরাজ্যে পা দিতেই, শুরু হল প্রবল বর্ষণ।

লোমপাদ তো মহাখুশি । খুশি তাঁর প্রজারাও। পালিতা মেয়ে শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গের হাতে তুলে দিলেন লোমপাদ।

দশরথও জামাই ঋষ্যশৃঙ্গকে আনালেন তাঁর যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত হিসেবে।

কৌশল্যা স্বয়ং যজ্ঞের ঘোড়াকে তিন কোপে বলি দিলেন। তারপর, তখনকার নিয়ম মতো, এক রাত কাটালেন সেই ঘোড়ার শবের পাশে শুয়ে।

দেবতারাও দেখছিলেন সে যজ্ঞ। তাঁরা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন, 'ভগবান! আপনার বরে অমর হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণ আমাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে। আপনি এর একটা বিহিত করুন'।

ব্রহ্মা বললেন, 'আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি রাবণবধের ব্যবস্থা করছি। রাবণ আমার কাছে গন্ধর্ব, যক্ষ আর রাক্ষসের কাছে অবধ্য থাকার বর চেয়েছিল। আমিও তাকে সেই বরই দিয়েছি। মানুষকে অতিশয় তুচ্ছ জ্ঞান করে রাবণ মানুষের নামও উচ্চারণ করেনি। তা, এবার মানুষই তাকে সংহার করবে। তবে যে-সে মানুষ নয়। স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুই মানুষের রূপ ধরে দশরথের চার ছেলে হয়ে জন্মাবেন।'

যজ্ঞের পায়েস ভাগ

যজ্ঞ শেষে, যজ্ঞের আগুন থেকে বেরিয়ে এলেন এক মহাশক্তিমান পুরুষ। তাঁর হাতে সোনার এক পাত্র। তার ওপর রুপোর এক ঢাকা।

সে পাত্রে ছিল 'দিব্য-পায়েস'। মানে, বিশেষ দৈব শক্তিসম্পন্ন স্বর্গীয় পায়েস। সেই দিব্য-পুরুষ সে পায়েসের পাত্র দিলেন দশরথের হাতে। বললেন, 'পায়েস তোমার তিন রানির মধ্যে ভাগ করে দাও।'

দশরথ মোট পায়েসকে সমান দু'ভাগে ভাগ করলেন। এক ভাগ দিলেন বড় রানি কৌশল্যাকে। বাকি অর্ধেককে আবার সমান দু'ভাগে ভাগ করলেন। এক ভাগ দিলেন ছোট রানি সুমিত্রাকে। বাকি পায়েসটাকে আবার সমান দু'ভাগে ভাগ করলেন। এক ভাগ দিলেন মেজ রানি কৈকেয়ীকে। আর বাকি ভাগটা দিলেন সুমিত্রাকে।

অঙ্ক কষলে দেখা যাবে , এতে করে, কৌশল্যা পেলেন 'মোট পায়েসের ১/২ অংশ', কৈকেয়ী পেলেন 'মোট পায়েসের ১/৮ অংশ' আর সুমিত্রা পেলেন 'মোট পায়েসের ৩/৮ অংশ'।

মানে, পাত্রে যদি মোট ৮ হাতা পায়েস থেকে থাকে, তা হলে, কৌশল্যা পেলেন

'৪ হাতা', কৈকেয়ী '১ হাতা' আর সুমিত্রা '৩ হাতা'।

[পায়েস ভাগ নিয়ে অন্য মতও আছে। আমরা গল্প শুনতে বসে অঙ্ক কষতে চাই না। তাই এখানে তার মধ্যে যাব না। তবে এই গ্রন্থেরই 'রামায়ণের জানা-অজানা' পরিচ্ছেদে ৩৬ নং দফায় ('যজ্ঞের পায়েস কে কতটা পেয়েছিলেন?') আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত করেছি।]

জন্ম নিলেন রাম-ভরত-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন

তিন রানি দিব্য-পায়েস খেলেন। দেবতাদের কথা মতো, ভগবান বিষ্ণু নিজেকে চার ভাগে ভাগ করে জন্ম নিলেন তিন রানির কোলে।

চৈত্র মাসের শুক্লা-নবমী তিথিতে, পুনর্বসু নক্ষত্রযোগে, সৌর বৈশাখ মাসে, দিনের আলোয়, মা কৌশল্যার কোল আলো করে এলেন ভগবান বিষ্ণুর অংশ-অবতার রাম। রামের জন্ম কর্কট লগ্নে। রবি তখন মেষে। চন্দ্র আর বৃহস্পতি কর্কটে। মঙ্গল মকরে। শুক্র মীনে। আর শনি তুলাতে।

পরের দিন। মা কৈকেয়ীর কোলে এলেন বিষ্ণুর আর এক অংশ-অবতার ভরত।

তার পরের দিন। মা সুমিত্রা জন্ম দিলেন দুই যমজ ছেলের । লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন। এঁরাও বিষ্ণুর অংশ-অবতার।

অপুত্রক রাজা দশরথ এক সঙ্গে চার ছেলেকে পেয়ে, আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলেন। খুশির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিল অযোধ্যা। উৎসবে মেতে উঠলেন রাজা-প্রজা।

বড় হল চার ভাই

দেখতে দেখতে রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন চার ভাই বড় হয়ে উঠল। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে তীর ছোড়াতেও তারা খুবই পারদর্শী হয়ে উঠল।

চার ভাই-এর মধ্যে, আবার লক্ষ্মণ সব সময়, বয়সে মাত্র দু'দিনের বড় দাদা, রামের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত। ঠিক যেন রামের ছায়া। তেমনি শত্রুঘ্নও, বয়সে মাত্র এক দিনের বড় দাদা, ভরতের ছায়ার মতো হয়ে ভরতের সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে থাকত।

চার ভাই-এর অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষতার কথা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। বিশেষ করে, রামের কথা। তার তো তুলনাই নেই।

বিশ্বামিত্র এলেন রামকে নিতে

একদিন। মহারাজ দশরথ মন্ত্রী আর পুরোহিতদের নিয়ে রাজসভায় বসে আলোচনা করছিলেন। ছেলেরা বড় হচ্ছে। এবার তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হয়।

বড় মানে? কত বড়?

কেউ বলেন, ষোলো বছরের মতো বয়স ছিল তখন রাজকুমারদের। কেউ বলেন, বারো পার হয়ে তেরো চলছে। আমরা, নানা কারণে, তেরোকেই গ্রহণ করছি।

রাজা তো আলোচনা করছেন। এমন সময় খবর এল, মহামুনি বিশ্বামিত্র এসেছেন। রাজদর্শনে।

আগেকার দিনে মুনি-ঋষিরা প্রায়ই যেতেন রাজদর্শনে। রাজার বাড়িতে কিছুদিন থাকতেন। রাজাকে আশীর্বাদ করে আবার অন্য কোথাও চলে যেতেন। রাজারাও, মুনি-ঋষিদের সেবা করে, তাঁদের কাছ থেকে বর আর আশীর্বাদ চেয়ে নিতেন।

দশরথ ভাবলেন, তেমনই রাজদর্শনে এসেছেন ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র। এই আসার পেছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই।

'মহামুনি বিশ্বামিত্র এসেছেন!'

ছুটে গেলেন দশরথ। মুনির পাদবন্দনা করে বললেন, 'আপনি এসেছেন! আমার কী সৌভাগ্য! বলুন কী আদেশ আমাকে পালন করতে হবে? আপনি যা আদেশ করবেন , আমি খুশি হয়ে তা-ই পালন করব।'

দশরথের কথায় খুশি হয়ে, বিশ্বামিত্র বললেন, 'মহারাজ! আমি এক যজ্ঞ শুরু করেছি। কিন্তু, মারীচ আর সুবাহু নামে দুই হতভাগা রাক্ষস যজ্ঞ বার বার পণ্ড করে দিচ্ছে। যজ্ঞের বেদির ওপর তারা রক্ত-মাংস ছিটিয়ে দিচ্ছে। যা নয়, তা-ই করছে।

'আমি তাদের শাপ দিতে পারতাম। কিন্তু, যজ্ঞের সময় শাপ দিতে নেই। তাই মুখ বুজে সব সহ্য করতে হচ্ছে।'

দশরথ জোড়-হাত করে বললেন , 'আমাকে আপনি কী করতে বলেন মুনিবর?'

বিশ্বামিত্র বললেন, 'আমি রামকে চাই।'

'রামকে!' যেন বজ্রাহত হলেন দশরথ।

'হ্যাঁ। রামকে।' বললেন বিশ্বামিত্র। 'বেশি নয়। মাত্র দশ রাতের জন্য। সে-ই পারবে রাক্ষসদের সমূলে বিনাশ করতে।'

দশরথ হাতজোড় করে বললেন, 'কিন্তু রাম যে আমার নিতান্তই বালক! যুদ্ধ-টুদ্ধ কখনও করেনি! রাক্ষসরা সব ভয়ঙ্কর যোদ্ধা! রাম একা তাদের সঙ্গে পারবে কেন? বরং আদেশ করেন, তো, আমি যাই।

'আর দেখুন, আমার ষাট হাজার বছর বয়স হয়েছে।

(তখনকার বছরের মাপ কত বড় ছিল? আমরা জানি না। তবে অনুমান করতে পারি, যে, খুবই ছোট ছিল। এখনকার মাপে, ষাট হাজার বছর বাঁচার প্রশ্নই ওঠে না।)

'অনেক সাধনা করে এই ছেলেদের পেয়েছি। চার ছেলেকে পেয়েছি। চার ছেলের মধ্যে আবার রামই আমার সবচেয়ে প্রিয়।'

বিশ্বামিত্র প্রচণ্ড রেগে গেলেন। বললেন 'ছিঃ! প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখন ফিরে যাচ্ছেন?'

দশরথের কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে ভালই চিনতেন। রাজাকে বললেন, 'মহারাজ! ইনি যা বলছেন, তা-ই করুন। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে আপনার। আর তা ছাড়া রামকে আপনি নির্ভয়ে এঁর সঙ্গে ছেড়ে দিতে পারেন।'

বশিষ্ঠের কথায় রামকে ডেকে পাঠালেন দশরথ। রাম তো আর একা আসতে পারেন না! সঙ্গে তাঁর ছায়া লক্ষ্মণ থাকবেনই।

সবার আর্শীবাদ মাথায় নিয়ে বিশ্বামিত্রের পেছন পেছন তীর-ধনুক আর খড়্গ হাতে চললেন দু'ভাই।

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে চললেন দু'ভাই

বিশ্বামিত্রের পেছন পেছন দু'ভাই এসে পৌঁছলেন সরযূর দক্ষিণ তীরে। সেখানে পৌঁছেই, রামকে 'বলা' আর 'অতিবলা' নামে দুটো মহাশক্তিশালী মন্ত্র শেখালেন বিশ্বামিত্র।

এই মন্ত্র জানা থাকলে, রাক্ষসরা কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। কোনও রোগ হবে না। খিদে পেলেই, খাবার চলে আসবে। রূপযৌবন অটুট থাকবে। এ এক অদ্ভুত মন্ত্র।

সে-রাত সরযূর তীরেই কাটিয়ে, তাঁরা আবার হাঁটতে শুরু করলেন। হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছলেন জাহ্নবী আর সরযূ যেখানে এসে মিলেছে, সেখানে। সেখানে কন্দর্পের আশ্রমে রাত কাটিয়ে, পর দিন নৌকায় গঙ্গা পার হলেন।

তাড়কা-বধ

পথ চলতে চলতে, এক গভীর বনে এসে পড়লেন সবাই।

রাম জিগ্গেস করলেন , 'এ কোন জায়গায় আমরা এলাম মুনিবর?'

বিশ্বামিত্র বললেন, 'এখানে আগে মলদ আর করূষ নামে দুটো জনপদ ছিল। তাড়কা সে-সব ধ্বংস করে দিয়েছে। তাই এখন শহরের বদলে বন দেখতে পাচ্ছ।'

রাম কৌতূহলী হলেন। বললেন, 'তাড়কা? তাড়কা কে মুনিবর?'

বিশ্বামিত্র বললেন, 'তাড়কা হল এক ভয়ঙ্কর রাক্ষসী। তার বাবা সুকেতু ব্রহ্মার আরাধনা করে তাকে পেয়েছে। ব্রহ্মার বরে তাড়কা এক হাজার হাতির শক্তি পেয়েছে। জম্ভের ছেলে সুন্দ হল তার স্বামী। আর মারীচ তার ছেলে।

'কোনও কারণে সুন্দকে শাপ দিয়ে মেরে ফেলেন অগস্ত্য। তখন অগস্ত্যকে খেতে যায় তাড়কা আর মারীচ। অগস্ত্যের শাপে তখন মা আর ছেলে রাক্ষসী আর রাক্ষস হয়ে গেল।'

'আগে তা হলে এরা রাক্ষস ছিল না?' রাম জানতে চান।

বিশ্বামিত্র বললেন, 'না। আগে এরা ছিল যক্ষ। তুমি এই তাড়কাকে বধ করো রাম।'

রামের ধনুকের টঙ্কার শুনে গর্জন করতে করতে ধেয়ে এল তাড়কা। ধুলো উড়িয়ে, চারদিক অন্ধকার করে, আকাশ থেকে বড় বড় পাথর ছুড়তে লাগল। কখনও বা নানা রূপ দেখিয়ে ভয় দেখায়। কখনও বা অদৃশ্য হয়।

স্ত্রী-হত্যা হবে বলে রাম প্রথমে তাড়কাকে মারতে চাননি।

বিশ্বামিত্র বললেন, 'মানুষের কল্যাণের জন্য একে বধ করো।'

রামের তীরে বিদীর্ণ হল রাক্ষসী তাড়কার বুক।

রামকে অস্ত্র দিলেন বিশ্বামিত্র

সে রাত তাঁরা ওই বনেই কাটালেন।

পরদিন।

বিশ্বামিত্র খুঁশি হয়ে রামকে নানা দিব্য অস্ত্র দিলেন। দণ্ডচক্র, বিষ্ণুচক্র, বজ্র, শৈব-

শূল , বারুণ-পাশ, বায়ব্যাস্ত্র, বর্ষণাস্ত্র, শোষণাস্ত্র ইত্যাদি নানা অস্ত্র হাত জোড় করে এসে রামের সামনে দাঁড়াল। রাম তাদের হাত ছুঁয়ে বললেন, 'যখন ডাকব, তখন তোমরা এসো। এখন যাও।'

ছুড়ে দেওয়া অস্ত্রদের কীভাবে আবার ফিরিয়ে আনা যায়, তাও রামকে শেখালেন বিশ্বামিত্র।

নির্বিঘ্নে যজ্ঞ শেষ করলেন বিশ্বামিত্র

দূরে পাহাড়ের কোলে ঘন মেঘের মতো এক বন দেখা দিল।

বিশ্বামিত্র বললেন, 'ওই হল সিদ্ধাশ্রম। ওখানেই আমি থাকি। ভগবান বিষ্ণু দানবরাজ বলিকে জব্দ করতে বামনরূপ ধরে এখানে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাই এই আশ্রমের নাম সিদ্ধাশ্রম।'

বিশ্বামিত্র শুভ সময় দেখে শুরু করলেন তাঁর যজ্ঞ। মারীচ আর সুবাহু তাদের যত সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এসে হামলা শুরু করল। রক্তের বন্যা বইয়ে দিল যজ্ঞের বেদিতে।

রাম 'মানবাস্ত্র' ছুড়ে মারলেন মারীচের বুকে। মারীচ ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়ল এক শো যোজন (মানে, প্রায় ৮০০ মাইল) দূরের সমুদ্রে।

রাম মারীচকে প্রাণেই মেরে ফেলতে পারতেন। কিন্তু সদ্য মা-হারা ছেলেকে প্রাণে মারতে তাঁর মায়া হল।

এর পর রাম 'আগ্নেয়াস্ত্র' (এখনকার গ্রেনেড জাতীয় কোনও অস্ত্র হবে হয়তো) ছুড়ে সুবাহুকে মেরে ফেললেন। আর 'বায়ব্যাস্ত্র' ছুড়ে বাদবাকি রাক্ষসদের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন।

নির্বিঘ্নে যজ্ঞ শেষ করতে পারায়, রামকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন বিশ্বামিত্র।

মিথিলার পথে

সে রাত তাঁরা সিদ্ধাশ্রমেই কাটালেন। সকালে রাম-লক্ষ্মণ এসে বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করে বললেন, 'মুনিবর! আমরা আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত । বলুন। কী আদেশ আমাদের পালন করতে হবে?'

বিশ্বামিত্র সস্নেহে দুই বালকের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'এবার আমরা মিথিলায় যাব।'

দু' ভাই কৌতূহলী হন, 'মিথিলায়! মিথিলায় কেন?'

বিশ্বামিত্র তপোবলে ভূত-ভবিষ্যৎ সব জানতেন। স্মিত হেসে বললেন, 'জনক রাজা সেখানে এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। সবাই যাচ্ছেন সেখানে। আমরাও যাব। সেখানে জনকরাজার কাছে এক বিশাল ধনু আছে। শিবের ধনু বলে তাকে সবাই 'হরধনু' বলে। এর আসল নাম হল 'সুনাভ'।

কুমারদের আগ্রহ দেখে বিশ্বামিত্র আরও বললেন, 'দক্ষযজ্ঞের সময় যজ্ঞ-ভাগ না পাওয়াতে, এই হরধনু দিয়েই দেবতাদের মাথা উড়িয়ে দিতে যাচ্ছিলেন শিব।

দেবতারা তখন অনেক স্তবস্তুতি করে রুদ্রদেবকে শান্ত করেন।

'শিব খুশি হয়ে এই হরধনু তুলে দেন দেবতাদের হাতে। দেবতারা আবার তা গচ্ছিত রাখেন জনকের পূর্বপুরুষ দেবরাতের কাছে।

'সেই থেকে হরধনু জনক পরিবারেই রয়ে গেছে। কত রাজা-মহারাজা সে ধনুতে জ্যা আরোপ করতে চেষ্টা করেছেন। কেউই পারেননি। তুলতেই পারেননি সে ধনু। তো জ্যা আরোপ।'

তাঁরা এলেন শোন নদীর ধারে। গিরিব্রজে।

বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে শোনালেন গিরিব্রজের ইতিহাস। তাঁর নিজের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস। বললেন, 'রাজা কুশের চার ছেলে ছিল । কুশাশ্ব, কুশনাভ, অমূর্তরজা আর বসু। রাজার আদেশে, চার ছেলে চার নগরীর পত্তন করেন। সেই চার নগরী হল যথাক্রমে কৌশাম্বী, মহোদয়, ধর্মারণ্য আর গিরিব্রজ (এখনকার রাজগীর)।'

বিশ্বামিত্র বলে চললেন, 'এই কুশের ছেলে কুশনাভই আমার ঠাকুরদা। আমার বাবার নাম গাধি। কুশের বংশধর বলে আমাকে অনেকে কৌশিক-ও বলেন।

'আমার দিদি সত্যবতী । তাঁর স্বামী ঋচীক সশরীর স্বর্গে যাওয়ার পর থেকে আমার দিদি কৌশিকী নদী হয়ে হিমালয়ের কোলেই থাকেন। আমিও দিদির কাছেই থাকি। আমি সিদ্ধাশ্রমে গিয়েছিলাম সিদ্ধিলাভ করতে। অনেক রাত হয়েছে। এবার তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো।'

পরদিন। দুপুরবেলা তাঁরা এসে পৌঁছলেন জাহ্নবীর তীরে। সেখানেই স্নান-তর্পণ সেরে খাওয়া-দাওয়ার পর রাম-লক্ষ্মণ দু' ভাই বিশ্বামিত্রের কাছে বায়না ধরলেন, গঙ্গার মর্তে আসার কাহিনী শোনাতে হবে।

বিশ্বামিত্র দুই বালকের আবদারে সাড়া দিয়ে গল্প শোনাতে বসলেন। গঙ্গার জন্ম , কার্তিকের জন্ম, সগর রাজার ষাট হাজার ছেলেকে কপিল মুনির ভস্ম করে দেওয়া , সেই ষাট হাজার ছেলেকে বাঁচাতে ভগীরথের গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে মর্তে নিয়ে আসা ইত্যাদি নানা গল্পে দুই ভাইয়ের মন ভরিয়ে দিলেন বিশ্বামিত্র।

(চরিত্রপঞ্জিতে 'গঙ্গার মর্তে অবতরণ', 'সগর', 'ভগীরথ', 'কপিল' দেখুন।)

সে রাত সেখানেই কেটে গেল। পরদিন সকালে বিশ্বামিত্রের আসার খবর পেয়ে, সেখানকার ঋষিরা সুন্দর এক নৌকা নিয়ে এলেন। সে নৌকাতেই গঙ্গা পার হয়ে গঙ্গার উত্তর তীরে বিশালা-য় এলেন সবাই।

রাম বিশালার কাহিনী শুনতে চাইলেন। বিশ্বামিত্র শোনালেন সে কাহিনী। শোনালেন সমুদ্র-মন্থন আর মারুতদের জন্ম-কথা।

(চরিত্রপঞ্জিতে 'সমুদ্র-মন্থন' এবং 'মারুত' দেখুন।)

খবর পেয়ে ছুটে এলেন বিশালার রাজা সুমতি। তিনি বিশ্বামিত্রের কাছে রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় শুনে, সবাইকে পরম সমাদরে নিয়ে গেলেন নিজের প্রাসাদে। সে রাত বিশালায় কাটিয়ে, পরদিন সবাই এসে পৌঁছলেন মিথিলায়।

অহল্যার শাপমুক্তি

মিথিলায় এক নির্জন, পরিত্যক্ত আশ্রম দেখে রাম বিশ্বামিত্রকে জিগ্গেস করলেন, 'এ আশ্রমটি কার ছিল মুনিবর?'

বিশ্বামিত্র বললেন, 'এখানে গৌতমের আশ্রম ছিল। অহল্যার সঙ্গে এখানে অনেকদিন কাটিয়েছেন গৌতম।'

'এখন তাঁরা কোথায়?' কৌতূহলী হলেন দু'ভাই।

মহর্ষি বললেন, 'অহল্যা একবার একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেন। গৌতম তাঁকে শাপ দেন, "তুমি সবার চোখে অদৃশ্য হয়ে শুধুমাত্র হাওয়া খেয়ে থাকবে। কয়েক হাজার বছর পর, রাম এখানে এলে, তাঁর সেবা করে তুমি শাপমুক্ত হবে।" এই বলে গৌতম তপস্যা করতে চলে গেলেন হিমালয়ে।'

(অহল্যার পাষাণী হয়ে থাকবার কথা বালকাণ্ডে লেখেননি মহর্ষি বাল্মীকি। সে কথা আছে উত্তর কাণ্ডে। উত্তর কাণ্ড বাল্মীকির লেখা নয় বলে পণ্ডিতদের ধারণা। আমরা এখানে বাল্মীকিকেই অনুসরণ করলাম।

এ বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য চরিত্রপঞ্জিতে 'অহল্যা', 'গৌতম' এবং 'রাম' দেখুন।)

রাম দেখতে পেলেন অহল্যাকে। আর কেউই কিন্তু দেখতে পেলেন না। কারণ, গৌতমের শাপে রাম ছাড়া আর সবার চোখেই তো তিনি অদৃশ্য! হাজার হাজার বছরের জপতপে অহল্যা যেন দেবীর রূপ ধারণ করেছেন।

রামের দর্শনে শাপমুক্তা হলেন অহল্যা। এবার লক্ষ্মণ আর বিশ্বামিত্রও তাঁকে দেখতে পেলেন। অহল্যাকে প্রণাম করলেন দু'ভাই। অহল্যাও দু'ভাই-এর পায়ে অর্ঘ্য দিয়ে পুজো করলেন।

গৌতম আবার গ্রহণ করলেন অহল্যাকে। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে চললেন জনক রাজার বাড়ি।

হরধনু ভাঙলেন রাম

জনকের যজ্ঞসভায় পৌঁছলেন রাম-লক্ষ্মণ সহ বিশ্বামিত্র। সেখানে জনকরাজার পুরোহিত এবং অহল্যার ছেলে শতানন্দ মায়ের শাপমুক্তির জন্য রামকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালেন। শোনালেন, রামদের কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের চিরশত্রুতার কাহিনী। শোনালেন, ত্রিশঙ্কুর উপাখ্যান। আর বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভের কাহিনী।

(চরিত্রপঞ্জিতে 'বশিষ্ঠ', 'বিশ্বামিত্র' আর 'ত্রিশঙ্কু' দেখুন।)

এই সব কাহিনী শুনতে শুনতেই, সে রাত কেটে গেল। পরদিন সকালে বিশ্বামিত্র জনক রাজাকে ডেকে বললেন, 'রাজর্ষি! আপনার কাছে যে হরধনু আছে, তা এই দুই বালককে একবার যদি দেখান।'

জনক বললেন, 'ধনু আমি দেখাচ্ছি মহর্ষি। তবে তার আগে, এই দুই রাজপুত্রের জন্য এই ধনু সম্বন্ধে দু' চারটে কথা বলে নিই।'

'এ ধনু ছিল মহাদেবের। দক্ষযজ্ঞের সময় যজ্ঞের ভাগ না পেয়ে, এই ধনু দিয়েই, তিনি দেবতাদের মাথা কাটতে গিয়েছিলেন। দেবতারা অনেক স্তব-স্তুতি করায়, তাঁর রাগ পড়ে। তিনি এ ধনু দেবতাদেরকেই দিয়ে দেন।

'দেবতারা সে ধনু রেখে দেন আমারই পূর্বপুরুষ দেবরাতের কাছে। এ দিকে, একদিন চাষ করতে গিয়ে, আমি লাঙলের ফলায় তৈরি হওয়া এক রেখায়, ফুটফুটে এক শিশু মেয়েকে কুড়িয়ে পাই। লাঙলের রেখার আর এক নাম 'সীতা'। তাই সে মেয়ের নাম রাখা হয় সীতা।

'সীতাকে আমি প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসি। আমি ঠিক করেছি, সীতা বীর্যশুল্কা হবে। অর্থাৎ, যে সীতাকে বিয়ে করবে, তাকে পণ হিসেবে তার বীরত্ব দেখাতে হবে। তা কত রথী-মহারথী এলেন গেলেন। কেউই সে পণ দিতে পারেননি।

'পণ তো বেশি কিছু নয়। শুধু এই হরধনুতে জ্যা আরোপ করা। যিনি জ্যা আরোপ করতে পারবেন, আমার সীতা মা তাঁর গলাতেই মালা দেবে।'

জনকের আদেশে হরধনু আনানো হল যজ্ঞসভায়। পাঁচ হাজার মহাশক্তিশালী লোক অনেক কষ্টে আট চাকাওয়ালা এক গাড়িতে করে টেনে আনলেন হরধনু।

বিশ্বামিত্রের আদেশে, রাম হরধনুতে 'জ্যা' আরোপ করতে গেলেন।

বজ্রপাতের মতো বিকট শব্দে হরধনু ভেঙে দু' টুকরো হয়ে গেল। পাহাড়-ভাঙা ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল চারপাশ।

বিশ্বামিত্র, জনক আর রাম-লক্ষ্মণ দু' ভাই ছাড়া বাকি সবাই জ্ঞান হারালেন।

বিস্ময়ে অভিভূত জনক বিশ্বামিত্রকে বললেন, 'রামের মতো পাত্রের গলায় মালা দিতে পারলে আমার সীতা ধন্য হয়ে যাবে। হে মহর্ষি! আপনি দয়া করে অনুমতি দিন, আমি মহারাজ দশরথকে আনতে দূত পাঠাই।'

রামের গলায় মালা দিলেন সীতা

জনকের দূত ছুটল দশরথকে আনতে। দূতদের মুখে সব খবর শুনে দশরথ তো একেবারে আহ্লাদে আটখানা।

সঙ্গে সঙ্গেই বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি ইত্যাদি পুরোহিত, চতুরঙ্গ সেনা আর প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে মিথিলার পথে যাত্রা শুরু করলেন দশরথ। চার দিন পর পৌঁছলেন মিথিলায়।

দশরথকে খুব খাতির করে ভেতরে নিয়ে গেলেন জনক।

পরদিন। বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেল। ঠিক হল, রামের সঙ্গে জনক রাজার পালিতা মেয়ে সীতার, লক্ষ্মণের সঙ্গে জনক রাজার নিজের মেয়ে ঊর্মিলার, ভরতের সঙ্গে জনক রাজার ছোট ভাই কুশধ্বজের বড় মেয়ে মাণ্ডবীর আর শত্রুঘ্নের সঙ্গে কুশধ্বজের ছোট মেয়ে শ্রুতকীর্তির বিয়ে হবে।

বিয়ের দিন যজ্ঞবেদিতে অগ্নিসাক্ষী রেখে সীতা মালা দিলেন রামের গলায়। লক্ষ্মণ-ঊর্মিলা, ভরত-মাণ্ডবী আর শত্রুঘ্ন-শ্রুতকীর্তিও মালা বদল করলেন।

রামের বয়স এখন বারো পেরিয়ে তেরো চলছে। ভরত, লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্নেরও তাই। সীতার ছয়। একেবারেই বাচ্চা সবাই।

দর্প চূর্ণ হল পরশুরামের

বিয়ের পর চার ছেলে আর চার পুত্রবধূকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে চললেন দশরথ। বিশ্বামিত্রও ফিরে গেলেন হিমালয়ে। আবার তপস্যা করতে।

পথে হঠাৎ, প্রবল ঝড় আর ভূমিকম্প দেখা দিল। আকাশ ঘন কালো হয়ে এল। বড় বড় গাছ ভেঙে পড়তে লাগল। ধুলোর ঝড়ে জ্ঞান হারাল দশরথের সৈন্যরা। সকলেই খুব অমঙ্গল আশঙ্কা করতে লাগলেন।

হঠাৎ, সামনে দেখা দিলেন পরশুরাম। কাঁধে কুঠার। হাতে বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল এক ধনু। আর বাণ। ভয়ে সবাই তাঁর বন্দনা শুরু করে দিলেন।

পরশুরাম রামকে ডেকে বললেন, 'শোনো রাম! আমি মহেন্দ্রপর্বতে তপস্যা করছিলাম। সেখানেই খবর পেলাম, তুমি নাকি হরধনু ভেঙে ফেলছ! তা বেশ কথা। এবার আমার এই ধনুটাতে যদি তীর জুড়তে পারো, তবে বুঝব তুমি সত্যিকারের বীর। আর তা পারলে, তবেই, আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব।'

দশরথ হাতজোড় করলেন পরশুরামের কাছে। বললেন, 'রাম না বাঁচলে যে আমরা কেউই বাঁচব না। আপনি দয়া করে আমাদের বাঁচান।'

পরশুরাম দশরথের কথা কানেই তুললেন না।

'এ ধনু ছিল বিষ্ণুর!' বলে তাঁর হাতের ধনুটি এগিয়ে দিলেন রামের দিকে। বললেন, 'বিষ্ণু এ ধনু দিয়েছিলেন ঋচীককে। ঋচীক দেন আমার বাবা জমদগ্নিকে। বাবার হাতে এই ধনু না থাকার সুযোগ নিয়ে, কার্তবীর্যার্জুন আমার বাবাকে মেরে ফেলেন।

'আমিও প্রতিজ্ঞা করি, ক্ষত্রিয়দের এ পৃথিবী থেকে নির্মূল করব। আমি একুশ বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছি। এবারে তুমি তোমার বীরত্ব দেখাও।'

রাম 'বিষ্ণু ধনু' হাতে নিয়ে বললেন, 'আমি হয় আপনার গতি আটকাব। নয়, তপস্যাবলে আপনি যে-সব লোকে বাস করার অনুমতি পেয়েছেন, তা নষ্ট করে দেব। আপনি যা চান।'

রামের কথা শেষ হতে না হতেই, পরশুরামের সব তেজ গিয়ে ঢুকল রামের শরীরে। পরশুরাম জড়পদার্থের মতো নিস্তেজ হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

পরশুরামের দর্প চূর্ণ হল।

রামের কাছে প্রার্থনা জানালেন তিনি, 'হে রাম! আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। তুমিই স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু! হে প্রভু! তুমি কৃপা করে আমার তপোবল হরণ করো। কিন্তু দোহাই তোমার! দয়া করে আমার গতিরোধ কোরো না। কারণ, আমি কশ্যপকে বসুন্ধরা দান করায় পৃথিবীতে রাত্রিবাস করার অধিকার হারিয়েছি। আমি আবার মহেন্দ্র পর্বতে ফিরে গিয়ে তপস্যা করতে চাই।'

রাম পরশুরামের কথা রাখলেন। দু'জনে দু'জনকে প্রণাম করে যে যার পথে চলে গেলেন। রাম বিষ্ণুধনু বরুণকে দিয়ে দিলেন।

অযোধ্যায় ফিরলেন দশরথ

চার ছেলে আর তাদের চার নববধূকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এলেন দশরথ। অযোধ্যায় আনন্দের হাট বসে গেল। কৌশল্যা, কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সহ রাজা দশরথের সব রানিরা নতুন বৌদের বরণ করে ঘরে তুললেন।

নতুন বৌদের নিয়ে রাজকুমারীরা বেশ সুখেই দিন কাটাতে লাগলেন।

ভরতের মামা যুধাজিৎ ভরতকে মামার বাড়িতে নিয়ে যেতে অযোধ্যায় এসেছিলেন। ভরত তখন গেছেন মিথিলায়। যুধাজিৎও মিথিলায় গিয়ে বিয়ের আসরে যোগ দিয়েছিলেন। মিথিলা থেকে অযোধ্যায় ফিরে, যুধাজিৎ ভরতকে মামার বাড়ি কেকয় দেশে নিয়ে গেলেন।

ভরতের দাদামশাই অশ্বপতি ভরতকে দেখতে চান। তাই মামার বাড়ি যাত্রা। লক্ষ্মণ যেমন রামের, শত্রুঘ্নও তেমনই ভরতের ছায়ার মতো। সর্ব কাজে দাদার নিত্যসঙ্গী।

শত্রুঘ্নও চললেন ভরতের সঙ্গে। মেজদার মামার বাড়িতে।

অযোধ্যা কাণ্ড

রামকে রাজা করতে চাইলেন দশরথ

দেখতে দেখতে প্রায় বারো বছর কেটে গেল। রামের বয়স চব্বিশ পার হয়ে পঁচিশ চলছে। সীতার আঠারো। ভরত আর লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন তো ধরতে গেলে রামের সমবয়সীই।

রাম আর সেই ছোট্ট বালকটি নেই। রীতিমতো যুবক এখন। অযোধ্যার মানুষের নয়নের মণি। সকলেরই মনে মনে ইচ্ছে, রাম যুবরাজ হন।

দশরথের ইচ্ছে, বেঁচে থাকতে থাকতেই, রামকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করে যাবেন। মন্ত্রী, পুরোহিত, বিভিন্ন দেশের রাজা আর প্রজাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন দশরথ। সকলেই মহা আনন্দের সঙ্গে দশরথকে সমর্থন জানালেন। বললেন, 'আহা! রামের এত গুণ! তার জুড়ি নেই। রাম রাজা হলে সকলেরই আনন্দ।'

অভিষেকের জন্য যা যা কিছু দরকার, সব জোগাড় করার আদেশ দিলেন বশিষ্ঠ। আরও আদেশ দিলেন, 'সারা অযোধ্যা নগরীকে সাজাতে হবে। বাড়িতে বাড়িতে, পথে পথে পতাকা ওড়াতে হবে। মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিতে হবে। বীর সেনাদের সাজ-পোশাক পরে রাজবাড়ির অঙ্গনে হাজির হতে হবে।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাম যাচ্ছিলেন রথে চেপে। দশরথ মন্ত্রী সুমন্ত্রকে বললেন, 'সুমন্ত্র! রামকে একবার ডাকো তো এখানে। বলো আমি ডাকছি।'

সুমন্ত্র ডেকে দিলেন রামকে। রাম এসে বাবাকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন।

দশরথ ছেলেকে পাশের সিংহাসনে বসিয়ে বললেন, 'তুমি আমার বড় রানির বড় ছেলে। আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চাই। তুমি বিনয়ী আর জিতেন্দ্রিয় হয়ে, কামক্রোধকে জয় করে, ন্যায় বিচার করে, প্রজাদের

মন জয় করো!'

রামের বন্ধুরা ছুটে গিয়ে এই সুখবরটা দিয়ে এলেন কৌশল্যাকে।

অভিষেকের উৎসবে মেতে উঠল অযোধ্যা

দশরথ রামকে আবার ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'শোনো! একটা কথা বলি তোমায়। আজ এক দুঃস্বপ্ন দেখেছি আমি। দেখেছি, উল্কা পড়ছে। দিনের বেলায় সাংঘাতিক বজ্রপাত হচ্ছে! জ্যোতিষীরা বলছেন, "রাজার খুব বিপদ হতে পারে।" আমি আর কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না। কালই, পুষ্যা নক্ষত্রে তোমার অভিষেক হবে। তুমি আর সীতা আজ উপোস করবে। কুশের বিছানায় শোবে; বুঝেছ?

'আর একটা কথা। ভরত এখন মামার বাড়িতে আছে। এই সময়টাই তোমার অভিষেকের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। কারণ দেখো, মানুষের মনের গতি কখন কী রকম হয়, কেউই বলতে পারে না। যদিও জানি, ভরত আমার খুবই ভাল ছেলে। তোমাকে খুবই মানে- টানে। তবুও দেখো, সে-রকম অবস্থা হলে সাধুদের মনেও বিকার দেখা দেয়।'

বাবার কথা শেষ হতেই, উঠে পড়লেন রাম। গেলেন অন্দরমহলে। মার কাছে। বললেন, 'মা! আপনি কি শুনেছেন? বাবা আমাকে যুবরাজ করছেন? আজ সীতাকে আর আমাকে উপোস করে থাকতে বলেছেন বাবা!'

কৌশল্যা চার ছেলের মঙ্গলের জন্য ঠাকুরঘরে পুজোয় বসেছিলেন। খবর তো আগেই পেয়েছেন। এখন ছেলের মুখে আবার তা নতুন করে শুনে আনন্দে আর আবেগে গলা ধরে এল তাঁর। বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবা! শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে রাজত্ব করো। আর আমার আর সুমিত্রার আত্মীয়দের খুশি করো।'

লক্ষ্মণ আর সুমিত্রা তখন কৌশল্যার কাছে বসে।

রাম বললেন, 'লক্ষ্মণ! তোমার কপালেও কিন্তু রাজতিলক দেখতে পাচ্ছি আমি। আসলে তুমি তো আমারই দ্বিতীয় সত্তা! তাই। তোমার জন্যই আমি বেঁচে থাকতে চাই। রাজা হতে চাই।'

অভিষেকের সব ব্যবস্থা পাকা করতে বশিষ্ঠ খুব দৌড়োদৌড়ি লাগিয়ে দিলেন।

সারা অযোধ্যা যেন নতুন সাজে সেজে উঠল। পথঘাট ঝকঝকে করে ধোয়ানো হয়েছে। রাস্তার দু'ধারের প্রত্যেকটি বাড়িকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় তোরণ তৈরি হয়েছে। বাড়ি আর তোরণের মাথায় সুদৃশ্য পতাকা উড়ছে।

নগরীর যত লোক, সবাই সেজেগুজে রাস্তায় নেমে পড়েছেন। সবাই মিলে মহানন্দে হই-চই লাগিয়ে দিয়েছেন। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! লোকের চোখে মুখে খুশি যেন ঠিকরে পড়ছে।

কৈকেয়ীর মনে বিষ ঢেলে দিল মন্থরা

অভিষেকের দিন। ভোরবেলা। কৈকেয়ীর প্রাসাদের সামনে হই চই শুনে কৈকেয়ীর দাসী 'মন্থরা'র মনে খটকা লাগল।

'এত হই চই কীসের? ব্যাপার-স্যাপার তো মোটেই ভাল লাগছে না! একবার ছাদে উঠে দেখতে হচ্ছে ব্যাপারটা!'

মন্থরা চলল ছাদে। ছাদে উঠেই, রাস্তাঘাটের এত সাজগোজ, এত তোরণ, পতাকা আর লোকজন দেখে, মন্থরার তো চক্ষু চড়কগাছ! তরতর করে নেমে এল রাস্তায়।

এক ধাইকে (ধাত্রীকে) পেল সামনে। জিগ্গেস করল, 'হ্যাঁগা ভাল মানুষের ঝি, বলি, ব্যাপারখানা কী? আমাদের বড় রানি মা কি সাত সকালেই ধনদৌলত বিলুচ্ছেন নাকি গা?'

ধাই বলল, 'ও হরি, তাও জানো না বুঝি? কাল যে আমাদের বড় রাজপুত্তুর রামচন্দ্রের অভিষেক গা। তাই তো সবাই এত আনন্দ করছে।'

আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়াল না মন্থরা। পিঠে ছিল তার মস্ত বড় এক কুঁজ। সেই কুঁজ নিয়েই হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটল কৈকেয়ীর শোয়ার ঘরে।

কৈকেয়ী তখনও ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁকে ঘুম থেকে তুলে, নাটকীয় কায়দায় খবরটা দিল মন্থরা। কেঁদে কেটে বলল, 'ওগো, আমাদের কী হবে গো। ওগো রানি মা গো! তুমি এখনও ঘুমোচ্ছ রানি মা? এদিকে যে তোমার সব্বোনাশ হয়ে গেল গো!'

'সর্বনাশ! কীসের সর্বনাশ? কেন, কী হয়েছে গো মন্থরাদি? তুমি অত হাঁপাচ্ছই বা কেন?'

লাফ দিয়ে শোয়া থেকে উঠে বসেন কৈকেয়ী। নানা অমঙ্গল আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল তাঁর।

মন্থরা কৈকেয়ীর বাপের বাড়ির দাসী। বিয়ের সময় কৈকেয়ীর পরিচর্যা করার জন্য মেয়ের সঙ্গে এই বিশ্বস্ত দাসীকে দিয়ে দিয়েছিলেন কেকয়রাজ অশ্বপতি। সেই মন্থরাকে অবিশ্বাস করতে পারেন না কৈকেয়ী।

মন্থরা নেচে কুঁদে বলে, 'তোমার কপাল পুড়ল যে গো মা! রাজা যে রামকে জোবোরাজ করছেন গো!'

'ও মা! তাই নাকি! সক্কালবেলা কী সুখবরটাই শোনালে মন্থরাদি! এই নাও তার পুরস্কার!' বলে নিজের গা থেকে কিছু গয়না খুলে মন্থরার হাতে তুলে দিলেন কৈকেয়ী।

মন্থরা ছুড়ে ফেলে দিল সে অলঙ্কার। বলল, 'তোমার যেমন বুদ্ধি! বলি তোমার ছেলে কি রাজা হচ্ছে রানি মা? সতীনের দাসী হয়ে কৌশল্যার কাছে হাতজোড় করে থাকতে হবে তোমায়! দেখে নিয়ো! আর ভরতকেও রামের দাস হয়ে থাকতে হবে! এই বলে দিলুম!

'ওই বুড়ো রাজা বাইরে তোমাকে খুব ভালবাসার ভান করে। কিন্তু মনে মনে কৌশল্যাকেই বেশি ভালবাসে। ওই বুড়োটা যে একটা আস্ত ধড়িবাজ, তা বুঝতে পারছ না? নইলে, রামের অভিষেকের জন্য বেছে বেছে এমন সময় ঠিক করে, যখন ভরত মামার বাড়িতে?

'এ-সব ওই বুড়োর চক্রান্ত। আমাদের ভরতকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা। এটা বুঝতে পারছ না মা? ওই বুড়োটা একটা বদমাইশের হাড়। তোমাকে আর তোমার ছেলেটাকে ঠকাবার মতলব এঁটেছে।'

কৈকেয়ী বললেন, 'ছিঃ! মন্থরাদি! এমন কথা মুখেও এনো না। রাম সবার বড়। সে

তো রাজা হবেই। আর তা ছাড়া, সে কত ধর্মপরায়ণ! পবিত্রচরিত্র, আর সত্যবাদী! সে সত্যিই যুবরাজ হওয়ার যোগ্য। আর সে আমাকে তার নিজের মায়ের চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা করে। আর তা ছাড়া, রাম এক শো বছর রাজত্ব করার পর, ভরতও নিশ্চয়ই রাজা হবে। শুধু শুধু এত ভয় পাচ্ছ কেন?'

কিন্তু, মন্থরা তিল তিল করে বিষ ঢালতে লাগল। কৈকেয়ীর মনের পাত্রে। এক সময় তা কানায় কানায় বিষে পূর্ণ হল। মন্থরার পরামর্শ মতো কাজ করতে রাজি হলেন কৈকেয়ী।

একবার। দেবাসুরের যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রের হয়ে অসুরদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন দশরথ। দণ্ডক প্রদেশের বৈজয়ন্ত নগরে শম্বর বা তিমিধ্বজ নামে এক অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে মারাত্মক আঘাত পান দশরথ। অচেতন অবস্থায় তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তুলে এনে প্রাণপণ সেবায় সে যাত্রায় রাজাকে সারিয়ে তুলেছিলেন কৈকেয়ী।

সেই কৃতজ্ঞতায়, দশরথ তখন কৈকেয়ীকে দুই বর দিতে চেয়েছিলেন। কৈকেয়ী বলেছিলেন, 'এখন নয় মহারাজ! পরে সময়মতো নেব দুই বর।'

মন্থরা সে কথা কৈকেয়ীকে মনে করিয়ে দিয়ে বলল, 'তবে আর দেরি কেন? এবারে ওই বুড়োটার ঘাড় মটকে চেয়ে নাও সেই দুই বর। এই তো সুযোগ! একটু ছেনালি করে বুড়োটাকে বলবে, যে, এক বরে রামকে চোদ্দো বছরের জন্য বনবাসে যেতে হবে। আর অন্য বরে, রামের বদলে ভরত হবে জোবোরাজ।'

বর চাইলেন কৈকেয়ী

রামের অভিষেকের সুখবরটা নিজের মুখে দিতে কৈকেয়ীর প্রাসাদে এসেছেন দশরথ।

'কিন্তু কৈকেয়ী? কৈকেয়ী কোথায়! শোবার ঘরে তো নেই মহারানি! গেলেন কোথায়!'

প্রতিহারী জানাল, ' তিনি গোঁসা-ঘরে।'

'গোঁসা-ঘরে? কেন? গোঁসা-ঘরে কেন?'

ভ্রু কোঁচকালেন দশরথ। হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন কৈকেয়ীর গোঁসা-ঘরে।

গোঁসা ঘরে এসে দশরথ দেখলেন, কৈকেয়ী মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছেন।

দশরথ তাঁর এই অল্পবয়সী সুন্দরী রানিকে খুবই ভালবাসতেন। কৈকেয়ীর প্রতি দুর্বলতাটা ছিল অন্যদের তুলনায় একটু বেশিই। বললেন, 'কীসে তোমার রাগ হল মহারানি? কেউ কি তোমাকে অপমান করেছে? তুমি শুধু একবার বলো, কাকে পুরস্কার দিতে হবে? কাকেই বা শাস্তি দিতে হবে?

'একবার শুধু বলো, কোন নিরীহকে বধ করতে হবে? কোন অপরাধীকে মুক্তি দিতে হবে? কোন ফকিরকে রাজা বানাতে হবে? বা কোন রাজাকে ফকির বানাতে হবে? তুমি আজ যা বলবে, আমি তা-ই করব। আমি যে তোমার জন্য সব করতে পারি রানি!'

কৈকেয়ী বুঝলেন, দশরথকে ফাঁদে ফেলতে পেরেছেন। বললেন, 'যদি আপনি আমি যা চাইব, তা-ই দিতে প্রতিজ্ঞা করেন, তবেই বলব। নইলে বলব না। শুধু শুধু

বলে কী হবে?'

রানির মাথা নিজের কোলে তুলে নিয়ে, বৃদ্ধ রাজা বললেন, 'তুমি কি জানো না রানি! এক রাম ছাড়া আর কাউকেই আমি তোমার মতো ভালবাসি না? আমি রামের দিব্যি দিয়ে বলছি, তুমি যা চাইবে, তোমায় তা-ই দেব।'

কৈকেয়ী বললেন, 'দণ্ডকে দেবাসুরের যুদ্ধের সময় আপনার সেবা করলে, আপনি যে-দুই বর দিতে চেয়েছিলেন, তা কি এখন আপনি দিতে প্রস্তুত?'

দশরথ বললেন, 'ওঃ! এই কথা? তা তুমি চাও না, কী বর চাইবে। তুমি যা বর চাইবে, তোমায় আমি তাই দেব। তোমাকে তো আমার অদেয় কিছুই নেই দেবী।'

কৈকেয়ী বললেন, 'বেশ মহারাজ! শুনুন তা হলে। প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার ফিরিয়ে নেবেন না যেন। আমি এত দিন সেই দুই বর চাইনি। কিন্তু, আজ সে বর চাওয়ার সময় হয়েছে। তাই চাইছি।

'এক বরে, রামের বদলে ভরতকে যুবরাজ করতে হবে। আর দ্বিতীয় বরে, রামকে তপস্বীর বেশে চোদ্দো বছরের জন্য দণ্ডকারণ্যে বনবাসে পাঠাতে হবে! যাতে ভরতের যুবরাজ হওয়ার পথে কোনও কাঁটা না থাকে!

'আপনি কিন্তু প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন, তাহলে কিন্তু আমি আজই প্রাণ বিসর্জন দেব।'

কৈকেয়ীর কথা যেন বজ্র হয়ে এসে আঘাত করল বৃদ্ধ দশরথের বুকে।

জ্ঞান হারালেন দশরথ।

কিছুক্ষণ পরে, জ্ঞান ফিরে এলে, দশরথ যা মুখে এল, তা-ই বলে কৈকেয়ীকে গালিগালাজ করলেন। বললেন, 'এত নীচ! এত নৃশংস তুমি? আরে পাপীয়সী! রাম তোমার কোন পাকা ধানে মই দিয়েছে? সে তো তোমাকে মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করে। কেন তুমি তার এত বড় সর্বনাশটা করতে চাইছ? এখন বুঝতে পারছি, না জেনে একটা কালসাপকে এনে তুলেছিলাম বাড়িতে!'

কৈকেয়ীর পায়ে পড়লেন অসহায় বৃদ্ধ রাজা। বললেন, 'কৈকেয়ী! তোমার পায়ে মাথা ঠেকালাম। দোহাই তোমার! দয়া করে রামের এত বড় সর্বনাশ কোরো না! রামের মতো ছেলে হয় না। তার ওপর কেমন করে আমি এই নিষ্ঠুর শাস্তি চাপিয়ে দেব?

'এই সসাগরা পৃথিবীতে তুমি আর যা চাও, সবই আমি তোমায় দিতে রাজি আছি। দয়া করে আমার রামকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ো না। এইটুকু আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি।'

রাজার তিরস্কার বা অনুনয় বিনয়, কোনওটাতেই টললেন না কৈকেয়ী। বললেন, 'আপনি না সত্যবাদী? সত্যে অবিচল থাকার গর্ব করেন? এখন প্রতিজ্ঞা করে, সেই প্রতিজ্ঞা থেকে পিছিয়ে যেতে আপনার লজ্জা করছে না? কথা দিয়েছেন। এখন কথা না রাখলে, আমি কিন্তু আপনার সামনেই বিষ খাব।'

এ ভাবেই, রাজা রানির কথাবার্তায়, কোথা দিয়ে রাত কেটে গেল। মাঝে আরও অনেকবার চেতনা হারালেন রাজা। কৈকেয়ীর পাথর-মন তাতে গলল না।

বনে যেতে রাজি হলেন রাম

দুঃস্বপ্নের রাত কেটে গেল।

ভোরবেলা অভিষেকের সব ব্যবস্থা পাকা করে রাজ-পুরোহিত বশিষ্ঠ দশরথের অমাত্য এবং সারথি সুমন্ত্রকে বললেন দশরথকে খবর দিতে।

খবর দিতে গিয়ে সুমন্ত্র দেখলেন রাজার মর্মান্তিক পরিণতি। কৈকেয়ী সুমন্ত্রকে আদেশ করলেন রামকে পাঠিয়ে দিতে। সুমন্ত্র জানালেন, তিনি রাজার মুখ থেকেই আদেশ শুনতে চান।

দশরথ বললেন, 'হ্যাঁ সুমন্ত্র! আমি একবারটি রামকে দেখতে চাই! তুমি তাড়াতাড়ি তাকে এখানে নিয়ে এসো।'

রামের প্রাসাদে রাম আর সীতা সেজেগুজে খাটের ওপর বসেছিলেন।

সুমন্ত্র এসে খবর দিলেন, 'মহারাজ দশরথ তোমাকে একবার ডেকেছেন রাম। মহারানি কৈকেয়ীর প্রাসাদে আছেন তিনি।'

রাম, শুনেই, বেরিয়ে পড়লেন। সীতাকে বললেন, 'বাবা বোধহয় মা কৈকেয়ীর সঙ্গে অভিষেকের পরামর্শ করছেন। আমি চললাম। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তুমি সখীদের সঙ্গে থাকো। ব্রতপালনের জন্য যা যা করণীয়, তা করো।'

সীতা রামকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। লক্ষ্মণ ছিলেন প্রাসাদের বাইরে। রাম তাঁকেও তুলে নিলেন সুমন্ত্রের রথে।

কৈকেয়ীর প্রাসাদে দশরথকে ওই অবস্থায় দেখে, রাম দশরথের এই অসুস্থতার কারণ জানতে চাইলেন কৈকেয়ীর কাছে। বললেন, 'আমি কি কখনও কোনও দুঃখ দিয়েছি বাবাকে? অথবা, আপনি বা অন্য কেউ কি কোনও ব্যথা দিয়েছেন বাবাকে? বাবা আমার সঙ্গে কোনও কথা বলছেন না কেন মা? কী হয়েছে বাবার?'

নিষ্ঠুর-হৃদয়া কৈকেয়ী বললেন, 'উনি তোমাকে অন্ধভাবে ভালবাসেন তো! তাই কথাটা বলতে চাইছেন না।'

'কী সে কথা মা?' রাম বিস্মিত হলেন।

কৈকেয়ী বললেন, 'আমি বলতে পারি। তবে, একটা শর্ত আছে।'

'বলুন মা, কী সেই শর্ত?'

'তোমার বাবা তোমাকে যে-কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছেন, আমি তোমায় তা বলব। কিন্তু শর্ত হল, তা শোনার পর, সে কথা তোমার পক্ষে শুভই হোক, বা অশুভই হোক, তোমাকে মেনে নিতে হবে।

'রাজা আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা তোমাকেই পালন করতে হবে। কথাটা শোনার পর পেছিয়ে যেয়ো না যেন। আর আশা করি, তোমার বাবাকেও তুমি সত্যভ্রষ্ট হওয়ার প্ররোচনা দেবে না?'

'ছিঃ! মা! আপনি এ সব কী বলছেন? আপনি কি জানেন না, যে, বাবার কথায় আমি আগুনে বা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারি? ভয়ঙ্কর বিষ পান করতে পারি? আপনি দয়া করে আমাকে বলুন মা, আমাকে কোন আদেশ পালন করতে হবে?'

'বেশ! তবে শোনো। একবার দেবাসুরের যুদ্ধে তোমার বাবা সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত হন। তখন আমি মহারাজকে প্রাণপণ সেবায় সুস্থ করে তুলি। খুশি হয়ে

মহারাজ আমাকে দুটো বর দিতে চান। আমি তখন বর নিইনি। এখন সে বর আমি চেয়েছি।

'উনি বর চাইবার আগেই, আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমি যা চাইব, উনি তা-ই দেবেন। অথচ, এখন তাঁরই প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি থেকে উনি সরে যেতে চাইছেন।'

'আপনি নিঃসঙ্কোচে বলুন মা, কী বর আপনি চেয়েছিলেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, পিতৃসত্য পালনের জন্য যা করতে হয়, আমি অবশ্যই করব। আপনি তো জানেন মা, আপনার রাম যা বলে, তা-ই করে?'

'আমি বলেছি, প্রথম বরে, যৌবরাজ্যে অভিষেক হবে তোমার বদলে ভরতের। আর দ্বিতীয় বরে, তোমাকে আজই জটাচীরধারী হয়ে চোদ্দো বছরের জন্য বনবাসে যেতে হবে। দণ্ডকারণ্যে। আশা করি, পিতৃসত্য রক্ষা করে তুমি রাজার প্রাণ বাঁচাবে।'

মোহান্ধ নির্লজ্জা কৈকেয়ীর কথায় বিন্দুমাত্র দুর্বলতা প্রকাশ করলেন না রাম। যেন খুব সাধারণ কোনও কাজ তাঁকে করতে বলা হয়েছে। সেইভাবেই বললেন, 'এর জন্য আপনি একদম চিন্তা করবেন না মা! আমি এখুনি জটাচীরধারী হয়ে বনে যাচ্ছি।

'কিন্তু, একটা কথা শুধু আমি বুঝতে পারছি না মা। বাবা আমার সঙ্গে কথা বলছেন না কেন? কেনই বা উনি ভরতের অভিষেকের কথাটা সরাসরি আমাকে বললেন না? বাবার কথায় তো বটেই, এমন কী, আপনার কথাতেও আমি ভরতকে রাজ্য, প্রাণ, ধন-দৌলত দিতে পারি। এমন কী আমার সীতাকে পর্যন্ত দিতে পারি। আপনি আজই ভরতকে খবর পাঠান মা। আমি বনবাসে চললাম!'

পাষাণী কৈকেয়ী নির্লজ্জের মতো বললেন, 'হ্যাঁ রাম। তুমি আর দেরি কোরো না। এখুনি বেরিয়ে পড়ো। কারণ, তুমি দণ্ডকারণ্যের উদ্দেশে যাত্রা না করা পর্যন্ত রাজা স্নান-খাওয়া-দাওয়াও করবেন না বলেছেন।'

দশরথ 'ধিক্!' বলেই আবার মূর্ছা গেলেন।

রাম বললেন, 'পিতৃসত্য পালনের চেয়ে বড় কোনও ধর্ম পৃথিবীতে আছে বলে আমার জানা নেই। আমি মা কৌশল্যা আর সীতার সঙ্গে দেখা করে আজই বনে যাচ্ছি।'

দশরথের একটু সংজ্ঞা ফিরেছিল। রামের কথা শুনে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তারপর আবার মূর্ছা গেলেন।

রাম দশরথ আর কৈকেয়ীকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

লক্ষ্মণ রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে কাঁদতে কাঁদতে চললেন রামের সঙ্গে।

কৌশল্যা শুনলেন সেই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ

কৌশল্যা ছেলের মঙ্গল কামনায় বিষ্ণুপুজো সেরে হোম করছিলেন। লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রাম এলেন। প্রণাম করলেন মাকে। কৌশল্যা দুই ছেলেকে আসন এগিয়ে দিলেন বসতে।

রাম বললেন, 'মা! সীতা আর লক্ষ্মণের বড় বিপদ!'

'বিপদ! সীতার? লক্ষ্মণের? কেন? কীসের বিপদ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না বাবা!'

অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল কৌশল্যার।

রাম বললেন, 'হ্যাঁ মা! আজ আমার অভিষেক হচ্ছে না!'

'ও মা! সে কী! কেন?' চোখ কপালে উঠল কৌশল্যার।

'হ্যাঁ মা! অভিষেক অবশ্য হবে। তবে আমার নয়! ভরতের!'

'রাম!' আর্তনাদ করে উঠলেন কৌশল্যা।

'হ্যাঁ। আর এই আসন কার জন্য পেতে দিলেন মা? আমাকে যে এখন থেকে কুশাসনে বসতে হবে!'

কৌশল্যা কিছুই বুঝতে না পেরে, কাঁদতে কাঁদতে পাথরের মতো নিস্পন্দ হয়ে, শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে রামের দিকে চেয়ে রইলেন।

অকম্পিত কণ্ঠে রাম বললেন, 'হ্যাঁ মা! ভরতের সিংহাসনকে নিষ্কণ্টক করতে, আমাকে চোদ্দো বছরের জন্য বনবাসে যেতে হবে যে! আর সে বনবাস হবে দণ্ডকারণ্যে। যেতে হবে তপস্বীর বেশে। জটাচীরধারী হয়ে। বসতে হবে কুশাসনে। খেতে হবে ফলমূল।'

আর শুনতে পারলেন না কৌশল্যা। মূর্ছা গেলেন। পরম যত্নে মাকে তুলে, তাঁর গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিতে লাগলেন রাম।

জ্ঞান ফিরলে কৌশল্যা বললেন, 'হায় ভগবান! কেন ছেলে চেয়েছিলাম? স্বামীর ভালবাসা পাইনি। ভেবেছিলাম, ছেলেকে নিয়ে সুখী হব। তা সে সুখও আমার কপালে সইল না। এ দুঃখ আমি কেমন করে সইব বাবা? এখনই আমার অবস্থা কৈকেয়ীর দাসীর মতো। বা তার চেয়েও খারাপ। আর তুমি কাছে না থাকলে, আমার যে কী অবস্থা হবে, আমি ভাবতেই পারছি না।

'বাছুরকে হারিয়ে গাভীর যে অবস্থা হয়, আমারও এখন ঠিক সেই অবস্থা। যদি ইচ্ছে করলেই অকাল-মৃত্যু পাওয়া যেত, তা হলে, আমি আজই পরলোকে চলে যেতাম।'

লক্ষ্মণ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'আমি এ সব মানি না। এ ঘোরতর অন্যায়। বুড়ো বয়সে মহারাজের ভীমরতি হয়েছে। স্ত্রৈণ রাজার সমস্ত বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। বিন্দুমাত্র ধর্মবুদ্ধি থাকলে কোনও মানুষ এমন দেবতুল্য ছেলেকে ত্যাগ করতে পারে না।'

রামকে বললেন, 'দাদা! আপনি এ ভুল করবেন না। আপনি রাজ-সিংহাসন জোর করে অধিকার করে নিন। আমি আপনার পাশে থাকলে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি আছে, যে আমাদের বাধা দেবে?'

'ভরতের হয়ে যারা লড়বে, তাদের সবাইকে আমি বধ করব। বাবা যদি শত্রুতা করেন, তবে তাঁকেও বন্দি করব। দরকার হলে, তাঁকেও হত্যা করব। বিপথগামী গুরুজনকেও শাসন করা উচিত।'

লক্ষ্মণকে সমর্থন করে কৌশল্যা বললেন, 'লক্ষ্মণ যা বলছে, যদি উচিত মনে করো, তবে তাই করো রাম। সৎমার কথায় নিজের গর্ভধারিণী মাকে ত্যাগ করে চলে যেয়ো না। আর তা ছাড়া, তোমার বাবাকে যেমন তুমি শ্রদ্ধা করো, আমাকেও তেমনই মান্য করো আশা করি। আমি কিছুতেই তোমাকে বনে যেতে দেব না বাবা। কিছুতেই না।'

রাম বললেন, 'কিন্তু আমি যে সত্যবদ্ধ মা। তা ছাড়া, বাবার আদেশ আমি অমান্য

করবই বা কী করে?

'আপনি কি জানেন না, ঋষি কণ্ডু বাবার আদেশে গো-বধ করেছিলেন? আমাদেরই পূর্বপুরুষ মহারাজ সগরের আদেশ পালন করতে গিয়ে তাঁর ষাট হাজার ছেলেকে কপিল মুনির শাপে ভস্ম হয়ে যেতে হয়েছিল? বাবা জমদগ্নির আদেশ শিরোধার্য করে পরশুরাম তাঁর মা রেণুকার মাথা কেটে ফেলেছিলেন?

'একজন ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি কি কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার মতো জঘন্য পাপ করতে পারে? আপনি দয়া করে আমাকে অনুমতি দিন মা, আমি আপনার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করি।'

লক্ষ্মণ রাগে ফুঁসছিলেন। তাঁকে শান্ত করতে রাম বললেন, 'ভাই লক্ষ্মণ! লক্ষ্মী ভাইটি আমার। এমন রাগারাগি কোরো না। মা কৈকেয়ীও তো আমাকে নিজের ছেলের মতোই ভালবাসতেন! হঠাৎ কী যে হল! কে জানে! সবই দৈব।

'যাক গে। এখন তোমার সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে, আমার অভিষেক যাতে না হয়, সে চেষ্টা করা। মা কৈকেয়ী যাতে শান্তি পান, সে চেষ্টা করা। বাবার মনেও যেন সত্যভঙ্গের ভয় না থাকে, তা দেখা।'

লক্ষ্মণ ফুঁসে উঠে বললেন, 'আপনার এই ধর্মতত্ত্ব আমি কিছুতেই মানতে পারছি না দাদা। আমায় ক্ষমা করুন। আমার মনে হচ্ছে, আপনি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। দুর্বলরাই সব সময় দৈব দৈব করে। সবলরা নির্ভর করে নিজের নিজের পুরুষকারের ওপর। আমার পৌরুষের হাতে আজ আপনার সর্বনাশকারীদের দৈব পরাস্ত হবেই। এই আমি বলে দিলাম।'

ভাই-এর মাথায়, গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে রাম বললেন, 'ছিঃ! ভাই! অমন কথা বলতে নেই। আমি পিতৃসত্য পালনের ব্রত নিয়েছি। এর চেয়ে সৎ কর্ম আর কিছু নেই।'

রাম কিছুতেই কারও নিষেধ শুনলেন না।

অগত্যা! কৌশল্যা রামকে অনেক আদর, অনেক আশীর্বাদ করে বললেন, 'রাম! আর তোমাকে বাধা দেব না বাবা। যেখানে মন চায়, যাও। তবে একটা কথা। যেখানেই থাকো, ভাল থেকো। আর বনবাসের শেষে, আবার অযোধ্যায় ফিরে এসে সিংহাসনে বসেছ, সীতাকে নিয়ে সুখে সংসারবাস করছ, এ যেন আমি দেখে যেতে পারি।'

সীতা বললেন, আমিও বনে যাব

মা কৌশল্যার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে রাম ফিরে এলেন নিজের প্রাসাদে। সীতা হাসি হাসি মুখ করে এগিয়ে এলেন। তাঁর খুশি আর যেন তিনি চেপে রাখতে পারছেন না। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন। সেই শুভ মুহূর্তের জন্য। যখন বৃদ্ধ শ্বশুর দশরথ তাঁর নিজের হাতে করে যুবরাজের মুকুটটি পরিয়ে দেবেন তাঁর স্বামীর মাথায়!

হায় রে ভাগ্য! সীতা কি তখন জানতেন, কী চরম বিপর্যয় ঘটে গেছে তাঁর জীবনে?

রামকে দেখেই, মুহূর্তে হাসির বদলে উদ্বেগ ফুটে উঠল জানকীর চোখে মুখে।

বললেন, 'প্রভু! আপনাকে এ রকম মনমরা লাগছে কেন? কিছু একটা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে? কী হয়েছে? দয়া করে গোপন করবেন না কিছু। আমাকে বলুন!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাম বললেন, 'সীতা! আজ আমার অভিষেক হচ্ছে না!'

'সে কী! কেন?'

ঠিক যেন এই আশঙ্কাই করছিলেন সীতা। এক অজানা আতঙ্কে বুক কেঁপে উঠল তাঁর।

রাম বললেন, 'হ্যাঁ সীতা। অভিষেক অবশ্য হচ্ছে। তবে আমার নয়। ভরতের।'

'ভরতের! তা হলে আপনি!'

বিস্ময়ে, ব্যথায় অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠেন শেলবিদ্ধা সীতা।

'হ্যাঁ। আমারও ব্যবস্থা একটা হয়েছে বটে। চোদ্দো বছরের জন্য আমাকে বনবাসে যেতে হচ্ছে। তাই একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।' রাম বললেন।

'ওঃ! আমি আর ভাবতে পারছি না!' কান্নায় ভেঙে পড়লেন সীতা।

রাম সীতাকে শোনালেন দুষ্টা কৈকেয়ীর জঘন্য ষড়যন্ত্রের কথা। তারপর বললেন, 'মাত্র তো চোদ্দোটা বছর? ও দেখতে দেখতেই কেটে যাবে! তুমি এই চোদ্দো বছর ব্রত করবে। উপোস করবে। রোজ পুজো-আর্চা করবে। মা কৌশল্যার সেবা করবে। অন্য মায়েদেরও সেবা করবে।

'ভরত-শত্রুঘ্নকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি। তাদের ভাই আর ছেলের মতো আদর যত্ন করবে। তবে হ্যাঁ। ভরতের কাছে যেন আমার বেশি প্রশংসা-টশংসা কোরো না। বেশি ঐশ্বর্য হলে মানুষ অন্যের প্রশংসা সহ্য করতে পারে না।'

সীতা অভিমানে ফেটে পড়লেন। বললেন, 'আমি আপনাকে ছেড়ে এক মুহূর্তও কোথাও থাকতে চাই না। স্বর্গেও না। আমিও আপনার সঙ্গে বনে যাব। আমি যাবই। এ ব্যাপারে দয়া করে আপনি অমত করবেন না। দোহাই আপনার প্রভু!'

'তুমি বনে যাবে? মাথাটা কি খারাপ হয়েছে নাকি তোমার? বনে কত হিংস্র জীবজন্তু আছে জানো? সেখানে তুমি থাকবে কী করে?' স্ত্রীকে বোঝাতে চেষ্টা করেন রাম।

'বনের পশু তো দূরস্থান, স্বয়ং ইন্দ্রও আপনার কোনওই ক্ষতি করতে পারবেন না। দোহাই আপনার! দয়া করে আমাকে আর সঙ্গে নিতে আপত্তি করবেন না। বাপের বাড়িতে থাকতেই আমি শুনেছিলাম, আমার ভাগ্যে নাকি বনবাস লেখা আছে। আমি যে আপনাকে ছাড়া আর কিছুই জানি না। আপনার সুখই আমার সুখ। আপনার দুঃখই আমার দুঃখ।'

'কিন্তু...'

'আর কোনও কিন্তু নয়। আমি যাবই যাব। আর যদি আমাকে সঙ্গে না নেন, তবে বিষ খেয়ে, আগুনে পুড়ে বা জলে ডুবে আমি এই দেহ ত্যাগ করে চলে যাব।'

এবার তেজ প্রকাশ করলেন সীতা।

রাম তবুও, সীতাকে নিবৃত্ত করতে, নানাভাবে বোঝাতে লাগলেন।

সীতা বললেন, 'সাবিত্রী যেমন সত্যবানের, আমিও তেমনি আপনার। শুধুই আপনার। আপনার সীতাকে আপনি কোথায় ফেলে যাবেন নাথ? বনে আপনি যদি পাশে থাকেন, তবে কাঁটা গাছের ছোঁয়াও তুলোর মতো মনে হবে আমার। আপনার

সঙ্গে বনে থাকলেও জানব, স্বর্গে আছি। আপনাকে ছেড়ে এই রাজপ্রাসাদে থাকলেও জানব, নরকে পড়ে আছি।

'দোহাই আপনার! দয়া করে আপনি আর আপত্তি করবেন না। আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন!' রামকে জড়িয়ে ধরে করুণ ভাবে মিনতি জানাতে লাগলেন স্বামী-সোহাগিনী সীতা।

সীতার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে রাম বললেন, 'তোমার প্রাণে ব্যথা দিয়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না সীতা। আসলে, আমি তোমাকে একটু বাজিয়ে নিচ্ছিলাম। দেখছিলাম, তোমার আমার সঙ্গে বনে যাওয়ার ইচ্ছেটা কতটা আন্তরিক।

'যাবে বই কী জানকী! অবশ্যই যাবে তুমি! আমিই বা এই দীর্ঘ চোদ্দোটা বছর তোমাকে ছেড়ে বনে পড়ে থাকব কেমন করে? নাও, তুমি তৈরি হয়ে নাও। ব্রাহ্মণ, ভিখারি আর দাস-দাসীদের যা প্রাণ চায়, দান করো। আমাদের যা কিছু দামি জামা-কাপড়, বাসনপত্র, বিছানাপত্র, গাড়ি-ঘোড়া ইত্যাদি আছে, সব দিয়ে দাও। কী হবে আর ও-সবে আমাদের?'

আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলেন সীতা। মনের সুখে দান করতে লাগলেন। ভুলে গেলেন অভিষেকের বদলে বনবাসের দুঃখ।

এ যেন তাঁর পরম প্রাপ্তি! পরম সুখ! শাপ যেন তাঁর জীবনে বর হয়ে এল। বনবাসকে তাঁর মনে হল স্বর্গবাস।

লক্ষ্মণ বললেন, আমিও যাব

লক্ষ্মণ এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে হাপুসনয়নে কাঁদছিলেন। দাদা-বৌদির বনে যাওয়ার কথা শুনে রামের পা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'দাদা! আমিও বনে যাব আপনাদের সঙ্গে। তীরধনুক হাতে নিয়ে আমি আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব আপনাদের। স্বর্গ, অমরত্ব বা তিন লোকের ঐশ্বর্য, কোনও কিছুর বিনিময়েই আমি আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।'

রাম বললেন, 'তুমিও যদি সঙ্গে যাও, তবে মা কৌশল্যা আর মা সুমিত্রার কী হবে? কে তাঁদের দেখাশোনা করবে? বাবা তো মা কৈকেয়ীর কথাতেই ওঠা-বসা করবেন। মা কৈকেয়ীও, বাবার সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, মা কৌশল্যা আর মা সুমিত্রার ওপর খুবই অত্যাচার করবেন।

'ভরতও হয়তো তার গর্ভধারিণীর কথায় আমাদের গর্ভধারিণীদের ভুলেই যাবে। কাজেই, অন্তত দুই মায়ের দেখাশোনার জন্যও তোমার এখানে থাকাটা একান্তই দরকার লক্ষ্মণ।'

লক্ষ্মণ রেগে গিয়ে বললেন, 'ভরতের সাধ্যি নেই, যে, সে মা কৌশল্যা আর মা সুমিত্রাকে অশ্রদ্ধা করে। আপনার ভয়েই তা করতে সাহস পাবে না। যদি তেমন কিছু করে, তা হলে আমি তাকে বা তার দলের কাউকেই আস্ত রাখব না। সকলকেই মেরে ফেলব।

'আর মা কৌশল্যার কথা বলছেন? তাঁর নিজের যা জমিজমা আর আশ্রিত প্রজা আছে, তাতেই আমাদের দুই মায়ের স্বচ্ছন্দে দিন চলে যাবে। সীতার জামা-কাপড়ের

পেটিকাও আমিই বয়ে দেব। চিন্তা নেই।'

রাম আর আপত্তি করতে পারলেন না। স্থির হল, লক্ষ্মণও সঙ্গে যাবেন।

দান-ধ্যান

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা মিলে মনের সুখে খুব দানধ্যান করলেন। সুযজ্ঞ, অগস্ত্য, কৌশিক ইত্যাদি ব্রাহ্মণ, রাজবাড়ির দাস-দাসী এবং অন্যান্য প্রজাদের প্রচুর ধন দৌলত দান করলেন তাঁরা।

'ত্রিজট' নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাটি কেটে সংসার চালাতেন। দান-ধ্যানের খবর পেয়ে ছুটে এলেন। সঙ্গে অল্পবয়সী স্ত্রী আর একগাদা কাচ্চাবাচ্চা। মজা করবার জন্য রাম বললেন, 'এই লাঠিটা আপনি যত দূর ছুড়তে পারবেন, তত দূর পর্যন্ত জমিতে আমার যত গরু আছে, সব আপনার হবে।'

লোভে চকচক্ করে উঠল বৃদ্ধ ত্রিজটের দু'চোখ। কোমরে কাপড় জড়িয়ে লাঠি এমন জোরে ছুড়লেন, যে, তা গিয়ে পড়ল সরযূর অপরপারের এক মাঠে।

সত্যনিষ্ঠ রাম কথা রাখলেন। রামকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন ত্রিজট।

প্রজাদের হা-হুতাশ

দশরথের কাছে বিদায় নিতে চললেন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য।

হা-হুতাশ করছেন সবাই। শোকে কাঁদছেন। বলছেন, 'হায় ভগবান! যে রামের পেছন পেছন চতুরঙ্গ সেনা চলত, আজ তাঁর কী অবস্থা! সঙ্গে শুধু সীতা আর লক্ষ্মণ!'

কেউ বলছেন, 'মহারাজের ঘাড়ে নিশ্চয়ই ভূত চেপেছে। নইলে কেউ এমন নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে? চলো, আমরাও রামের সঙ্গে বনে যাই। রাম না থাকলে, অযোধ্যাই বন। রাম থাকলে, বনই নগর। বনই অযোধ্যা। রাম-বর্জিত অযোধ্যার বনে বরং দুষ্টা কৈকেয়ীই থাকুন। তাঁর ছেলে আর শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে। আমরা থাকছি না।'

রাম এলেন দশরথের কাছে

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা দশরথের সঙ্গে দেখা করতে এলেন রাজপুরীতে। সুমন্ত্র দৌড়ে গিয়ে খবর দিলেন দশরথকে।

দশরথ বললেন, 'সুমন্ত্র! যাও! শিগগির যাও! আমার সব স্ত্রীদের নিয়ে এসো। আমি তাদের পাশে নিয়ে একবারটি আমার রামকে দেখব।'

কৌশল্যা-কৈকেয়ী-সুমিত্রা ছাড়াও, হাজির হলেন রাজার আরও সাড়ে তিনশো স্ত্রী।

হাত জোড় করে ঢুকলেন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা। দশরথ রামের দিকে এগোতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। রাম, লক্ষ্মণ আর সীতা, তিনজনে মিলে ধরাধরি করে

রাজাকে শুইয়ে দিলেন খাটে।

রাম বললেন, 'মহারাজ! আপনার আদেশ মতো পিতৃসত্য পালনের জন্য আমি বনবাসের উদ্দেশ্যে দণ্ডকারণ্যে যাচ্ছি।' সীতা আর লক্ষ্মণও যাচ্ছে আমার সঙ্গে। ওরা কিছুতেই আমার বারণ শুনল না। আপনি দয়া করে আমাদের আশীর্বাদ করুন। আর বনে যাওয়ার অনুমতি দিন।'

কাঁদতে কাঁদতে দশরথ বললেন, 'রাম! আমি পাষণ্ড! তাই মোহগ্রস্ত হয়ে কৈকেয়ীর কথায় তোমাকে বনে যেতে বলেছি। তুমি আমাকে বেঁধে রেখে, আজই রাজা হও বাবা! তাতে যদি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।'

রাম বললেন, 'ছিঃ! বাবা! ও কথা মুখেও আনবেন না। আপনি হাজার বছর রাজত্ব করুন। মাত্র তো চোদ্দোটা বছর! ও দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। তারপর ফিরে এসে আমি আবার আপনার পদসেবা করতে পারব।'

কৈকেয়ী একবার শুধু তাকালেন দশরথের দিকে। দশরথের সুর পাল্টে গেল।

সত্যভ্রষ্ট হওয়ার ভয়ে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, রামকে বললেন, 'রাম! তোমাকে সত্যনিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত করা আমার কর্ম নয়। তোমাদের যাত্রা শুভ হোক! তবে একটা অনুরোধ তোমার কাছে। শুধু আজকের রাতটা এই বুড়োটার মুখ চেয়ে এখানে কাটিয়ে দাও বাবা! এক রাত তুমি পাশে থাকলেই আমি অনেক ভাল থাকব।'

রাম বললেন, 'কিন্তু তাতে কী লাভ বাবা? মায়া বাড়ানো বই তো নয়। আপনি বরং অনুমতি দিন বাবা। আমরা এগোই। আপনাকে সত্যভ্রষ্ট করে আমি রাজ্য তো দূরের কথা, সীতাকেও চাই না।'

প্রাণের থেকেও প্রিয় রামকে জড়িয়ে ধরে আবার জ্ঞান হারালেন দশরথ। একমাত্র কৈকেয়ী ছাড়া, আর সবাই হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

রাগে ফেটে পড়লেন সুমন্ত্র

রাগে কাঁপতে লাগলেন সুমন্ত্র। কৈকেয়ীকে বললেন, 'কুলনাশিনী! রাজাকে মারতে চলেছ তুমি! থাকো তুমি আর তোমার ছেলে এখানে। আমরা সব চললাম। রামের সঙ্গে। যে-রাজ্যে সাধু-ব্রাহ্মণরা থাকবেন না, সে-রাজ্য নিয়ে তুমি কী করবে? আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে, যে, তোমার এই পাপে পৃথিবী কেন এখনও ফাটল না! ব্রহ্মর্ষিদের শাপে কেন এখনও তোমার মৃত্যু হল না!'

এরপর সুমন্ত্র বলতে শুরু করলেন কৈকেয়ীর মার কলঙ্কের কাহিনী। বললেন, 'তোমার মার কীর্তিকলাপের কথাও আমার অজানা নেই। তোমার বাবা কেকয়রাজ এক সাধুর বরে সব ইতরপ্রাণীদের ভাষা বুঝতে পারতেন। এই বরের কথা কাউকে বললেই, তোমার বাবার মৃত্যু হবে, এই ছিল সাধুর শর্ত। তোমার মাও জানতেন না।

'একদিন, শুয়ে থাকা অবস্থায়, এক 'জৃম্ভ' পাখির ডাক শুনে তোমার বাবা হাসতে থাকেন। তোমার মা সেই হাসির কারণ জানতে চান। তোমার বাবা বলেন, যে সেই কারণ জানালেই তাঁর মৃত্যু হবে।

'তোমার মা জেদ ধরেন, তাঁকে কারণ জানাতেই হবে। নইলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। তোমার বাবা ছুটলেন সেই সাধুর কাছে।

'সাধু বললেন, "তোমার স্ত্রী মরুক, বাঁচুক, যা খুশি করুক। তুমি কিছুতেই তাকে এ কথা বলতে পারবে না।" অগত্যা! তোমার বাবা তোমার মাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

'তা তুমি আর কত ভাল হবে? নিজের স্বামীর মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও, তোমার মা সামান্য কৌতূহল নিবৃত্ত করতে চাননি। তুমিও, মায়ের মতোই, সামান্য রাজ্যের লোভে নিজের স্বামীকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিচ্ছ।

'রাম বনে গেলে সবাই তোমাকে যা-তা বলবে। তার চেয়ে বরং রাম যাতে রাজা হয়, সেই চেষ্টাই করো। এখনও সময় আছে। এই রাজবাড়িতে রামের মতো শুভাকাঙ্ক্ষী তোমার একজনও নেই। এটা জেনে রেখো।'

সুমন্ত্রর তিরস্কারে কৈকেয়ীর চোখে মুখে কোনও প্রতিক্রিয়াই ফুটে উঠল না।

শুরু হল বনে যাওয়ার প্রস্তুতি

সুমন্ত্রকে ডেকে দশরথ বললেন, 'রামের সঙ্গে চতুরঙ্গ সেনা যাবে। আর যাবে বাক্‌চাতুরি- জানা পতিতা, ধনী ব্যবসায়ী আর কুস্তিগীর। আর বনের আট-ঘাট জানে, এমন ব্যাধ। প্রচুর গাড়ি-ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র, ধনরত্ন ইত্যাদি সঙ্গে দাও। যাতে রাম বনে গিয়ে যজ্ঞ করতে পারে। প্রাণভরে মুনি ঋষিদের দান-ধ্যান করতে পারে।'

কৈকেয়ীর মুখ শুকিয়ে গেল। বললেন, 'সে কী মহারাজ! তাহলে আমার ভরত আর এই পানসে মদের মতো রাজ্য নিয়ে কী করবে? সবই তো রামকেই দিয়ে দিচ্ছেন। এ অন্যায়। আপনারই পূর্বপুরুষ সগর রাজার বড় ছেলে অসমঞ্জকে যে-ভাবে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল, রামকেও ঠিক সে-ভাবেই নির্বাসন দিন।'

রাজার বৃদ্ধ মন্ত্রী সিদ্ধার্থ বললেন, 'অসমঞ্জের কথা আলাদা। সে অত্যাচারী ছিল। খেলার থেকে তুলে এনে অসহায় শিশুদের জলে ফেলে দিয়ে মজা দেখত। প্রজাদের অভিযোগেই, সগর তাকে সস্ত্রীক নির্বাসন দিয়েছিল। কিন্তু, রাম কী অপরাধ করেছে, যে, তাকে নির্বাসনে যেতে হচ্ছে?'

রাম বললেন, 'বাবা! আমি তো সব ত্যাগ করেই বনে যাচ্ছি। এ সব কিছুই আমার দরকার নেই। আপনি দয়া করে আমাকে চীর (বনবাসীদের পরবার মতো খুব খসখসে কাপড়ের টুকরো বা গাছের ছাল), শাবল আর পেটিকা (প্যাঁটরা) আনিয়ে দিন।'

কৈকেয়ী নিজেই দৌড়ে গিয়ে চীর এনে তুলে দিলেন রাম-লক্ষ্মণ-সীতার হাতে। রাম-লক্ষ্মণ কোনওক্রমে পরে নিলেন সেই অর্ধনগ্নবাস।

চীরের দুটো টুকরো হাতে নিয়ে অসহায় সীতা রামের কাছে জানতে চাইলেন, 'চীর কী করে পরে?'

রাম নিজের হাতে সীতার কাপড়ের ওপর দিয়েই জড়িয়ে দিলেন চীরের দুটো টুকরো।

কেঁদে উঠলেন অন্তঃপুরিকারা। তাঁরা বললেন, 'সীতা কেন বনে যাবে? সীতা এখানেই থাকবে।'

প্রচণ্ড রেগে গেলেন রাজবাড়ির কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ। বললেন, 'পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী! তোমার স্পর্ধা তো দেখছি কম নয়। সীতাকে চীর পরতে দিয়েছ তুমি।

শোনো তবে! রামের সিংহাসনে সীতাই বসবে। ভরত যদি রাজা হতে চায়, তো বলব, সে দশরথের ব্যাটাই নয়। ছেলের ভাল করতে গিয়ে, তুমি তার সর্বনাশই করছ। ভাল চাও, তো, এক্ষুনি সীতাকে ভাল ভাল কাপড় আর গয়নাগাটি দাও।'

দশরথ বললেন, 'ওই একরত্তি মেয়ে জানকী! ও কিনা চীর পরে বনে যাবে! এমন নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা তো আমি করিনি! সীতা দামি দামি শাড়ি-গয়না পরেই যাবে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোমাকে নরকে যেতে হবে কৈকেয়ী।'

রাম দশরথকে বললেন, 'বাবা! আমার বৃদ্ধা মা কৌশল্যাকে দেখবেন। তাঁকে যেন কষ্ট পেয়ে প্রাণত্যাগ না করতে হয়।'

দশরথ সুমন্ত্রকে ডেকে বললেন, 'সুমন্ত্র! তুমি রামকে অযোধ্যার বাইরে রেখে এসো! একটা সৎ, বীর ছেলে তার মা-বাবার কাছ থেকে কী সুন্দর পুরস্কার পাচ্ছে দেখেছ?'

দশরথের আদেশে, সীতার জন্য চোদ্দো বছরের ব্যবহারের উপযুক্ত প্রচুর দামি দামি জামাকাপড় আর গয়নাগাটি দিয়ে দেওয়া হল সঙ্গে। সীতাকেও, গয়নাগাটি পরিয়ে, রাজরানির বেশে সাজিয়ে দেওয়া হল।

কৌশল্যা সীতাকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'আমার রামকে দেখো মা! সতী-সাধ্বী স্ত্রীর কাছে পতিই তার দেবতা। এ কথা মনে রেখো।'

সীতা বললেন, 'চন্দ্রের কিরণকে যেমন চন্দ্রের কাছ থেকে আলাদা করা যায় না, আমাকেও তেমনি কেউ ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। বাবা বা ছেলের দান সীমিত। কিন্তু স্বামীর দান অসীম। তাঁকে দেবজ্ঞানে পুজো করব না, তো কাকে করব?'

রাম কৌশল্যাকে বললেন, 'মা! আপনি বাবাকে দেখবেন। চোদ্দো বছর তো দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। তারপর আবার আমাদের দেখতে পাবেন। একদম চিন্তা করবেন না মা। আমরা ভালই থাকব।'

এরপর, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা ছাড়াও, আরও সাড়ে তিনশো বিমাতার উদ্দেশে হাত জোড় করে রাম বললেন, 'যদি কখনও আপনাদের প্রতি কোনও অন্যায় আচরণ করে থাকি, তা হলে দয়া করে আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন।'

সুমিত্রা লক্ষ্মণকে বললেন, 'লক্ষ্মণ! সবসময় দাদার অনুগত হয়ে থাকবে। বনে গিয়ে রামকেই ভাববে দশরথ। সীতাকে ভাববে আমি। আর বনকে ভাববে অযোধ্যা।'

শুরু হল বনযাত্রা

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা দশরথ আর রানিদের প্রণাম করে, সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় এক রথে উঠলেন। রথে সীতার চোদ্দো বছরের মতো জামাকাপড়, গয়নাগাটি ইত্যাদি এক চামড়ার পেটিকায় (প্যাঁটরা/স্যুটকেস) পুরে তুলে দেওয়া হল। নেওয়া হল, রাম লক্ষ্মণের অস্ত্রশস্ত্র, মাটি খোঁড়ার শাবল ইত্যাদি।

রথ ছুটিয়ে দিলেন সুমন্ত্র। প্রজারা কাঁদতে কাঁদতে রথের পেছন পেছন ছুটতে লাগল। দশরথ রামকে একবার শেষ দেখা দেখতে বাইরে বেরিয়ে এলেন। রাম

সুমন্ত্রকে যত জোরে সম্ভব রথ চালাতে বললেন।

বৃদ্ধ দশরথ আর বৃদ্ধা কৌশল্যা প্রজাদের সঙ্গে রথের পেছন পেছন 'হা রাম!', 'হা সীতা!' 'হা লক্ষ্মণ!' বলে হা হুতাশ করতে করতে ছুটতে লাগলেন।

দশরথ বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠলেন, 'রথ থামাও সুমন্ত্র! রথ থামাও! আমার রামকে ফিরিয়ে দাও! তোমরা আমার রামকে ফিরিয়ে দাও! আমার রাম ছাড়া এক মুহূর্তও যে আমি বাঁচব না সুমন্ত্র! তোমার পায়ে পড়ি, আমার রামকে ফিরিয়ে দাও!'

রাম বললেন, 'না! না! রথ থামিয়ো না! চালাও! চালাও! রাজা যদি পরে কৈফিয়ত চান তোমার কাছে, তখন বোলো, যে, তুমি রাজার আদেশ শুনতে পাওনি।'

বশিষ্ঠ সহ মন্ত্রীরা অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে ফেরালেন। রাজবাড়ির অন্য অনেককেই বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরত পাঠালেন সুমন্ত্র।

শোকে ভেঙে পড়লেন দশরথ

যতক্ষণ দেখা যায়, রথের দিকে, রথের ওড়ানো ধুলোর দিকে, অপলক দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন অসহায় বৃদ্ধ দশরথ। এক বিশাল শূন্যতা যেন তাঁর হৃদয়কে কুরে কুরে খাচ্ছে। একসময় হঠাৎই জ্ঞান হারালেন দশরথ।

বৃদ্ধা কৌশল্যা কোনওক্রমে বৃদ্ধ রাজাকে তুলে ডান হাত ধরে নিয়ে চললেন প্রাসাদের দিকে।

কৈকেয়ী বাঁ হাত ধরতে এলে দশরথ ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'খবরদার কৈকেয়ী! আমাকে একদম ছোঁবে না তুমি। পাপীয়সী কোথাকার! তুমি আমার স্ত্রী নও। আমি তোমায় ত্যাগ করলাম। আর তোমার ভরত যদি এ ভাবে রাজ্য পেয়ে খুশি হয়, তবে সে আমার প্রেতাত্মার উদ্দেশে যেন কিছু দান না করে। কারণ, সে দান আমার কাছে পৌঁছবে না।'

ডুকরে কেঁদে উঠলেন বৃদ্ধ রাজা, 'দেখো, দেখো কৌশল্যা! ওই দেখো রামের রথের ঘোড়ার পায়ের ছাপ। ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছি! কিন্তু আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় রামকে দেখতে পাচ্ছি না কেন কৌশল্যা?'

আবার বলছেন, 'আহা! আমার রাম যে সারা গায়ে চন্দন মেখে, নরম বালিশে মাথা দিয়ে, নরম বিছানায় শুয়ে থাকত। রাজপরিচারিকারা তাকে হাওয়া করত। আর আজ কি না গাছের গোড়ায় মাথা রেখে তাকে শুতে হবে?

'আমার সীতা মা যে কিছুই জানে না বনের। বাঘ-সিংহের ডাক শুনে সে না জানি কতই ভয় পাবে!

'পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী! চিন্তা নেই। তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। বিধবা হয়ে তুমি সুখে রাজ্য ভোগ করবে। রাম নেই। কাজেই আমিও আর বাঁচতে চাই না।'

নিজের প্রাসাদে এসে শোক উথলে উঠল কৌশল্যার। বললেন, 'মহারাজ! কৈকেয়ীকে খুশি করতে গিয়ে যাদের বনে পাঠালেন, তারা যে বনের কিছুই জানে না। আবার কবে আমার রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে দেখতে পাব মহারাজ?'

সান্ত্বনা দিয়ে সুমিত্রা বললেন, 'কেন শোক করছ দিদি? তোমার রামের মতো

ছেলে আর একটাও আছে? আর লক্ষ্মণের মতো ভাই? সীতার মতো স্ত্রী? ওরা সবসময় রামকে আগলে রাখবে। কে তাদের কী ক্ষতি করবে? ক' দিন পরেই, আবার তোমার রামকে ফিরে পাবে তুমি।'

বনবাসের প্রথম রাত

অসংখ্য অযোধ্যাবাসী ছুটছিলেন রামের রথের পেছনে। রাম তাঁদের ফিরে গিয়ে ভরতের প্রতি অনুগত থাকতে এবং ভরতকে তাঁর চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা করতে বললেন।

ব্রাহ্মণদের করুণ আর্তিতে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা রথ থেকে নেমে পায়ে পায়েই চললেন বনের দিকে।

পথে পড়ল তমসা নদী। বনবাসের প্রথম রাতটা তমসার তীরেই কাটাতে চাইলেন রাম। রাম বললেন, 'লক্ষ্মণ! ওই শোনো! গাছের পাখিরাও আমাদের জন্য কাঁদছে! মা আর বাবা হয়তো কেঁদে কেঁদেই অন্ধ হয়ে যাবেন! তবে ভরত নিশ্চয়ই তাঁদের সান্ত্বনা দেবে।

'তুমি সঙ্গে আসায় ভালই হয়েছে লক্ষ্মণ! নইলে সীতার রক্ষার জন্য আর কারও সাহায্য নিতে হত। আজকের রাতটা আমরা শুধু জল খেয়েই কাটিয়ে দেব। এই আমার ইচ্ছে।'

পাতার বিছানা তৈরি করে দিলেন সুমন্ত্র। রাম-সীতা ঘুমিয়ে পড়লেন। লক্ষ্মণ সুমন্ত্রর সঙ্গে গল্প করেই রাতটা কাটিয়ে দিলেন।

ভোর হতেই, ঘুম ভেঙে গেল রামের। লক্ষ্মণকে চুপি চুপি বললেন, 'লক্ষ্মণ! এই অযোধ্যাবাসীরা আমাদের জন্য প্রাণ দেবে। তবু আমাদের ছেড়ে যাবে না! এখন সবাই ক্লান্ত। ঘুমে অচেতন হয়ে আছে। চলো, এই সুযোগে আমরা পালাই এদের কাছ থেকে।'

সুমন্ত্র অযোধ্যাবাসীদের বিভ্রান্ত করার জন্য রথ নিয়ে একটু উত্তরে গিয়ে, আবার ফিরে এসে, সীতা আর দুই ভাইকে নিয়ে তমসা পার হলেন।

ঘুম ভাঙতেই, অযোধ্যাবাসীরা পাগলের মতো বুক চাপড়াতে লাগলেন। সুমন্ত্রের কৌশলে কাজ হল। রথের চাকার দাগ দেখে তাঁরা ধরতেই পারলেন না, কোন পথে গেছে রথ।

রথ এল শৃঙ্গবেরপুরে

কোশলের সীমানা পার হয়ে, বেদশ্রুতি, গোমতী আর স্যন্দিকা নদী পার হয়ে রথ এসে পড়ল গঙ্গার তীরে। শৃঙ্গবেরপুরের পথে গ্রামবাসীরা রাম-লক্ষ্মণ সীতাকে বনবাসে যেতে দেখে, দশরথ আর কৈকেয়ীর উদ্দেশে অজস্র গালিগালাজ আর শাপ-শাপান্ত করল। অযোধ্যার উদ্দেশে হাত জোড় করে প্রণাম জানালেন রাম।

শৃঙ্গবেরপুরের নিষাধ রাজা 'গুহ' (মতান্তরে, গুহক/গুহকমিতা) রামের খুবই

প্রিয়বন্ধু ছিলেন। খবর পেয়েই ছুটে এলেন। শোক প্রকাশের পর তিনি মহামাননীয় অতিথির সেবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

গুহ বললেন, ' রাম! তুমি এ দেশের রাজা হয়ে এ দেশ শাসন করো। আমরা তোমার সেবক হয়ে থাকব। আর এই সামান্য খাবার-দাবার তোমরা গ্রহণ করো।'

রাম বললেন, 'গুহ! তুমি যে নিজে কষ্ট করে এসেছ, তাতেই আমি খুব খুশি হয়েছি ভাই। আমাদের তো সন্ন্যাসীর মতোই ফলমূল খেয়ে মাটিতে শুতে হবে। কাজেই, তুমি এ সব খাবার-দাবার নিয়ে যাও। শুধু আমাদের ঘোড়াগুলোকে পেট ভরে খাইয়ে দাও। আহা! ওরা বাবার বড্ড প্রিয় ঘোড়া!'

সুমন্ত্রকে ফিরিয়ে দিলেন রাম

বনবাসের দ্বিতীয় রাত কাটল শৃঙ্গবেরপুরে।

রাম বললেন, 'গুহ! একটা নৌকার ব্যবস্থা করে দাও ভাই। আমরা গঙ্গা পার হব।'

সুমন্ত্র হাত জোড় করে বললেন, 'রাম! আমি এখন তবে কী করব?'

রাম সুমন্ত্রর ডান হাতটা ধরে বললেন, 'সুমন্ত্র! তুমি মহারাজের কাছে ফিরে যাও। মহারাজকে বোলো, আমরা ভালই আছি। বনবাস শেষ হলেই, তিনি আবার আমাদের দেখতে পাবেন। মা কৌশল্যা, মা কৈকেয়ী আর অন্যান্য মায়েদেরও এ কথা বোলো। মা কৌশল্যাকে আমার প্রণাম জানিয়ো।

'মহারাজকে বোলো, তিনি যেন অবিলম্বে ভরতকে রাজসিংহাসনে বসান। আর ভরতকে বোলো, সে যেন মা কৌশল্যা আর মা সুমিত্রাকে মা কৈকেয়ীর মতোই সম্মান করে।'

সুমন্ত্র বললেন, 'কিন্তু রামহীন অযোধ্যায় আমি কেমন করে ফিরে যাব? তার চেয়ে বরং, বনবাসের শেষে একেবারে তোমাদের এই রথে করে নিয়ে ফিরব।'

রাম বললেন, 'তুমি ফিরে গেলে মা কৈকেয়ীর বিশ্বাস হবে, যে, আমরা বনে এসেছি। নইলে, তিনি বাবাকে মিথ্যাবাদী ভেবে আরও কষ্ট দেবেন।'

গুহর কাছ থেকে বটের আঠা নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ মাথায় জটা তৈরি করলেন। তাঁদের নৌকা গঙ্গার ওপর দিয়ে অনেক দূরে চলে গেল। সুমন্ত্রর দুই চোখ বেয়ে অঝোরে জলের ধারা বইতে লাগল।

চোখের জল মুছতে মুছতে বিদায় নিলেন সুমন্ত্র।

গঙ্গার কাছে মানসিক করলেন সীতা

গঙ্গা পার হওয়ার সময় সীতা হাত জোড় করে গঙ্গার কাছে প্রার্থনা জানালেন, 'মা গঙ্গা! দশরথের এই ছেলে তোমার কৃপায় চোদ্দো বছর বনবাসের শেষে যেন নিরাপদে আবার ফিরে যেতে পারে ঘরে। আমি ফেরার পথে খুব আনন্দের সঙ্গে তোমার পুজো করব মা।

'এই নরশ্রেষ্ঠ যদি রাজা হন, তা হলে তোমার প্রীতির জন্য আমি ব্রাহ্মণদের লক্ষ লক্ষ গরু আর ঘোড়া দান করব। তোমাকে এক হাজার ঘট সুরা আর মাংস-দেওয়া

অন্নের (বিরিয়ানি?) ভোগ দেব। তোমার দুই তীরে যত দেবালয় আর তীর্থ আছে, সর্বত্র পুজো দেব।'

বৎস দেশে

গঙ্গা পার হয়ে রাম লক্ষ্মণকে বললেন, 'লক্ষ্মণ! তুমি সব সময় আগে আগে থেকে সীতাকে রক্ষা করবে। সীতা থাকবে তোমার পেছনে। আমি তোমাদের পেছনে থেকে তোমাদের ওপর লক্ষ রাখব।'

হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন প্রয়াগের কাছে। বৎস দেশে। বরাহ, ঋষ্য, পৃষত আর মহারুরু, এই চার রকম পশু মেরে তাদের মাংস নিয়ে গভীর বনে ঢুকলেন তিনজনে।

সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে রাম বললেন, 'লক্ষ্মণ! আজ আমাদের বনবাসের তৃতীয় রাত। জনপদের বাইরে এই প্রথম রাত। কৈকেয়ী নিশ্চয়ই এখন মহানন্দে আছেন। বাবার বৃদ্ধ বয়সে ভীমরতি দেখে আমার মনে হচ্ছে, ধর্ম আর অর্থের চেয়েও কাম অনেক বেশি শক্তিশালী। আমার বাবা যা করেছেন—এক নারীর প্ররোচনায় নিজের ছেলেকে বনে পাঠানো—কোনও মূর্খও তা করে না।'

আরও বললেন, 'ভরতও বেশ সুখেই থাকবে আশা করি। কৈকেয়ী যা সাঙ্ঘাতিক মহিলা! মা কৌশল্যাকে হয়তো বিষ খাইয়েও মেরে ফেলতে পারেন।'

কাঁদতে কাঁদতে রাম বলে চললেন, 'আমি একাই সারা পৃথিবীকে শত্রুহীন করে ফেলতে পারি। শুধু অধর্ম আর পরলোকের কথা চিন্তা করেই, তা করলাম না।'

প্রয়াগে। ভরদ্বাজের আশ্রমে

ভোর হতেই, আবার শুরু হল পথ চলা। দূরে ধোঁয়া উঠতে দেখে রাম বললেন, 'নিশ্চয়ই ওখানে কোনও মুনি ঋষির আশ্রম আছে।'

ধোঁয়া লক্ষ করে চলতে চলতে তাঁরা এসে পড়লেন প্রয়াগে। গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে। সামনেই ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম।

ভরদ্বাজ খুব খাতির করলেন সবাইকে। বললেন, 'আমি সবই শুনেছি। এ জায়গাটা ভারী সুন্দর। তোমরা বনবাসের দিনগুলো এখানেই পরমানন্দে কাটিয়ে যাও।'

রাম বললেন, 'মুনিবর! আমরা এখানে থাকলেই, কাছাকাছি নগর আর জনপদের লোকেরা সীতাকে আর আমাকে দেখতে আসবেন। দলে দলে। সে এক মহা হই চই লেগে যাবে। আমরা চাইছিলাম একেবারে নির্জন কোনও বনে থাকতে। যেখানে আমাদের উপস্থিতি কেউ টের পাবে না।'

ভরদ্বাজ বললেন, 'তা হলে তোমরা চিত্রকূটে চলে যাও। চিত্রকূট গন্ধমাদনেরই তুল্য এক সুন্দর পর্বত। বহু মুনি ঋষি সেখানে শতবর্ষ ধরে তপস্যা করে স্বর্গে গেছেন।'

চিত্রকূটের পথে

পরদিন। সকালে ভরদ্বাজের কাছ থেকে চিত্রকূটে যাওয়ার পথের হদিশ জেনে নিয়ে, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা যাত্রা শুরু করলেন চিত্রকূটের পথে। যমুনা পার হয়ে ভরদ্বাজের কথা মতো তাঁরা 'শ্যাম-বট' নামে এক বটগাছ দেখতে পেলেন। বটকে প্রণাম এবং প্রদক্ষিণ করলেন সীতা।

হরিণ মেরে এনে যমুনার তীরেই খাওয়াদাওয়া সারলেন। সে রাত সেখানেই কাটল।

পরদিন। সকালে শুরু হল আবার পথ চলা। পথের দু'পাশের শোভা মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে চললেন তাঁরা।

দেখতে দেখতে, এসে পৌঁছলেন চিত্রকূটে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটা সমতল জায়গা বেছে নিয়ে, সেখানেই দু'ভাই মিলে গাছ-পাতা দিয়ে বানালেন এক পর্ণকুটির।

একদিকে চিত্রকূট, অন্যদিকে মাল্যবতী নদী। চারপাশে সুন্দর সুন্দর ফল আর ফুলের সমারোহ। সুখেই কাটতে লাগল তিনজনের।

দেহ রাখলেন দশরথ

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে অযোধ্যায় ফিরলেন সুমন্ত্র। রথ ফাঁকা। দশরথ আর কৌশল্যা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হাজারো প্রশ্ন করে সব জেনে নিলেন সুমন্ত্রর কাছ থেকে।

কাঁদতে কাঁদতে দশরথ কৌশল্যাকে শোনালেন অন্ধমুনির অভিশাপের কথা।

অন্ধমুনির অভিশাপ

দশরথ বললেন, 'একবার মৃগয়ায় গিয়ে সরযূর তীরে জলের শব্দ শুনে ভাবলাম, কোনও হাতি বুঝি জল খাচ্ছে। ছুড়লাম এক শব্দভেদী বাণ। অমনি ভেসে এল এক কিশোর কণ্ঠের আর্তনাদ। ছুটে গিয়ে দেখি, এ কী কাণ্ড! এ তো হাতি নয়! এ যে এক মুনিকুমার! বিদ্ধ হয়েছে আমার তীরে! বেচারা! কলসিতে জল ভরতে এসেছিল সে!

'শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে ঋষিকুমার বলল, "আমার অন্ধ মা-বাবার আমিই ছিলাম একমাত্র নির্ভর। দয়া করে আমার মা-বাবাকে খবরটা দেবেন।"

'পুত্র শোকে ভেঙে পড়া সেই অন্ধমুনি অভিশাপ দিলেন, "আমার মতোই তোমাকেও একদিন মরতে হবে পুত্রশোকে।"

'কৌশল্যা! আমি বেশ বুঝতে পারছি, আজ সেই মুনির শাপ ফলবে।' বলেই 'হা পুত্র! হা রাম!' বলতে বলতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন দশরথ।

বশিষ্ঠের পরামর্শে চার দূত ছুটল ভরতকে আনতে।

অযোধ্যায় ফিরলেন ভরত

ভরত ছিলেন মামার বাড়িতে। 'কৈকয়' রাজ্যে। অযোধ্যায় যে এত কাণ্ড ঘটে গেছে এর মধ্যে, ভরত তার বিন্দু-বিসর্গও জানতেন না। দূত তাঁকে কী ঘটেছে, তা কিছুই জানাল না। শুধু 'এখুনি অযোধ্যায় ফিরতে হবে। জরুরি প্রয়োজন।' এইটুকুই বলল।

সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যার উদ্দেশে যাত্রা করলেন ভরত আর শত্রুঘ্ন। অযোধ্যায় এসে পৌঁছতে তাঁদের সাত দিন লেগে গেল।

অযোধ্যায় ফিরেই, ভরত বুঝতে পারলেন, কোথাও একটা বিরাট কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। চেপে ধরলেন কৈকেয়ীকে। ভরতের চাপের মুখে পড়ে সব খুলে বলতে হল কৈকেয়ীকে।

ভরত যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগাল করলেন মাকে। বললেন, 'নেহাত রাম আপনাকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করেন, তাই। নইলে আমি এই মুহূর্তে আপনাকে ত্যাগ করতাম। আপনি মানুষ নন। রাক্ষসী। আমি কিছুতেই আপনার এই পাপে-ভরা বাসনা পূর্ণ হতে দেব না। দাদাকে আমি ফিরিয়ে আনবই আনব। দাদাই রাজা হবেন। আমি তাঁর দাস হয়ে থাকব।'

কৌশল্যার পা ধরে কেঁদে পড়লেন ভরত-শত্রুঘ্ন।

তেলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা দশরথের মৃতদেহ তুলে এনে যমুনার তীরে যথাবিহিত সৎকার করা হল। মন্থরাকে মেরেই ফেলতেন শত্রুঘ্ন। ভরত 'স্ত্রী বধ করতে নেই' বলায় মন্থরা প্রাণে বেঁচে গেলেন।

দশরথের শ্রাদ্ধের পর তেরো দিন কেটে গেছে। চোদ্দো দিনের দিন অমাত্যরা এসে ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। ভরত বিনয়ের সঙ্গে তা প্রত্যাখান করলেন। বললেন, 'জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা হবে। এটাই আমাদের বংশের প্রথা। আমি বনে গিয়ে দাদাকে ফিরিয়ে আনব। তিনিই রাজা হবেন।'

ভরত গেলেন চিত্রকূটে

কৌশল্যা-কৈকেয়ী-সুমিত্রা সহ সব মায়েদের নিয়ে ভরত চললেন চিত্রকূটে। সঙ্গে চললেন অনেক ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, অমাত্য আর অসংখ্য সৈন্য। অযোধ্যার অসংখ্য প্রজাও চলল তাদের প্রিয় রাজপুত্রকে ফিরিয়ে আনতে।

ভরত শৃঙ্গবেরপুরে পৌঁছলে নিষাদরাজ গুহ প্রথমে ভরতকে সন্দেহের চোখেই দেখেছিলেন। পরে তাঁর সে ভুল ভেঙে গেল। সর্বতোভাবে সাহায্য করলেন তিনি ভরতকে।

গঙ্গা পার হয়ে সদলবল ভরত এলেন ভরদ্বাজের আশ্রমে।

ভরতের দুর্ভাগ্য। ভরদ্বাজও তাঁকে প্রথমে সন্দেহের চোখেই দেখলেন। পরে ভুল ভাঙল ভরদ্বাজের। ভরতের সম্মানার্থে, ভরদ্বাজ মন্ত্রবলে বিশ্বকর্মা আর অন্যান্য দেবতাদের সাহায্যে, সেই আশ্রমে ইন্দ্রের সভার মতো এক বিলাসবহুল অতিথিশালা তৈরি করলেন। নাচ-গান-সুরা-অপ্সরা-গন্ধর্ব কিছুই বাদ গেল না।

এক-একজন সৈন্যকে সাত-আটজন সুন্দরী নদীতে নিয়ে গিয়ে স্নান করাল। মদ খাওয়াল।

পানভোজন আর অপ্সরাদের সহবাসে তৃপ্ত হয়ে ভরতের সৈন্যরা বলল, 'আমরা অযোধ্যা বা দণ্ডকারণ্য, কোথাও যেতে চাই না। ভরতের মঙ্গল হোক। রামও সুখে থাকুন।'

সে রাত সেখানে কাটিয়ে ভরদ্বাজের কাছ থেকে চিত্রকূটে যাওয়ার পথনির্দেশ নিয়ে ভরত চললেন চিত্রকূটে।

দূরে একটা কোলাহল শুনতে পেয়ে, আর পশুপাখিদের ভয়ে ছুটে পালাতে দেখে, রাম বললেন, 'লক্ষ্মণ! দেখো তো কী ব্যাপার! এত হই চই কীসের?'

লক্ষ্মণ একটা শালগাছের ওপর উঠে বললেন, 'দাদা! শিগগিরি ধর্নুবাণ হাতে নিন! আর সীতাকে কোনও গুহায় লুকিয়ে রাখুন!'

'কেন?' বিস্মিত হলেন রাম।

'কেন আবার?' ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ ফুঁসতে ফুঁসতে বললেন, 'কৈকেয়ীর গুণধর ছেলে ভরত আসছেন। আমাদের মেরে রাজ্য নিষ্কণ্টক করতে। তা আমি হতে দিচ্ছি না। আজ তাঁকে সসৈন্য নিধন করব এখানে।'

রাম বললেন, 'ছিঃ! ভাই। এভাবে শুধু শুধু ভরতকে সন্দেহ করছ কেন? সে তো কোনও ভাল উদ্দেশ্য নিয়েও আসতে পারে?'

লজ্জিত হলেন লক্ষ্মণ। নিজের অন্যায় বুঝতে পারলেন।

যজ্ঞের ধূম দেখে, দূর থেকেই ভরতের মনে হল, ওখানেই আছেন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা। মায়েদের আর শত্রুঘ্ন, বশিষ্ঠ, গুহ ইত্যাদিকে সঙ্গে নিয়ে ভরত এলেন রামের আশ্রমে।

রামকে দূর থেকে দেখেই 'দাদা!' বলে ছুটে এসে রামের পা জড়িয়ে ধরলেন ভরত।

'কিন্তু এ কোন ভরত?' বিস্মিত হলেন রাম!

ভরতেরও মাথায় জটা! পরনে 'চীর!' রোগা হয়ে গেছেন! গায়ের রঙ হয়ে গেছে একেবারে কালো!

দু'ভাই দু'ভাইকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদলেন একপ্রস্থ। ভরতের মুখে দশরথের মৃত্যুর খবর পেয়ে আর একপ্রস্থ কান্নাকাটি করলেন রাম। তারপর মন্দাকিনীর তীরে গিয়ে তর্পণ আর পিণ্ডদান করলেন। প্রয়াত পিতার উদ্দেশে।

রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে এই পর্ণকুটিরে, এই ঋষি-ঋষিপত্নীদের মতো দীনহীনভাবে থাকতে দেখে, কান্নায় ভেঙে পড়লেন কৌশল্যা-কৈকেয়ী-সুমিত্রা। ভরতের তিরস্কারে এতদিনে বোধ হয় কৈকেয়ীর চৈতন্যোদয় হয়ে থাকবে। এখন বোধ হয় অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হচ্ছেন। অনুশোচনার অশ্রুপাতে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছেন।

ভরতকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন রাম। বললেন, 'তোমার মাথায় জটা! তোমার পরনে চীর! তুমি তো এ সব করতে সত্যবদ্ধ নও! তবে তোমার কেন এই বেশ ভাই?'

রামের প্রশ্নটা কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে মাথা নিচু করে কাঁপা কাঁপা গলায় ভরত বললেন, 'আপনি অযোধ্যায় ফিরে চলুন দাদা। আমি এসেছি আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে

যেতে। আপনার বিরহ আমরা আর সহ্য করতে পারছি না।'

রাম বললেন, 'তা হয় না ভরত।'

'কেন?' ভরত ফোঁস করে উঠলেন, 'আমার দুষ্টা মায়ের অন্যায় প্ররোচনায় বাবা যা বলেছেন, তা-ই মানতে হবে?'

রাম বললেন, 'ছিঃ! ভাই। মা কৈকেয়ী যা করেছেন, অজ্ঞানে করেছেন। মাতৃনিন্দা কোরো না। আজ বাবা নেই। কিন্তু তাঁর সত্য তো আছে! তা আমাকে পালন করতেই হবে। আর সেই সত্য পালনের জন্যই, আমাকে যেমন চোদ্দো বছর বনবাসে কাটাতে হবে, তোমাকেও তেমনই অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বসতে হবে।'

অনেক যুক্তি বিনিময়ের পর ভরত বললেন, 'বেশ দাদা! আমি সবার সামনে প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আপনার প্রতিনিধি হয়ে পিতৃসত্য পালনের জন্য চোদ্দো বছর জটাচীরধারী হয়ে বনবাসে থাকব। ফলমূল খাব। আপনি ফিরে গিয়ে রাজসিংহাসনে বসুন দাদা।'

রাম হেসে বললেন, 'তা হয় না ভাই। বাবা আমাকেই বনে আসতে বলেছেন। তোমাকে নয়।'

কোনও ভাবেই রামকে ফেরাতে না পেরে, অগত্যা ভরত প্রস্তাব দিলেন, 'বেশ দাদা! আপনি তবে আপনার পাদুকাজোড়া আমায় দিন। আমি তাদের মাথায় করে নিয়ে গিয়ে অযোধ্যার সিংহাসনে বসাব। আর আপনার পাদুকার দাস হয়ে রাজ্যশাসন করব।'

ভরতের জেদে, শেষ পর্যন্ত রামকে পাদুকা দিতেই হল। ভরত সে পাদুকা মাথায় তুলে নিয়ে ফিরে চললেন অযোধ্যায়।

ভরত এলেন নন্দিগ্রামে

যে-অযোধ্যায় রাম-লক্ষ্মণ-সীতা-দশরথ নেই, সে-অযোধ্যায় কিছুতেই মন বসাতে পারলেন না ভরত। চলে এলেন অযোধ্যার বাইরে। নন্দিগ্রামে। সেখানেই সোনার সিংহাসনে বসানো হল রামের পাদুকা। পাদুকারই হল অভিষেক। সেই পাদুকার সেবক হয়ে কাজকর্ম দেখাশোনা করতে লাগলেন ভরত আর শত্রুঘ্ন।

অত্রিমুনির আশ্রমে

ভরত চলে যাওয়ার পর, একদিন চিত্রকূটের তপস্বীরা এসে রামকে বললেন, 'রাবণের এক সৎ ভাই খর জনস্থানের (পঞ্চবটীর কাছে, দণ্ডকারণ্যে) ঋষিদের ওপর চরম অত্যাচার শুরু করেছে। তোমার ওপরও তার রাগ আছে। সে আমাদের ওপর যা-তা সব জিনিস ছুড়ে দিচ্ছে। দুর্বল তপস্বীদের মেরে ফেলেছে। আমরা তাই কাছাকাছি অশ্বমুনির আশ্রমে চলে যাচ্ছি। তোমরাও বরং সেখানেই চলে যাও।'

চিত্রকূটের সঙ্গে মা আর ভাইদের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তা ছাড়া, ভরতের সৈন্যরা আর পশুরা জায়গাটাকে নোংরা করে রেখে গেছে। তাই রামও আর চিত্রকূটে থাকতে চাইছিলেন না।

কাজেই, চিত্রকূট ছেড়ে রাম ভাই এবং স্ত্রীকে নিয়ে চলে এলেন। কাছেই।

অত্রিমুনির আশ্রমে। অত্রি আর তাঁর স্ত্রী অনসূয়া রামেদের খুব আদর যত্ন করলেন। অনসূয়া সীতাকে অনেক মূল্যবান উপদেশ আর শাড়ি, গয়না, সুগন্ধি অনুলেপ (সেন্ট) ইত্যাদি দিলেন। দিয়ে বললেন, 'আমার সামনেই এগুলো পরো মা। আর তুমি অশেষ সৌভাগ্যবতী হয়ে অযোধ্যাকে শ্রীমণ্ডিত করো।'

সীতা সে সব অলঙ্কার পরে প্রণাম করলেন অনসূয়াকে। সীতাকে ওই সাজে দেখে রাম-লক্ষ্মণও খুব খুশি হলেন।

পরদিন। সকালে উঠে, অত্রির নির্দেশমতো, দণ্ডকারণ্যের পথে চললেন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা।

অরণ্যকাণ্ড

বিরাধ বধ

হাঁটতে হাঁটতে, নানা বনের ভেতর দিয়ে প্রকৃতির শোভা উপভোগ করতে করতে, অনেক মুনি-ঋষির আশ্রম হয়ে একদিন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা এসে পড়লেন দণ্ডকারণ্যের গভীরে।

হঠাৎ, বীভৎস চেহারার এক বিশালদেহী রাক্ষস এসে তাঁদের সামনে উপস্থিত হল। বিরাধ!

এক মস্ত লোহার শূলে তিনটে সিংহ, চারটে বাঘ, দুটো চিতা, দশটা হরিণ আর পেল্লাই এক দাঁতাল হাতির মাথা গেঁথে সে শূলটাকে ঘোরাচ্ছে। আবার কখনও বা শূন্যে ছুড়ে দিয়ে লুফে নিচ্ছে।

বিরাধ তার বিশাল হাত বাড়িয়ে খপ্ করে সীতাকে তুলে নিল নিজের হাতের মুঠোয়। তারপর রাম-লক্ষ্মণকে বলল, 'তোদেরকে খাব। আর একে বিয়ে করব।'

ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন সীতা। রাম-লক্ষ্মণ ঝট্ করে তীর ধনুক বার করে বিরাধের দেহ ছিন্নভিন্ন করতে লাগলেন। বিরাধ সীতাকে ছেড়ে রাম-লক্ষ্মণকে দু' হাতের মুঠোয় পুরে, রক্তাক্ত দেহে বনের গভীরে চলে গেল।

সীতা চিৎকার করে বললেন, 'হে রাক্ষস! তোমায় নমস্কার করছি। দয়া করে তুমি আমাকে নিয়ে ওঁদেরকে ছেড়ে দাও।'

ব্রহ্মার বরে অস্ত্রে-অবধ্য ছিলেন বিরাধ। রাম-লক্ষ্মণ বিরাধের দু' হাত মুচড়ে ভেঙে দিলেন।

রামকে চিনতে পেরে, বিরাধ বলল, 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি তোমায় চিনেছি। আমি পূর্বজন্মে ছিলাম গন্ধর্ব "তুম্বুরু"। রম্ভার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ায়, সময়মতো, কুবেরের সভায় যাইনি। তাই কুবেরের শাপে রাক্ষস হয়ে আছি। কুবের বলেছিলেন, তোমার হাতে প্রাণ গেলে আমি শাপমুক্ত হব।

'আমি তো অস্ত্রে-অবধ্য। তোমরা আমাকে গর্তে ফেলে দিলেই, আমার দেহত্যাগ হবে। তোমরা এখান থেকে দেড় যোজন দূরে শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে চলে যাও।'

বিরাধের কথামতোই, তাকে গর্তে ফেলে দিলেন রাম-লক্ষ্মণ। দেহত্যাগ করল বিরাধ।

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা তিন জনে চললেন শরভঙ্গের আশ্রমে।

শরভঙ্গের আশ্রমে

শরভঙ্গের আশ্রমে এসে রামেরা তো একেবারেই অবাক! দেখেন, স্বয়ং ইন্দ্র সেখানে বসে আছেন এক দিব্যরথে! কিন্তু তাঁর রথের চাকা মাটি স্পর্শ করছে না!

রামকে দেখে ইন্দ্র চলে গেলেন।

শরভঙ্গ বললেন, 'আমি শুধু তোমাকে দেখব বলেই ইন্দ্রের সঙ্গে গেলাম না রাম। ইন্দ্র এসেছিলেন আমাকে নিয়ে যেতে।'

রামকে দেখে, শরভঙ্গ যোগস্থ হয়ে দেহত্যাগ করলেন। রামকে বলে গেলেন সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে যেতে।

সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে

শরভঙ্গের মতো সুতীক্ষ্ণও বসেছিলেন রাম-দর্শনের প্রতীক্ষায়। বললেন, 'রাম! তোমরা অন্য কোথাও যাবে কেন? আমার এখানেই থেকে যাও। মহাসুখে থাকবে।'

রাম বললেন, 'মুনিবর! আমাদের তো শুধু ফলমূলে চলবে না। মাংসও চাই। এখানে হরিণ মারলে আপনি মনে কষ্ট পাবেন। তাই এখানে আমাদের বেশি দিন থাকা হবে না।'

সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রম ছেড়ে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা আবার ঘুরতে লাগলেন বনে বনে। এ মুনির আশ্রম, ও ঋষির আশ্রম করে, বেশ আনন্দের সঙ্গেই, কেটে গেল বনবাসের দশটা বছর।

মুনি-ঋষিদের রাক্ষসদের হাত থেকে বাঁচাতে, এই দশ বছরে রামকে অনেক লড়াই করতে হয়েছে। তাঁর হাতে প্রাণ দিয়েছে অনেক অত্যাচারী রাক্ষস।

অগস্ত্যের আশ্রমে

অনেকদিন এ বন ও বন ঘোরাঘুরি করে, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা আবার ফিরে এলেন সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে। সুতীক্ষ্ণ মুনির কাছ থেকে জেনে নিলেন অগস্ত্য-আশ্রমে যাওয়ার সুলুক-সন্ধান।

অগস্ত্য মুনির ভাইয়ের আশ্রমে এক রাত কাটিয়ে, পরদিন এসে পৌঁছলেন তাঁরা অগস্ত্য মুনির আশ্রমে। পথে রাম লক্ষ্মণকে শোনালেন ইল্বল আর বাতাপির কাহিনী।

ইল্বল-বাতাপি কাহিনী

রাম বললেন, 'এখানে এক সময় ইল্বল আর বাতাপি নামে দুই ভয়ঙ্কর রাক্ষস থাকত। তাদের কাজই ছিল, তপস্বী ব্রাহ্মণদের কৌশলে হত্যা করা।

'ব্রাহ্মণদের নেমন্তন্ন করে আনত তারা। বাতাপি মায়াবলে ভেড়া সাজত। সেই ভেড়ার মাংস খাওয়ানো হত ব্রাহ্মণদের। তারপর ইল্বল ডাক পাড়ত, "বাতাপি! বেরিয়ে আয়!" অমনি বাতাপি ব্রাহ্মণদের পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসত।

'এই কায়দায় কত যে নিরীহ তপস্বীর প্রাণ নিয়েছে ওরা, তার কোনও সীমা সংখ্যা নেই।

'একদিন অগস্ত্যমুনি, সব জেনেশুনেই, ইল্বল-বাতাপির বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে গেলেন। ভেড়া-রূপী বাতাপির মাংস খাওয়ানো হলে, ইল্বল যথারীতি "বাতাপি! বেরিয়ে আয়! বাতাপি! বেরিয়ে আয়!" বলে ডাকাডাকি লাগিয়ে দিল। কিন্তু শত ডাকাডাকিতেও এবার বাতাপি আর বেরোল না।

'অগস্ত্য বললেন, "সে আর বেরোবে না।" ইল্বল অগস্ত্যকে খেতে এল। অগস্ত্য তাকে ভস্ম করে দিলেন। মুনি-ঋষিরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।'

পঞ্চবটীর পথে

অগস্ত্য মুনির কাছে একটা থাকবার মতো ভাল জায়গার সন্ধান চাইলেন রাম।

অগস্ত্য দিলেন সে সন্ধান। বললেন, 'এখান থেকে দু' যোজন দূরে আছে পঞ্চবটী। সেখানে যাও। আনন্দে থাকবে।'

পঞ্চবটীর পথে যেতে যেতে দশরথের বন্ধু 'জটায়ু' পাখির সঙ্গে পরিচয় হল রামেদের। জটায়ু বললেন, 'তোমরা এখানে থাকলে সর্বদা আমার সাহায্য পাবে। তোমরা কোথাও গেলে, আমি সীতাকে রক্ষা করতে পারব।'

পঞ্চবটীতে

পঞ্চবটীকে বেশ মনে ধরল। সবারই। বেশ ভাল লেগে গেল।

'আহা! বেশ জায়গা!' সীতা বললেন।

লক্ষ্মণ বাঁশ, শমী গাছের ডাল, কুশ, কাশ, তালপাতা, খেজুর পাতা ইত্যাদি দিয়ে বানালেন ছোট্ট, কিন্তু ভারী সুন্দর, এক মনোরম পর্ণকুটির। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়!

একদিন। গোদাবরীতে স্নান করতে গিয়ে লক্ষ্মণের মনে হল, ভরতও হয়তো এখন সরযূতে স্নান করছেন। ভরতের জন্য খুব মনটা খারাপ হয়ে গেল সবার।

শূর্পণখা

রাবণের বোন শূর্পণখা বিধবা হওয়ার পর দণ্ডকারণ্যে ঘুরে বেড়াতেন। রাবণ ভুল করে ভগ্নীপতি বিদ্যুজ্জিহ্বকে মেরে ফেলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে শূর্পণখাকে দণ্ডকারণ্যে স্বেচ্ছাবিহারের অনুমতি দিয়েছিলেন।

সুন্দরী নারীর বেশ ধরে এসে রামকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন শূর্পণখা। রাম সীতাকে দেখিয়ে বললেন, 'আমি তো বিবাহিত। ইনিই আমার স্ত্রী। তুমি বরং ওঁর কাছে যাও।' বলে লক্ষ্মণকে দেখিয়ে দিলেন।

অগত্যা! শূর্পণখা গেলেন লক্ষ্মণের কাছে। লক্ষ্মণও তাঁকে প্রত্যাখান করলেন। বললেন, 'তুমি কি শেষে দাসের স্ত্রী হবে?'

এবার নিজমূর্তি ধারণ করে সীতাকে খেতে এলেন শূর্পণখা। লক্ষ্মণ তরোয়াল দিয়ে তাঁর নাক আর কান কেটে দিলেন। গর্জন করতে করতে পালালেন শূর্পণখা।

খর-দূষণ-ত্রিশিরা বধ

শূর্পণখার দেখাশোনার জন্য রাবণ খর আর দূষণ নামে দুই বীর সেনাপতিকে রেখেছিলেন দণ্ডকারণ্যে। শূর্পণখা খরের কাছে এসে তাঁর নাক আর কান দেখিয়ে বললেন, 'এক্ষুনি এই অপমানের সমুচিত জবাব দিতে হবে ওই দুই হতভাগাকে।'

খরের পাঠানো চোদ্দো হাজার রাক্ষসকে এক মুহূর্তেই শমন-সদনে পাঠালেন রাম। এরপর একে একে দূষণ, ত্রিশিরা আর খর এবং রাবণের তিন জাঁদরেল সেনাপতি অসংখ্য রাক্ষসের সঙ্গে প্রাণ দিলেন রাম-লক্ষ্মণের হাতে। দেবতা এবং ঋষিরা আশীর্বাদ করলেন দুই ভাইকে।

রাক্ষস অকম্পন ছুটে গিয়ে খবরটা দিলেন রাবণকে। এবং পরামর্শ দিলেন সীতা-হরণের।

কথাটা রাবণের মনে ধরল। রাবণ গেলেন মারীচের কাছে। মারীচ দণ্ডকারণ্যেই তপস্বীর বেশে বাস করছিলেন। সীতা-হরণের চক্রান্ত রাবণকে ত্যাগ করতে বললেন মারীচ। রাবণ ফিরে গেলেন লঙ্কায়।

মায়ামৃগ

রাম-লক্ষ্মণকে সাজা না দেওয়ায় দাদা রাবণের ওপর খুব চোটপাট শুরু করলেন শূর্পণখা।

রাবণ উত্তেজিত হয়ে আবার গেলেন মারীচের কাছে। এবার রাবণের ভয়ে মারীচ সীতা-হরণে রাবণকে সাহায্য করতে রাজি হলেন।

পরিকল্পনা মতো, মারীচ এক নয়নাভিরাম মায়া-হরিণের বেশে সীতার চোখের সামনে ছোটাছুটি লাগিয়ে দিলেন।

ফাঁদে পা দিলেন সীতা। বায়না ধরলেন, 'ওই সোনার হরিণ আমার চাই। চাই-ই চাই। ও হরিণ না পেলে আমি বাঁচব না।'

রাম-লক্ষ্মণ কত বোঝালেন, 'ও সত্যিকারের হরিণ নয়। এ হরিণের বেশে নিশ্চয়ই কোনও মায়াবী রাক্ষস। এখানে এসেছে। আমাদের অনিষ্ট করতে।'

সীতা শুনলেন না কোনও কথা। হরিণ তাঁকে ধরে দিতেই হবে। বায়না ধরলেন। অগত্যা রামকে তীরধনুক হাতে বেরতেই হল। সীতার বায়না মেটাতে। লক্ষ্মণ থাকলেন সীতার পাহারায়।

(ভাগ্গিস সীতা মায়ামৃগের ছলনায় ভুলেছিলেন! নইলে সীতা-হরণ পালাই লিখতেন না বাল্মীকি। মাঠেই মারা যেত তাঁর রামায়ণ!)

রামকে অনেক দৌড় করাল হরিণ। রামের তীরে বিদ্ধ হয়ে সে রামের গলা নকল করে ডেকে উঠল, 'হা সীতা! হা লক্ষ্মণ!' বলে।

সীতার প্রাণ কেঁদে উঠল রামের জন্য। অজানা আশঙ্কায়। লক্ষ্মণকে বললেন,

'লক্ষ্মণ! তুমি এক্ষুনি ছোটো তীর ধনুক নিয়ে। উনি নিশ্চয়ই খুব বিপদে পড়েছেন।'

লক্ষ্মণ কত বোঝালেন, 'ও মায়া কণ্ঠস্বর।'

সীতা অবুঝ। কিছুতেই শুনলেন না। শেষে লক্ষ্মণকে অবিশ্বাস করে, যা মুখে এল, তা-ই বললেন। সীতার গঞ্জনায় অতিষ্ঠ হয়ে লক্ষ্মণ ছুটলেন রামের খোঁজে।

সীতাহরণ

লক্ষ্মণ রামের খোঁজে বেরিয়ে যেতেই, সন্ন্যাসীর বেশে এসে হাজির হলেন দুষ্টবুদ্ধি রাবণ। এসেই, সীতার রূপের খুব প্রশংসা করতে লাগলেন। সীতা প্রচলিত সামাজিক রীতি অনুসারে, সন্ন্যাসীকে বসতে দিলেন। ঘরে যা ছিল, কিছু খেতেও দিলেন। রাবণের প্রশ্নের উত্তরে সীতা নিজের পরিচয় দিয়ে রাবণের পরিচয় জানতে চাইলেন।

রাবণ বললেন, 'যাঁর নামে ত্রিভুবন কাঁপে, আমিই সেই রাক্ষসরাজ রাবণ। তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই। আমার প্রাসাদে আমার অনেক স্ত্রী আছে। তাদের সবার ওপরে হবে তোমার স্থান।'

সীতা তো রাগে ফেটে পড়লেন। বললেন, 'ওরে দুষ্ট রাক্ষস! তুই শৃগাল হয়ে সিংহীকে পেতে চাইছিস? আমাকে হরণ করলে রাক্ষস-বংশ ধ্বংস হবে।'

রাবণ তখন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে নিজের মূর্তি ধরলেন। বাঁ হাতে সীতার চুল আর ডান হাতে দুই উরু ধরে, সীতাকে টেনে হিঁচড়ে, আগে-থাকতে-লুকিয়ে-রাখা পুষ্পক রথে নিয়ে তুললেন। সীতা নিজেকে মুক্ত করার জন্য বৃথাই হাত-পা ছুড়তে লাগলেন। রথ আকাশে উঠতে লাগল।

হঠাৎ, জটায়ুকে এক গাছের ওপর দেখতে পেলেন সীতা। বললেন, 'হে আর্য! আপনি তো সবই দেখলেন। দয়া করে আমার স্বামী আর দেওরকে খবরটা দেবেন।'

জটায়ুর হাতে রাবণের হেনস্থা

ষাট হাজার বছরের বৃদ্ধ জটায়ু রাবণকে ভাল কথায় অনেক বোঝালেন। তাতে কাজ হল না। উল্টে রাবণ জটায়ুকে আক্রমণ করলেন। দু'জনে সাংঘাতিক যুদ্ধ বেধে গেল। বৃদ্ধ জটায়ু যুবক রাবণের সমস্ত্র অস্ত্রকে অগ্রাহ্য করে, বন্ধু দশরথের পুত্রবধূকে বাঁচাতে, আঁচড়ে কামড়ে রাবণকে অতিষ্ঠ করে তুললেন। রাবণ জটায়ুর ডানা আর পা কেটে দিলেন।

বেচারা জটায়ু! মুখ থুবড়ে পড়লেন মাটিতে।

সীতাকে লঙ্কায় নিয়ে এলেন রাবণ

জটায়ু রাবণের রথ গুঁড়ো করে দিয়েছিলেন। রাবণ, রথ ছাড়াই, মায়াবলে সীতাকে নিয়ে আকাশপথে চললেন লঙ্কায়।

(তা হলে? তা হলে, পরে আবার এই পুষ্পকে করেই কী করে রাম লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় ফিরলেন? তবে কি পরে রাবণ তাঁর লোক পাঠিয়ে ভাঙা পুষ্পককে তুলে

নিয়ে গিয়ে মেরামত করিয়ে নিয়েছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর কিন্তু রামায়ণে নেই।)

পথে, এক পাহাড়ের চূড়ায়, পাঁচটা বানরকে দেখে, সীতা তাঁর উত্তরীয় আর গয়নাগাটি ফেলে দিলেন সেখানে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, রাম-লক্ষ্মণ তাঁর সন্ধানে এখানে এলে, বানররা এই সব জিনিস তাঁদেরকে দেখাবে।

দেখতে দেখতে সীতাকে নিয়ে লঙ্কায় এসে পৌঁছলেন রাবণ। রাবণ ভয়ঙ্করী রাক্ষসীদের রাখলেন সীতার পাহারায়। বললেন, 'আমার অনুমতি ছাড়া সীতার কাছে কাউকে যেতে দেবে না। সবাই এঁকে মান্য করবে। কেউ সীতার অসম্মান করলে তাকে বধ করা হবে।'

আট রাক্ষসবীরকে রাম-লক্ষ্মণের ওপর নজর রাখতে জনস্থানে পাঠালেন রাবণ। তারপর সীতার কাছে এসে নিজের শক্তি আর ঐশ্বর্যের পরিচয় দিতে দিতে বললেন, 'রামের আশা ছেড়ে দিয়ে তুমি আমাকে বিয়ে করো সুন্দরী! সুখে থাকবে। রাম তো ভিখারি। তার কী আছে? দেখো আমার কত ঐশ্বর্য! তুমিই না হয় লঙ্কার সিংহাসনে বোসো। আমি তোমার দাস হয়ে থাকব।'

সীতা বললেন, 'ওরে পাপী! আমাকে স্পর্শ করলে রাম তোকে আর আস্ত রাখবেন না!'

রাবণ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, 'আচ্ছা! তাই নাকি? এখনও এই তেজ তোমার? শোনো। এক বছর সময় দিলাম। এর মধ্যে যদি আমার অনুগত না হও, তবে তোমাকে টুকরো টুকরো করে কাটা হবে। তোমার মাংস রান্না করে আমরা খাব। বুঝেছ?'

সীতার পাহারাদারনি ভয়ঙ্করী সব রাক্ষসীদের উদ্দেশে রাবণ বললেন, 'তোমরা নরমে-গরমে যে করেই হোক এঁকে রাজি করাও।'

সীতার খোঁজে

মারীচকে মেরে, কুটিরে ফিরে এসে রাম-লক্ষ্মণ দেখলেন, সীতা নেই। সীতার শোকে রাম পাগলের মতো হয়ে গেলেন। অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'এ জীবন আর রাখতে চাই না।'

লক্ষ্মণ বললেন, 'শুধু শুধু কাঁদছেন কেন দাদা? তার চেয়ে বরং চলুন, খুঁজে দেখি, সীতা কোথায় আছেন। আমার বিশ্বাস, তিনি আমাদের সঙ্গে মজা করার জন্য নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছেন।'

রাম তখন গোদাবরীর কাছে জানতে চাইলেন সীতার সন্ধান। বললেন, 'সীতা কোথায় তুমি জানো গোদাবরী?'

রাবণের ভয়ে কোনও জবাব দিল না গোদাবরী। রাম কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'লক্ষ্মণ! আমি মাকেই বা কী বলব, আর সীতার বাবাকেই বা কী জবাব দেব?'

হরিণরা রামের প্রশ্নে আকাশের দিকে তাকাতে লাগল। রাবণ যে-পথে সীতাকে নিয়ে গেছে, তারাও সেই পথে চলতে লাগল। তখন রাম-লক্ষ্মণ সেই পথ ধরে চলতে লাগলেন।

'এ কী! লক্ষ্মণ! দেখো দেখো! এই দেখো সীতার পদচিহ্ন! এই দেখো ভাঙা ধনু আর তূণীর! ওই দেখো! রথের টুকরো! ওই তো আমার সীতার গয়না! ফুলের মালা!

এই দেখো রক্ত! রাক্ষসরা নিশ্চয়ই তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে খেয়েছে! তাকে পাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করেছে। হায় ভগবান! হায় সীতা!'

(এই তো দেখতে পাচ্ছি, রাম রথের টুকরো দেখতে পেয়েছেন। ওদিকে রাবণ যে বাকি পথ রথে যাননি, মায়াবলে উড়ে গেছেন, রথ ছাড়াই, তা আগেই দেখেছি। তা হলে রাম কী করে পুষ্পকে চড়েই লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় ফিরলেন?

এ বড় রঙ্গ যাদু। তবে কি রাবণের দু'-দুখানা পুষ্পক বিমান ছিল? পুষ্পক এক এবং পুষ্পক দুই? রহস্যই রয়ে গেল। কারণ, বাল্মীকি স্বয়ং এ রহস্য ভাঙেননি যে।)

সীতার খবর দিলেন জটায়ু

কিছুদূর এগোতেই, রক্তাক্ত জটায়ুকে দেখতে পেলেন দু' ভাই।

রাম বললেন, 'এই পাখিই আসলে রাক্ষস। এ-ই নিশ্চয়ই সীতাকে খেয়েছে।' বলে জটায়ুকে মারতে গেলেন রাম।

রামকে নিজের পরিচয় আর সীতাহরণের সব খবর দিয়ে, দেহত্যাগ করলেন জটায়ু। বাবার বন্ধুর দেহ দাহ করে গোদাবরীতে তর্পণ করলেন দু' ভাই।

অয়োমুখী

জনস্থান থেকে তিন ক্রোশ দূরের ক্রৌঞ্চারণ্যে পৌঁছতেই, অয়োমুখী নামে এক রাক্ষসী লক্ষ্মণকে জড়িয়ে ধরে বিয়ে করতে চাইলেন। লক্ষ্মণ তার নাক আর স্তন কেটে দিলে, সে চিৎকার করে পালাল।

কবন্ধ

বন আরও গভীর হল। রাম-লক্ষ্মণ যেন বিপদের গন্ধ পেলেন। এমন সময় বন কাঁপিয়ে তাঁদের সামনে এসে হাজির হল ভয়ঙ্কর কদাকার এক রাক্ষস। কবন্ধ।

তার গলা-মাথা নেই! পেটের ভেতর মুখ! তার মধ্যে একটাই চোখ! আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলছে!

কবন্ধ রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় পেয়ে বললেন, 'আমি দানব শ্রী-র ছেলে। দনু। ঋষির অভিশাপ আর ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে আমার এই অবস্থা। হে রাম! তুমি আমাকে মেরে আমার দেহটা আগুনে পুড়িয়ে দাও। তাহলেই আমি শাপ মুক্ত হয়ে যাব।'

রাম তা-ই করলেন। পূর্বরূপ ফিরে পেয়ে দনু বললেন, 'তোমরা ঋষ্যমূক পর্বতে বানররাজ সুগ্রীবের কাছে যাও। তিনি তোমাদেরকে সীতা-উদ্ধারে সাহায্য করবেন।

শবরী

কবন্ধের কথা মতো চলতে শুরু করে, পম্পা নদীর তীরে শবরীর আশ্রমে এসে পৌঁছলেন দু' ভাই। তপস্বীদের বর ছিল, রামের দর্শন পেলে শবরী মুক্ত হবেন। রাম-

দর্শনে তৃপ্তা বৃদ্ধা শবরী আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে স্বর্গে গেলেন। শেষ হল শবরীর এতদিনের প্রতীক্ষা।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

ঋষ্যমূক পর্বতে

ঋষ্যমূক পর্বতের শোভা দেখতে দেখতে সীতার জন্য উথাল-পাথাল হল রামের হৃদয়। লক্ষ্মণ তাঁকে খুব সাহস দিতে লাগলেন। দূর থেকে তাঁদের দেখেই, ভয়ে লুকিয়ে পড়লেন সপার্ষদ সুগ্রীব। দু' ভাইকে বালীর চর মনে হল সুগ্রীবের।

হনুমান

সুগ্রীব তাঁর বিশ্বস্ত মন্ত্রী হনুমানকে পাঠালেন। কৌশলে রাম-লক্ষ্মণের প্রকৃত পরিচয় জেনে আসতে। রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে কথা বলে হনুমান সব জানতে পারলেন। বালী যে সুগ্রীবকে তাঁর রাজ্য থেকে তাড়িয়ে তাঁর (সুগ্রীবের) স্ত্রী রুমাকেও জোর করে বিয়ে করেছেন, সে কথাও রাম-লক্ষ্মণকে শোনালেন হনুমান।

সুগ্রীব

রাম-লক্ষ্মণকে পিঠে করে বয়ে সুগ্রীবের কাছে নিয়ে এলেন হনুমান। বললেন সব কথা।

রাম কথা দিলেন, বালীকে বধ করে সুগ্রীবকে তাঁর স্ত্রী-সহ রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন।

সুগ্রীব কথা দিলেন, সীতা-উদ্ধারে রামকে তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন।

সুগ্রীব আকাশ থেকে ফেলা, এবং সযত্নে তুলে রাখা, সীতার উত্তরীয় আর অলঙ্কার এনে রামকে দেখালেন। রাম সে সব হাতে নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

লক্ষ্মণ বললেন, 'আমি সীতার অন্য অলঙ্কার চিনি না। তবে আমি তাঁর নূপুর চিনতে পেরেছি। কারণ, আমি চিরকাল তাঁর পাদবন্দনাই করে এসেছি। কখনও মুখের দিকে তাকাইনি।'

রাম চোখের জল মুছে বললেন, 'সুগ্রীব! বালীর সঙ্গে তোমার ঝগড়াই বা লাগল কেন?'

সুগ্রীব বললেন, 'আগে আমাদের খুবই ভাব ছিল। দাদা আমাকে অত্যন্ত স্নেহই করতেন। একদিন নারীঘটিত কোনও ব্যাপারে, দাদার সঙ্গে অসুর দুন্দুভীর ছেলে মায়াবীর তুমুল লড়াই বাধে। মায়াবী ঢোকে গিয়ে এক গুহার মধ্যে। তাকে তাড়া করে দাদাও ঢোকে সেই গুহায়। ফিরে না আসা পর্যন্ত গুহার মুখে আমাকে পাহারায় থাকতে বলে দাদা।

'আমি এক বছর পাহারায় ছিলাম। তবুও দাদা ফিরলেন না। একদিন গুহার মুখ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরতে লাগল। অসুরদের তর্জনগর্জন শোনা যেতে লাগল। কিন্তু দাদার কোনও সাড়া নেই। "দাদা! দাদা!" বলে কত ডাকলাম। তবুও সাড়া

নেই।

'বুঝলাম, দাদা মারা গেছেন। অসুরদের আটকাতে আমি পাথর দিয়ে গুহার মুখ বন্ধ করে ফিরে এলাম। কাউকেই কিছু বললাম না। মন্ত্রীরা সব জানতে পারলেন। তাঁরা আমাকেই রাজা বানালেন।

'এ ভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। হঠাৎ, একদিন দাদা ফিরে এলেন! এসেই, আমাকে একতরফা ভাবে তিরস্কার করতে লাগলেন। আমি কত করে বোঝালাম। তাঁর পায়ে রাজার মুকুট রেখে, তাঁর দাসত্ব স্বীকার করে, যা যা ঘটেছিল, সব খুলে বললাম।

'দুর্ভাগ্য আমার। তিনি আমার কথা কিছুই বিশ্বাস করলেন না। আমাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন। আমার স্ত্রীকে কেড়ে নিলেন।

সেই থেকে প্রাণভয়ে আমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। মতঙ্গ মুনির শাপে বালী এই ঋষ্যমুক পর্বতে ঢুকতে পারেন না। মুনির শাপ, এখানে এলেই বালী মারা যাবেন।'

বালী-বধ

রামের কথামতো, সুগ্রীব একদিন কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এসে তুমুল আস্ফালন করে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। বালী প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসেই, সুগ্রীবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দু'জনে তুমুল লড়াই হল।

রাম ঝোপের আড়ালে তীর ধনুক নিয়ে প্রস্তুত। কিন্তু দুই ভাইয়ের চেহারা হুবহু একই রকম হওয়ায়, কে বালী, আর কে সুগ্রীব, রাম চিনতেই পারলেন না। তাই তীরও আর ছোড়া হল না। বালী-বধও হল না। সুগ্রীবকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে পারলেন না রাম।

লড়াইয়ে হেরে সুগ্রীব পালালেন। আশ্রয় নিলেন ঋষ্যমূক পর্বতে। মতঙ্গ মুনির শাপে বালীর সেখানে প্রবেশ নিষেধ। কাজেই, প্রাণে বাঁচলেন।

রামের ওপর খুব অভিমান হল সুগ্রীবের। রাম সুগ্রীবকে বোঝালেন, কেন বালীকে মারতে পারেননি। বললেন, 'তোমাদের দু' ভাইয়ের চেহারা যে হুবহু একই রকম। আমি শত চেষ্টাতেও দু'জনকে আলাদা করতে পারিনি।'

চিহ্ন হিসেবে, সুগ্রীবের গলায় গজপুষ্পী লতা বেঁধে দিলেন লক্ষ্মণ। সুগ্রীব আবার গেলেন কিষ্কিন্ধ্যায়। আবার যুদ্ধে আহ্বান জানালেন দাদা বালীকে।

স্ত্রী 'তারা' পই পই করে বারণ করলেন বালীকে যুদ্ধে যেতে। তারার নিষেধ অগ্রাহ্য করে ছুটে এলেন বালী। কিছুক্ষণ লড়াই চলার পর, বনের আড়ালে লুকিয়ে থাকা রামের বাণে ধরাশায়ী হলেন বালী।

বালী বললেন, 'রাম! তোমাকে পরম ধার্মিক বলেই জানতাম। কিন্তু এখন দেখছি, তোমার মতো অধার্মিক আর নেই। তুমি এ ভাবে আড়ালে লুকিয়ে থেকে আমাকে মারলে! তুমি সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য, সুগ্রীবকে খুশি করার জন্য, এই হীন কাজ করলে! অথচ, আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে, আমি এক্ষুনি রাবণকে গলায় দড়ি বেঁধে তোমার কাছে টেনে আনতে পারতাম! একদিনেই তোমার সীতাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিতে পারতাম!'

রাম বললেন, 'বালী! তুমি তোমার পুত্রবধূসমা সুগ্রীব-পত্নী রুমাকে ধর্ষণ করেছ! তাই তোমার এই শাস্তি। আর তা ছাড়া দেঁখো, সুগ্রীবের কাছে আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম, তাকে রাজ্য আর স্ত্রী ফিরিয়ে দেব। ক্ষত্রিয় হয়ে সে প্রতিশ্রুতি আমি লঙ্ঘন করি কী করে বলো? তাই তোমাকে এই শাস্তি ভোগ করতে হল। তবে, তোমার ছেলে অঙ্গদকে মানুষ করার দায়িত্ব সুগ্রীব আর আমি নিলাম।'

'তারা' খুব কান্নাকাটি করলেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন রাম।

রাজা হলেন সুগ্রীব

সুগ্রীব রাজা হলেন। যুবরাজ হলেন অঙ্গদ। রুমাকে ফিরে পেলেন সুগ্রীব। সেকালের প্রচলিত রীতি অনুসারে, তারাকেও বিয়ে করলেন সুগ্রীব। বিলাসে মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন সুগ্রীব।

সুগ্রীবকে ভর্ৎসনা করলেন লক্ষ্মণ। বললেন, 'বাঃ! রাজ্য আর স্ত্রীকে ফিরে পেয়ে একেবারে প্রমোদে মন ঢেলে দিলে যে! সীতা-উদ্ধারের কথা মনে আছে তো?'

বর্ষা গেল। শরৎ এল। বিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়ে সীতা-উদ্ধারের কথা বেমালুম ভুলেই গেলেন সুগ্রীব।

সুগ্রীবের অকৃতজ্ঞতায় প্রচণ্ড রেগে গেলেন লক্ষ্মণ। রামকে বললেন, 'ওই সুগ্রীবের প্রত্যুপকারের আশায় আপনি বসে আছেন? ওর ওপর আমার আর একটুও আস্থা নেই। আমি আজই ওকে যমালয়ে পাঠাব।'

রাম বললেন, 'ছিঃ! লক্ষ্মণ! তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না। তুমি বরং ভালভাবে সুগ্রীবকে বোঝাও। সে যেন তার কর্তব্য পালন করে।'

লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের প্রাসাদের দিকে আসতে দেখে অঙ্গদ ছুটে এসে প্রণাম জানালেন।

লক্ষ্মণ বললেন, 'যাও অঙ্গদ! তোমার কাকাকে বলো, আমি এসেছি। জরুরি দরকার।'

অঙ্গদ ছুটলেন। সুগ্রীবকে খবর দিতে। কিন্তু কাকে খবর দেবেন অঙ্গদ? সুগ্রীব তখন তারার সঙ্গে ভোগসুখে মত্ত। এ সব বাজে কথা শোনার সময় নেই তাঁর।

অঙ্গদকে একা ফিরে আসতে দেখে, লক্ষ্মণ প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তাঁর ধনুকে দিলেন টঙ্কার। এবার ভয় পেলেন সুগ্রীব। মদোন্মত্তা তারাকে পাঠালেন লক্ষ্মণকে শান্ত করতে।

স্খলিতবসনা তারাকে দেখে লজ্জায় মাথা নিচু করলেন লক্ষ্মণ। মাথা নিচু করেই সুগ্রীবের শ্রাদ্ধ করতে লাগলেন।

মদ খেতে খেতেই, নির্লজ্জের মতো তারা বললেন, 'তুমি তো কামতত্ত্বের কিছুই বোঝো না! তাই এ সব বলছ। এসো, আমার সঙ্গে ভেতরে এসো।'

ভেতরে গিয়ে লক্ষ্মণ তো অপ্রস্তুত। দেখেন সুগ্রীব রুমাকে জড়িয়ে ধরে, বহু সুন্দরী বানরী পরিবৃত হয়ে, বসে আছেন।

লক্ষ্মণের তীব্র ভর্ৎসনায় সুগ্রীবের চেতনা হল। তিনি তাঁর কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইলেন। লক্ষ্মণও সুগ্রীবকে দুর্বাক্য বলার জন্য মার্জনা চাইলেন।

সেনা সংগ্রহের আদেশ দিলেন সুগ্রীব

সারা পৃথিবী থেকে অবিলম্বে বানর-সেনা সংগ্রহের জন্য হনুমানকে আদেশ দিলেন সুগ্রীব।

হনুমানের নির্দেশে, দূত ছুটে গেল সব দেশে দেশে। তারা ফিরেও এল সুখবর নিয়ে। জানাল, সব দেশ থেকেই সেনারা আসছে।

সসৈন্য সুগ্রীব এসে প্রণাম জানালেন রামের চরণে। রাম সুগ্রীবকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ভাই! ধর্ম, অর্থ, কাম ভোগ করার জন্য আলাদা আলাদা সময় আছে। যাঁর সে সময়-জ্ঞান আছে, একমাত্র তিনিই তো রাজা!'

লজ্জিত সুগ্রীব বানর-সেনাকে দেখিয়ে বললেন, 'এঁরা সবাই রাবণবধ করে সীতাকে উদ্ধার করার জন্য যুদ্ধ করতে এবং প্রয়োজনে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।'

রাম খুব খুশি হয়ে বললেন, 'তোমার সাহায্য পেলে আমি যুদ্ধে সব শত্রুকেই জয় করতে পারব।'

হঠাৎ, চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। শতবলি, সুষেণ, তার, কেশরী, নল, নীল, গবয়, গয়, গবাক্ষ, জাম্ববান, হনুমান, অঙ্গদ ইত্যাদি বীরদের নেতৃত্বে কোটি কোটি বানর আর ভালুক সেনা এসে হাজির হল। মহা হই চই লাগিয়ে দিল তারা।

সুগ্রীব তাদের শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়ে চারপাশের বনেবাদাড়ে আশ্রয় নিতে বললেন।

সীতার খোঁজে বানরবাহিনী

সুগ্রীব রামকে বললেন, 'এই বানরসেনা আপনার আদেশ পালনের জন্য তৈরি। দয়া করে আপনি এদের আদেশ করুন। বলুন এরা কী করবে।'

রাম বললেন, 'সুগ্রীব! দুটো জিনিস আমি জানতে চাই। এক, সীতা বেঁচে আছেন কি না। আর দুই, রাবণ কোথায় থাকে। এই দুটো প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেলেই, লক্ষ্মণ আর আমি আমাদের পরবর্তী কর্তব্য স্থির করব।

'আর একটি কথা। তুমি বলছ, আমাকে এদের আদেশ দিতে। কিন্তু তা কেন হবে? তুমিই এদের প্রভু। আদেশ যা দেওয়ার, তা তুমিই দেবে। লক্ষ্মণ বা আমি—আমরা কেউই এদের আদেশ দিতে পারি না।'

সীতার খোঁজে সুগ্রীব 'বিনত' নামের এক বানরবীরকে বিশাল সেনাবাহিনী দিয়ে পাঠালেন পুবে।

অঙ্গদের অধিনায়কত্বে অঙ্গদ, নীল, হনুমান, জাম্ববান, গয়, গবাক্ষ ইত্যাদি মহা-মহাবীরদের পাঠালেন দক্ষিণে।

শ্বশুর সুষেণের নেতৃত্বে দু' লক্ষ বানর সেনাকে পাঠালেন পশ্চিমে। মহর্ষি মরীচির ছেলে মারীচও তাদের সঙ্গে গেলেন।

(এ মারীচ যে মায়ামৃগ রূপধারী তাড়কার ছেলে মারীচ নন, তা তো বোঝাই যাচ্ছে।)

শতদল নামে এক বানরবীরকে পাঠালেন উত্তরে। সঙ্গে দিলেন শত সহস্র সেনা।

সুগ্রীব সকলকেই বললেন, 'যে ভাবেই হোক, সীতার খোঁজ আনতেই হবে। সর্বত্র

তন্ন তন্ন করে খুঁজবে।' তারপর হনুমানের হাত ধরে বললেন, 'হে মহাবীর! জল, স্থল, অন্তরীক্ষ বা দেবলোক—তোমার অগম্য তো কোনও জায়গা নেই। আর তোমার মতো শক্তিশালী, জ্ঞানী, বিচক্ষণ আর বুদ্ধিমানও আর কেউ নেই। কাজেই, তোমাকেই সীতা-উদ্ধারের উপায় বার করতে হবে।'

রাম বুঝলেন, হনুমানই বানরকুলে সর্বশ্রেষ্ঠ। নিজের নাম লেখা একটা আংটি খুলে হনুমানের হাতে দিলেন রাম। বললেন, 'সীতাকে যদি কখনও খুঁজে পাও, তবে তাঁকে আমার এই আংটিটি দেখিয়ো। এই আংটি দেখলেই তিনি বুঝতে পারবেন, যে, তুমি আমারই প্রতিনিধি।'

রামের দেওয়া আংটি মাথায় ঠেকিয়ে, রামের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়ে, হনুমান 'জয় রাম!' বলে যাত্রা করলেন সীতার খোঁজে।

তাপসী স্বয়ম্প্রভা

উত্তর আর পূর্ব দিকে যে সব বানররা গিয়েছিল, তারা সীতাকে খুঁজে না পেয়ে, হতাশ হয়ে ফিরে এল।

এদিকে 'তার' আর অঙ্গদকে নিয়ে হনুমান দক্ষিণের বিন্ধ্য পর্বত (এ বিন্ধ্য মধ্যভারতের বিন্ধ্য নয়।) অঞ্চল চষে ফেললেন। হতাশ তাঁরাও।

'ঋক্ষবিল' নামে এক প্রকাণ্ড গহ্বরের কাছে এসে পড়লেন তাঁরা। সীতাকে রাবণ এর মধ্যে লুকিয়ে রাখেননি তো? দেখাই যাক। সেই অজানা রহস্যময় গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন সবাই। হনুমান, অঙ্গদ, 'তার' এবং তাঁদের সঙ্গীরা সবাই।

সেই গহ্বরে ঢুকে তো তাঁরা অবাক! চারপাশে শুধু সোনা-রুপো-হিরে-মুক্তোর ছড়াছড়ি! সোনা-রুপোর সাত তলা বাড়ি! সোনা-রুপোর পালঙ্ক! অপূর্ব সরোবর!

হঠাৎ সামনে এলেন এক বৃদ্ধা তাপসী। পরনে 'চীর' (টুকরো কাপড় বা গাছের ছাল) আর 'অজিন' (হরিণের চামড়া)।

হনুমান ভক্তিনম্রচিত্তে জিগ্গেস করলেন, 'আপনি কে মা? এ সব বাড়ি-ঘরদোরই বা কার? আমরা বড্ড পরিশ্রান্ত! আর ক্ষুধার্ত মা! কিছু খাবার পেলে বড় ভাল হত।'

তাপসী বললেন, 'আমি স্বয়ম্প্রভা। মেরুসাবর্ণীর মেয়ে। হেমা (রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীর মা) আমার সখী। দানবকুলের বিশ্বকর্মা ময় ব্রহ্মার বরে এই সব সুরম্য প্রাসাদ, সরোবর, বাগান, রাস্তাঘাট ইত্যাদি তৈরি করেছেন।

'দানব ময় আমার সখী অপ্সরা হেমার প্রতি আসক্ত হওয়ায়, ইন্দ্র বজ্র ছুড়ে ময়কে মেরে ফেলেন। হেমা আমাকে অনুরোধ করে, এই সব বাড়ি-ঘর-দোর দেখাশোনা করতে। তাই আমি এখানেই আছি।

'আমি তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করছি। খেয়েদেয়ে তোমরা বোলো, কেন তোমরা এখানে এসেছ।'

খাওয়া-দাওয়ার পর বানররা সব খুলে বললেন স্বয়ম্প্রভাকে।

স্বয়ম্প্রভা বললেন, 'এখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরোনো খুব মুশকিল। তোমরা বরং চোখ বোজো। আমি তোমাদের নিরাপদ জায়গায় রেখে আসছি।'

অঙ্গদের হতাশা

চোখ খুলেই, বানররা দেখলেন, তাঁরা সমুদ্রের তীরে এসে পড়েছেন। বিন্ধ্যের গায়ের গাছপালায় বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। ফাগুনের পরশ লেগেছে ফুলে ফুলে। পাতায় পাতায়। প্রকৃতি যেন উজাড় করে দিয়েছে নিজেকে।

অঙ্গদ বললেন, 'আমরা বেরিয়েছি কার্ত্তিকের শেষে। এখন বসন্ত এসে গেল। এক মাসের মধ্যে আমাদের সীতাকে খুঁজে বার করার কথা ছিল। আমরা পারিনি। এ অবস্থায় কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরলে সুগ্রীব নিশ্চয়ই আমাদের বধ করবেন। তার চেয়ে আমরা বরং এখানেই না খেয়ে মরব, সেও ভাল। তবু ওই নিষ্ঠুরটার হাতে প্রাণ দেব না।'

অন্য বানররাও প্রায় সবাই অঙ্গদের কথায় সায় দিলেন।

হনুমান অঙ্গদকে তিরস্কার করে বললেন, 'জাম্ববান, নীল, সুহোত্র আর আমি সুগ্রীবের কাছেই ফিরে যাব। তুমিও 'তার'-এর কথায় এ রকম হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ো না। সুগ্রীব তোমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। সে কথা ভুলে যেয়ো না। এতটা অকৃতজ্ঞ হোয়ো না।'

অঙ্গদ তবুও তাঁর কাকার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারলেন না। অন্য বানরদের সঙ্গে মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগলেন।

সম্পাতি দিলেন সীতার সন্ধান

জটায়ুর দাদা সম্পাতি থাকতেন বিন্ধ্য পর্বতেরই এক গুহায়। গুহা থেকে বেরিয়ে, বানরদের দেখেই বললেন, 'ভালই হল। একটা করে বানর মরবে। আর আমি তাদের খাব।'

অঙ্গদ হনুমানকে ডেকে বললেন, 'সাক্ষাৎ যম আসছেন। আমাদের খেতে। সীতার জন্য জটায়ু যেমন করেছিলেন, আমরাও তেমনি আত্মোৎসর্গ করব।'

ভাই জটায়ুর নাম কানে যেতেই, চমকে উঠলেন সম্পাতি! বললেন, 'ওহে! সূর্যের তেজে আমার ডানা পুড়ে গেছে। তোমরা আমাকে নামাও।'

অঙ্গদ নামালেন সম্পাতিকে। নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন সীতাহরণের সব কথা।

সম্পাতি বললেন, 'তোমরা যে-জটায়ুর কথা বলছিলে, সে আমারই ভাই।

'বৃত্রাসুরবধের পর ইন্দ্রকে জয় করতে জটায়ু আর আমি আকাশে উঠি। সূর্যের তাপে জটায়ু অবসন্ন হয়ে পড়লে, আমি তাকে ডানা মেলে রক্ষা করি। সূর্য আমার ডানা পুড়িয়ে দেয়। আমি এই বিন্ধ্য পর্বতে এসে পড়ি। সেই থেকে এখানেই আছি। ভাইয়ের আর কোনও খবর নিতে পারিনি।

'একদিন দেখলাম দুরাত্মা রাবণ এক সুন্দরী তরুণীকে হরণ করে আকাশ-পথে লঙ্কার দিকে যাচ্ছে। সেই তরুণী খুব চেঁচাচ্ছিল 'হা রাম!' 'হা লক্ষ্মণ!' বলে। তখনই বুঝলাম, সে নিশ্চয়ই সীতা।

'আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, সীতা লঙ্কার অশোক কাননে রয়েছেন। রাক্ষসীরা তাঁকে ঘিরে রয়েছে। তোমরা আর দেরি না করে এখনই সমুদ্র-লঙ্ঘনের

আয়োজন করো। আর আমাকেও সমুদ্রের ধারে নিয়ে চলো। আমি ভাই জটায়ুর উদ্দেশে তর্পণ করব।'

বানররা সম্পাতিকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে এলেন। জটায়ুর উদ্দেশে তর্পণ করলেন সম্পাতি।

'আমার ছেলে সুপার্শ্বও রাবণকে দেখেছিল, সীতাকে নিয়ে আকাশপথে যাচ্ছিলেন রাবণ।' সম্পাতি বলতে লাগলেন, 'সে সীতা বা রাবণ, কাউকেই চিনতে পারেনি। সে দুজনকেই আমার খাদ্য হিসেবে ধরে আনতে গিয়েছিল। রাবণের মিনতিতে তাদের ছেড়ে দেয়। এর জন্য তাকে পরে আমি যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করি।

'এখানে নিশাকর নামে এক মুনি ছিলেন। তাঁর বর ছিল, ঠিক সময়ে আমার আবার ডানা গজাবে। স্বাভাবিক দৃষ্টি আর শক্তিও ফিরে পাব।

'এই দেখো! আমার আবার ডানা গজাচ্ছে! আবার আমি স্বাভাবিক ভাবেই দেখতে পাচ্ছি। শরীরে শক্তিও পাচ্ছি।' বলতে বলতে আকাশে উড়ে গেলেন সম্পাতি।

বানররা সীতার খোঁজ পেয়ে মহানন্দে হই চই করতে করতে আরও দক্ষিণে চলল।

সাগর লঙ্ঘনের দায়িত্ব নিলেন হনুমান

বানরদের মধ্যে শলাপরামর্শ চলতে লাগল। 'কে সাগর পার হবেন?'

শেষে জাম্ববান হনুমানকে বললেন, 'হে মহাবীর! তুমি কেন চুপ করে বসে আছ? এ কাজ একমাত্র তুমিই করতে পারো। আর তুমি যদি না পারো, তা হলে আমাদের মধ্যে কেউই সাগর লঙ্ঘন করতে পারব না।'

হনুমান বিনয়ের সঙ্গে রাজি হলেন। বিশাল করলেন তাঁর দেহ। তারপর বললেন, 'আমি ওই মহেন্দ্র পর্বতের চূড়া থেকেই লাফ দেব।'

সুন্দর কাণ্ড

সাগর লঙ্ঘন

সূর্য, ইন্দ্র, পবন ইত্যাদি দেবতা আর ভূতদের স্মরণ করে, 'জয় রাম!' বলে রামের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে, হনুমান দিলেন এক মহালাফ। তাঁর পায়ের চাপে মহেন্দ্র পর্বত ভেঙে পড়তে লাগল। চারদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠল। বড় বড় সব গাছ শেকড় উপড়ে ছুটে চলল তাঁর পিছু পিছু।

দেবতা-গন্ধর্ব-দানবরা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। সূর্য তাপ দেওয়া বন্ধ করলেন। পাছে রোদের তাপে হনুমানের কষ্ট হয়! বিঘ্ন ঘটে সীতা-উদ্ধারের পুণ্য কাজে!

হনুমানের বাবা পবন তাঁকে হাওয়া করতে লাগলেন।

সাগরের আদেশে, তাঁর গর্ভ থেকে মাথা তুলে দাঁড়ালেন মৈনাক পর্বত। উদ্দেশ্য, ক্লান্ত হনুমানকে একটু বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া।

হনুমান কিন্তু বিশ্রাম নিলেন না। মৈনাকের মাথায় হাত ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করে, সোজা লঙ্কার পথেই চললেন।

হনুমানের শক্তি পরীক্ষা করতে চাইলেন দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ আর মহর্ষিরা।

তাঁদের কথায় নাগমাতা সুরমা ভয়ঙ্করী এক রাক্ষসীর রূপ ধরে হনুমানকে তাঁর মুখে দেবনির্দিষ্ট খাদ্য হিসেবে প্রবেশ করতে বললেন।

হনুমান বললেন, 'এখন সময় নেই। সীতা উদ্ধারে যাচ্ছি। আমি কথা দিচ্ছি, ফেরার পথে আমি তোমার মুখে ঢুকব।'

সুরমা নাছোড়বান্দা। অগত্যা! হনুমান বললেন, 'বেশ! আমায় শরীর প্রবেশ করাবার মতো বড় হাঁ করো তুমি।'

সুরমা মস্ত এক হাঁ করতেই, হনুমান মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে বুড়ো আঙুলের মতো ছোট করে, ঢুকে গেলেন সুরমার মুখে। তক্ষুনিই আবার বেরিয়ে এসে বিশাল আকার ধারণ করে বললেন, 'আমি কথা রেখেছি। এবার আমায় পথ ছাড়ো।'

স্বমূর্তি ধরলেন সুরমা। আশীর্বাদ করে পথ ছেড়ে দিলেন হনুমানকে।

হঠাৎ, হনুমান দেখলেন, কে যেন তাঁকে টেনে ধরেছে। তলায় তাকিয়ে দেখেন, তাঁর ছায়া ধরে তাঁকে টেনে ধরেছে রাক্ষসী সিংহিকা। সেও হনুমানকে খেতে চায়। হনুমান হঠাৎ দেহকে ছোট করে তার পেটে ঢুকেই, বুক ফাটিয়ে বেরিয়ে এলেন তাঁর বিশাল দেহ নিয়ে। মারা গেল সিংহিকা।

লঙ্কায় এলেন হনুমান

বহু দূর থেকে সবুজে ঢাকা লঙ্কা দ্বীপকে দেখতে পেলেন হনুমান। পাছে রাক্ষসরা তাঁর বিশাল দেহ দেখে তাঁর উপস্থিতি টের পেয়ে যায়, তাই নিজের দেহকে ছোট করে ফেললেন মুহূর্তের মধ্যে।

দেখতে দেখতে তিনি এসে পড়লেন লঙ্কায়। নারকোল আর অন্যান্য গাছগাছালিতে ঢাকা লম্ব পর্বতে এসে নামলেন তিনি। সেখান থেকেই দেখতে পেলেন ইন্দ্রের অমরাবতীর মতো লঙ্কাপুরীকে।

লঙ্কাপুরী

বিশ্বকর্মার নিজের হাতে তৈরি লঙ্কাপুরীকে হনুমান যতই দেখেন, ততই বিস্মিত হন। মনে মনে ভাবেন, 'রাম এখানে এসে কী করবেন? এ লঙ্কাকে জয় করা যে দেবতাদেরও অসাধ্য! যাই হোক, আগে তো সীতাকে খুঁজে বার করি, উদ্ধারের উপায় পরে ভাবা যাবে।'

সন্ধে নামতেই, দেহটাকে একটা বেড়ালের মতো ছোট করে, হনুমান লঙ্কাপুরীতে ঢুকে পড়লেন।

ঢুকে দেখেন, 'কী আশ্চর্য! সব বাড়ির দরজা সোনার! সিঁড়িগুলো সব নীলকান্তমণি দিয়ে তৈরি! সব জায়গা দীপের আলোয় উজ্জ্বল! সে এক অপরূপ শোভা! যেন ইন্দ্রের অমরাবতী!'

লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'লঙ্কেশ্বরী'র সঙ্গে একপ্রস্থ লড়াই হল হনুমানের।

লঙ্কেশ্বরী বললেন, 'ব্রহ্মা আমায় বলেছিলেন, কোনও বানরের কাছে যখন আমি হেরে যাব, তখনই বুঝতে হবে, লঙ্কার মহাবিপদ আসন্ন। বুঝেছি। সীতার জন্যই

লঙ্কার সর্বনাশ হবে। তুমি যাও বানর। আমি আর তোমার পথ আটকাব না।'
লঙ্কার বিশাল বিশাল প্রাসাদ আর রাজপথ দেখতে দেখতে চললেন হনুমান।

রাবণের প্রাসাদ

ঘুরতে ঘুরতে হনুমান এসে পড়লেন রাবণের প্রাসাদে। দেবতাদের পুজো হচ্ছে মন্দিরে। কোথাও বা ভেরী, মৃদঙ্গ, শঙ্খ বাজছে।

সোনা-রুপোয় মোড়া দরজা! ভারী সুন্দর সব ঘর!

প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, বিরূপাক্ষ, বিদ্যুন্মালী, শুক, সারণ, ইন্দ্রজিৎ, ধূম্রাক্ষ ইত্যাদি রাক্ষসবীরদের ঘরগুলো সব এক এক করে দেখলেন হনুমান। তারপর এলেন রাবণের মহলে।

রাবণের মহল দেখে তো হনুমানের চক্ষু চড়কগাছ! 'এ যে স্বর্গকেও হার মানায়! কী সব বাড়ি! ওই তো রাবণের পুষ্পক রথ পড়ে আছে!' হনুমান একবার চেপে নিলেন তাতে।

(তা হলে কী দাঁড়াল? জটায়ুর ভেঙে চূর্ণ করে দেওয়া পুষ্পক আবার ফিরে এসেছে রাবণের কাছে? নাকি এ অন্য পুষ্পক?)

এক যোজন (আট মাইলেরও বেশি) লম্বা আর আধ যোজন (চার মাইলেরও বেশি) চওড়া রাবণের প্রাসাদ! সদা-সতর্ক রক্ষীরা পাহারা দিচ্ছে চারপাশে। রাবণের রাক্ষসী স্ত্রীরা আর 'বলপ্রয়োগে-হরণ-করে-আনা' রাজকন্যারা এখানেই থাকেন।

রাবণের শোয়ার ঘরে এলেন হনুমান। স্ফটিকের এক বেদির ওপর হাতির দাঁত, সোনা আর বৈদুর্যমণি দিয়ে তৈরি করা এক পালঙ্কে শুয়ে আছেন রাবণ। ঘুমোচ্ছেন। রাবণকে দেখেই, ভয়ে দু' পা পেছিয়ে গেলেন হনুমান।

রাবণের পায়ের কাছে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন তাঁর অসংখ্য সুন্দরী মহিষীরা।

পাট রানি মন্দোদরী শুয়েছিলেন পাশের এক খাটে। ঘর আলো করে।

'ওই তো সীতা!'

মন্দোদরীকে দেখে সীতা বলে ভুল করলেন হনুমান। সীতাকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দে তুড়ি লাফ লাফালেন হনুমান। মহানন্দে নাচগান লাগিয়ে দিলেন। বানরোচিত ডিগবাজি খেলেন।

(ভাগ্যিস হনুমান তখনই ধরা পড়ে যাননি! ধরা পড়লে আর কি সীতার সঙ্গে তাঁর দেখা হত? নাকি সীতা-উদ্ধার হত? যথেষ্ট সন্দেহ আছে।)

হঠাৎ মোহভঙ্গ হল হনুমানের।

'ইনি কি সীতা? সীতাই যদি হবেন, তবে এত নিশ্চিন্ত মনে রাবণের শোয়ার ঘরে তিনি নিদ্রা যাবেন কেন? ইনি নিশ্চয়ই সীতা নন। আর কেউ হবেন।'

একবার বিবেকের দংশনও হল হনুমানের।

'আমি আকুমার ব্রহ্মচারী। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করে এসেছি এতাবৎ কাল। জীবনে কখনও কোনও পরস্ত্রীর মুখ পর্যন্ত দর্শন করিনি। আর আজ এ ভাবে এত স্খলিতবসনা নারীকে তাদের শোয়ার ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখলাম? আমার কি ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ হল?'

আবার নিজেকেই নিজে আশ্বাস দিলেন, 'কই? না তো। আমার মধ্যে কোনও বৈকল্য দেখা দেয়নি তো। এত শিথিলবসনা পরস্ত্রীকে দেখেও, আমার মধ্যে কোনও কামভাব জেগে ওঠেনি তো! তবে আর ভয় কী? আর সীতাকে খুঁজতে হলে তো নারীদের মধ্যেই তাঁকে খুঁজতে হবে। আর আমি তো নিষ্কাম ভাবেই তা করব। তবে আমার আর ভয় কী?'

অশোকবনে হনুমান

অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও, সীতাকে না পেয়ে, কিছুক্ষণের জন্য হতাশায় ভেঙে পড়েছিলেন হনুমান। কিন্তু সে সাময়িক। নিজেই নিজেকে বোঝালেন। হতাশা কেটে গেল।

সামনেই এক অশোকবন দেখতে পেলেন হনুমান। ভাবলেন, 'আচ্ছা, এখানে তো দেখিনি! দেখাই যাক না একবার।'

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রুদ্র, যম, অনিল, চন্দ্র, অগ্নি আর মরুদ্‌গণকে প্রণাম জানিয়ে হনুমান এক লাফে এসে উঠলেন অশোকবনের এক পাঁচিলের মাথায়। সেখান থেকে এক লাফে এক 'শিংশপা' (শিশু) গাছের ডালে।

(হনুমান প্রথমেই সীতাকে অশোকবনে খুঁজলেন না কেন, ঠিক বোঝা গেল না। কারণ, সম্পাতি তো নির্দিষ্ট করেই বলে দিয়েছিলেন, যে, সীতা অশোকবনেই আছেন।)

শিংশপা গাছে বসে এ দিক ও দিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ হনুমানের নজরে পড়ল, যে-গাছে তিনি বসে আছেন, ঠিক তার নীচেই, একজন স্ত্রীলোক বসে আছেন। অনাহারের ছাপ তাঁর চোখে-মুখে। গায়ের আগুন-রং যেন ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে। পরনে ময়লা এক কাপড়। খালি কাঁদছেন। আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন।

হনুমান নিশ্চিত হলেন, 'ইনিই সীতা। রাম যে-সব অলঙ্কারের কথা বলেছিলেন, তা সবই এঁর গায়ে আছে। শুধু ঋষ্যমূক পর্বতে যা ফেলে দিয়েছিলেন, সে-সব নেই। হ্যাঁ, রামের যোগ্যা সহধর্মিণীই বটে!' হনুমানের চোখে জল এল।

সীতার চারদিকে ভয়ঙ্কর চেহারার সব রাক্ষসীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারও একটা চোখ আর একটা কান। কারও বা নাক মাথার ওপর। কারও মুখ যদি শুয়োরের মতো, কারও তবে বাঘের মতো। তারা সারাক্ষণ শুধু মদ আর মাংস খেয়ে যাচ্ছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য! ভাবা যায় না!

পিতৃসত্য পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ স্বামীর সঙ্গে বনবাসে এসে এই বীভৎস অবস্থায় পড়তে হবে, দুঃস্বপ্নেও তা কখনও কল্পনা করতে পারেননি আজীবন আদরে-বিলাসে মানুষ-হওয়া রাজনন্দিনী এবং রাজকুলবধূ সীতা।

রাবণ এলেন সীতার কাছে

রাত ভোর হতে চলল। ব্রহ্মরাক্ষসরা বেদপাঠ করতে লাগলেন। মাঙ্গলিক শব্দে আকাশ বাতাস মুখরিত হল।

ঘুম ভাঙতেই, সীতার কথাই মনে এল রাবণের। ছুটলেন অশোকবনে। পেছন

পেছনে চললেন রাবণের অসংখ্য স্ত্রীরা। আর মদ, পাখা, প্রদীপ, আসন ইত্যাদি হাতে দাসীরা।

হনুমান সব দেখছিলেন। তখনও ভোরের আলো ভাল করে ফোটেনি। বুঝলেন, এই দুরাত্মাই রাবণ, যাঁকে কিছু আগেই, ঘুমন্ত অবস্থায় দেখেছেন তিনি।

ঝড়ে কলাগাছ যেমন কাঁপতে থাকে, রাবণকে দেখে সীতাও তেমনি কাঁপতে লাগলেন।

রাবণ বললেন, 'তুমি আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছ কেন সুন্দরী? পরস্ত্রীহরণ আর পরস্ত্রীগমন রাক্ষসদের স্বধর্মের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু তা বলে তোমার অনিচ্ছায় আমি তোমাকে স্পর্শও করতে চাই না।

'স্রষ্টা তোমাকে সৃষ্টি করার পর আর রূপ সৃষ্টি করেননি। তাই তোমার কোনও উপমা নেই। এত রূপ স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মাকেও নিশ্চয়ই অস্থির করে তুলবে। তুমি আমাকে গ্রহণ করো। সর্বসুখ লাভ করতে পারবে।'

সীতা একটা ঘাস দিয়ে রাবণ আর নিজের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে বললেন, 'আমার দিকে হাত না বাড়িয়ে, নিজের স্ত্রীর দিকে মন দাও। নিজের স্ত্রীতে যে তৃপ্ত নয়, সমাজে সবাই তাকে ধিক্কার দেয়। তোমার পাপে লঙ্কা ধ্বংস হবে। বজ্র বা যম তোমাকে ক্ষমা করলেও, রামের হাত থেকে তোমার নিস্তার নেই। চিন্তা নেই, শিগগিরি তাদের তীর এখানে এসে পড়বে।'

ক্রুদ্ধ রাবণ বললেন, 'আমি তোমার যত প্রশংসা করছি, তুমি আমাকে ততই গালি দিচ্ছ! বেশ! তবে শুনে রাখো সীতা, আজ থেকে দু' মাসের মধ্যে যদি তুমি আমার শয্যাসঙ্গিনী না হও, তবে আমার রাঁধুনীরা তোমাকে টুকরো টুকরো করে রান্না করে আমার প্রাতরাশের ব্যবস্থা করবে।'

সীতা ভয় পেয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'লঙ্কায় বোধ হয় তোমাকে সুবুদ্ধি দেওয়ার মতো কেউই নেই। এ পাপের হাত থেকে তোমার নিস্তার নেই। কুবেরের ভাই আর বিশ্ববিখ্যাত বীরপুরুষ হয়েও, রামের স্ত্রীকে কাপুরুষের মতো লুকিয়ে চুরি করেছ কেন, তার জবাব দেবে কি?'

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে রাবণ সীতার পাহারায় নিযুক্ত রাক্ষসীদের আদেশ দিলেন, 'নরমে-গরমে যেভাবেই হোক, একে আমার বশে নিয়ে এসো তোমরা।'

রাবণের অন্য এক স্ত্রী 'ধান্যমালিনী' রাবণের হাত ধরে টানতে টানতে বললেন, 'মহারাজ! তুমি আমাকে নিয়ে আনন্দ করো। এই সামান্য দীনা, বিবর্ণা মানুষীকে তোমার কী দরকার? যে তোমায় চায় না; তুমি তার জন্যই পাগল। দেখে রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। যে চায়, একমাত্র তার সঙ্গেই ভালবাসা সুখকর হয়।'

এই বলে রাবণকে সীতার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন ধান্যমালিনী।

ত্রিজটা

রাবণ চলে গেলেন। একজটা, হরিজটা, বিকটা, দুর্মুখী ইত্যাদি রাক্ষসীরা সীতাকে খুব বোঝাতে লাগলেন। রাবণের মতো পাত্র পাওয়া খুবই ভাগ্যের ব্যাপার। কাজেই, সীতার রাবণের গলায় মালা দিতে আপত্তির কোনও যুক্তিই নেই। বরং, তা না করলে

সীতাকে প্রাণ দিতে হবে।

সীতা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'মানুষী কি কখনও রাক্ষসের স্ত্রী হতে পারে? তোমরা বরং আমাকে খেয়ে ফেলো। আমার দুঃখ নেই। কিন্তু খবরদার! ও কথা বোলো না।'

রাক্ষসীরা সীতাকে নানা ভাবে বশে আনার চেষ্টা করল। প্রাণনাশের হুমকি দিল। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হল না। পবিত্রতাস্বরূপিণী সীতা নিজের সিদ্ধান্তে হিমালয়ের মতোই অনড়, অটল হয়ে রইলেন।

বৃদ্ধা রাক্ষসী 'ত্রিজটা' ঘুম থেকে উঠেই ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন সীতার কাছে।

এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে রাক্ষসীদের বললেন, 'শোন তোরা! আজ আমি এক দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখেছি! দেখেছি, সোনার লঙ্কা ধ্বংস হয়ে গেছে। রামের জয় হয়েছে! রাবণ, কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ—সবাইকে নিয়েই ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখেছি।' বলে ত্রিজটা সবিস্তার তাঁর স্বপ্নবৃত্তান্ত শোনালেন সবাইকে।

ত্রিজটা সবাইকে বললেন, 'ভাল চাস, তো এখনও সময় আছে। তোরা সবাই মিলে এঁর কাছে ক্ষমা চা।'

ত্রিজটাকে আশ্বস্ত করে সীতা বললেন, 'তোমার স্বপ্ন যদি সত্যি হয়, তা হলে আমি তোমাদের রক্ষা করব।'

সীতা-হনুমান সংবাদ

গাছের ডালে বসে সবই দেখছিলেন, সবই শুনছিলেন হনুমান। সীতার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তিনি আপনমনেই রামের জন্ম থেকে সীতাহরণ পর্যন্ত রাম-কথা বলতে লাগলেন।

বিস্মিতা সীতা বিস্ফারিত নেত্রে, বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে দুলতে, এ দিক ও দিক তাকাতে লাগলেন।

'এখানে রাম নাম! এ আমি ভুল শুনছি না তো?'

একটু নীচের ডালে নেমে এলেন হনুমান। সীতাকে প্রণাম জানিয়ে তাঁর শোকের কারণ জানতে চাইলেন। জানতে চাইলেন সীতার পরিচয়।

সীতা বললেন, 'আমি জনকনন্দিনী সীতা! রাম আমার স্বামী! দশরথ আমার শ্বশুর!'

একে একে তাঁর বনবাসের সব কাহিনীই সংক্ষেপে হনুমানকে শোনালেন সীতা।

হনুমান বললেন, 'আমি পবননন্দন হনুমান! রামের বার্তাবহ! রাম-লক্ষ্মণ ভাল আছেন। তাঁরা আপনার কুশলপ্রার্থী মা।'

হনুমান আরও নীচের ডালে এলেন। ভয় পেলেন সীতা। ভাবলেন, রাবণই, বানরের ছদ্মবেশে তাঁর মন পরীক্ষা করতে এসেছেন। আবার ভাবলেন, বোধ হয় স্বপ্ন দেখছেন।

হনুমান সীতার বিশ্বাস অর্জনের জন্য সীতাকে রাম-লক্ষ্মণের চেহারার বর্ণনা দিলেন। সীতাহরণের পরে যা যা ঘটেছে, সব শোনালেন। আর সব শেষে, রামের নাম লেখা সেই আংটিটি সীতাকে দিলেন।

এবার সীতার বিশ্বাস হল। সীতা বললেন, 'তুমি যে অসামান্য বীর, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু হে মহাবীর! রাম আমাকে উদ্ধারের জন্য ক্রোধের আগুনে সব পুড়িয়ে ছারখার করছেন না কেন? লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, সবাই আমাকে উদ্ধারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বেন তো? ভরত সেনা পাঠাবেন তো? রামের অস্ত্রে, সপার্ষদ রাবণের নিধন আমি দেখতে পাব তো?'

হনুমান বললেন, 'মা! আপনি যে এখানে আছেন, রাম তো তা জানতেন না! এখন জানবেন। আর জানতে পারলেই, এই দুর্বিনীত রাক্ষসদের নির্মূল করে অবিলম্বে আপনাকে এই লঙ্কাপুরী থেকে উদ্ধার করে অযোধ্যায় নিয়ে যাবেন। আপনার শোকে তিনি মদ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। শুধু সামান্য ফলমূল খান। সর্বদাই হা সীতা! হা সীতা! করছেন।'

সীতা বললেন, 'তিনি যে আমাকে মনে রেখেছেন, এ সুখের। কিন্তু তিনি যে শোকে কষ্ট পাচ্ছেন, এ বড় দুঃখের। রাবণের দেওয়া শর্ত মতো আর মাত্র দু' মাস আমার বাঁচার অধিকার। এর মধ্যেই যা করার করতে হবে।'

হনুমান বললেন, 'আপনার খবর পেলেই, রাম এখানে বিশাল বানর আর ভালুক বাহিনী নিয়ে ছুটে আসবেন মা! আপনি রাজি থাকলে, আমি এক্ষুনি আপনাকে পিঠে করে নিয়ে যেতে পারি রামের কাছে। চাই কী রাবণ সমেত গোটা লঙ্কাটাকেই পিঠে করে নিয়ে যেতে পারি তাঁর কাছে।'

সীতা অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি এই এতটুকু বানর হয়ে আমায় পিঠে বয়ে নিয়ে যাবে! কী করে তা সম্ভব?'

হনুমান তখন, সীতার মনে বিশ্বাস জাগাতে, অতিকায় রূপ ধারণ করলেন।

সীতা বললেন, 'হ্যাঁ। তুমি পারবে। কিন্তু আমি যে রাম ছাড়া আর কোনও পুরুষের অঙ্গ স্পর্শ করতে পারি না হনুমান! রাবণ যে অসহায় অবস্থায় আমার ওপর বলপ্রয়োগ করেছিল, সে কথা আলাদা। তুমি বরং রামের সঙ্গে এসো। বীরের মতো যুদ্ধ করে আমাকে তোমরা উদ্ধার কোরো। সেটাই আমাদের সবার পক্ষে অনেক বেশি সম্মানের হবে।'

হনুমান বললেন, 'বেশ! তাই হবে মা। তবে রামের মতো আপনিও আমাকে কিছু চিহ্ন দিন মা, যা দেখালে রাম বিশ্বাস করবেন, যে, আমি সত্যিই আপনার কাছে এসেছিলাম।'

রামের মনে বিশ্বাস আনতে, সীতা হনুমানকে শোনালেন 'জয়ন্ত কাকের কাহিনী'। হনুমানকেও সে কাহিনী শোনাতে বললেন রামকে। যাতে রাম বুঝতে পারেন, যে, হনুমান সত্যিই সীতার সঙ্গে দেখা করেছেন।

রাম ছাড়া একমাত্র সীতাই জানেন সে কাহিনী। কাজেই, তৃতীয় ব্যক্তি হনুমানের মুখে সে কাহিনী শুনলেই, রাম নিশ্চিত হবেন, যে, সীতাই হনুমানকে সেই কাহিনী শুনিয়েছেন। অর্থাৎ, সীতার সঙ্গে অবশ্যই হনুমানের দেখা হয়েছে।

(বাল্মীকির অসামান্য বুদ্ধিদীপ্ত মনের পরিচায়ক এই 'কাহিনী-অভিজ্ঞান'-এর পরিকল্পনা।)

একাক্ষ জয়ন্ত কাকের কাহিনী

সীতা বললেন হনুমানকে—

'চিত্রকূটে থাকার সময় একবার এক কাক আমার বুকে ঠুকরে দিয়ে পালায়। ন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠি আমি। রাম একটা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে তাতে ব্রহ্মাস্ত্র জুড়ে ।লেন। দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল ঘাস। জ্বলন্ত সেই ঘাস সর্বলোকে তাড়া করে বড়াল সেই কাককে।

'ইন্দ্র বা মহর্ষিরা কেউই বাঁচাতে পারলেন না কাককে। কাক তখন রামেরই রণাগত হল। রাম তাকে প্রাণে মারলেন না। কিন্তু সেই ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে কাকের ান চোখটা নষ্ট হয়ে গেল।

'সেই কাক আসলে ছিল ইন্দ্রের ছেলে জয়ন্ত। এক চোখ হারিয়ে তার নাম হল একাক্ষ"।

'তুমি রামকে এই কাহিনী বোলো। আর লক্ষ্মণকে আমার হয়ে কুশল প্রশ্ন কোরো। ার এই নাও এই দিব্য চূড়ামণি (মাথায় পরার টিক্‌লি)। এই চূড়ামণি দেখলেই, ামাকে মনে পড়বে রামের। তাঁকে বোলো, যত তাড়াতাড়ি পারেন, যেন আমাকে এই ঃসহ রাক্ষসপুরী থেকে উদ্ধার করেন।'

সীতাকে প্রণাম জানিয়ে সীতার কাছ থেকে বিদায় নিলেন হনুমান।

লঙ্কা কাঁপালেন হনুমান

সীতার দর্শন পেয়ে, মহাফুর্তিতে অশোকবন লণ্ডভণ্ড করতে লাগলেন হনুমান।

খবর গেল রাবণের কাছে। রাবণ তো রেগেই আগুন। হনুমানকে শায়েস্তা করতে াঠালেন তাঁর আশি হাজার ভয়ঙ্কর চাকরকে। হনুমান তাঁদের সবাইকেই যমালয়ে াঠালেন।

এবার এলেন রাবণের মন্ত্রী প্রহস্তের ছেলে জম্বুমালী। তাঁরও ভবলীলা সাঙ্গ হল।

চিন্তিত রাবণ এবার পাঠালেন তাঁর ডাকসাইটে পাঁচ বীর সেনাপতি বিরূপাক্ষ, ূপাক্ষ, দুর্ধর্ষ, প্রঘস আর ভাসকর্ণকে। এক পাহাড়ের চূড়া দিয়ে তাঁদেরকেও পিটিয়ে াতু করে দিলেন হনুমান।

রাবণ অস্থির হয়ে উঠলেন। ছেলে অক্ষকে পাঠালেন এবার। অক্ষ খুবই বীরত্ব দেখাচ্ছিলেন। বালক অক্ষকে মারতে মন চাইল না হনুমানের। কিন্তু, অক্ষের উপর্যুপরি আক্রমণে বিরক্ত হয়ে, শেষে তাঁকে এক হাজার পাক ঘুরিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলেন। প্রাণ দিলেন অক্ষও।

ধরা দিলেন হনুমান

রাবণের নির্দেশে, এবার তাঁর বীরশ্রেষ্ঠ ছেলে ইন্দ্রজিৎ ছুটলেন হনুমানকে জব্দ করতে। ইন্দ্রজিৎ জানতেন, ব্রহ্মার বরে হনুমান অবধ্য। তাই তিনি শুধু হনুমানকে বাঁধবার জন্যই ব্রহ্মাস্ত্র ছুড়লেন।

অস্ত্রবন্ধনে ইচ্ছে করেই ধরা দিলেন হনুমান। মনে মনে বেশ খুশিই হলেন। ভাবলেন, ভালই হল। রাবণের সঙ্গে বেশ কথাবার্তা বলা যাবে।

চারপাশ থেকে দলে দলে রাক্ষস ছুটে এসে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললেন হনুমানকে। গালাগালি আর মারও জুটল কপালে।

এদিকে ইন্দ্রজিৎ কপাল চাপড়াতে লাগলেন। কারণ, তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র-বন্ধন অকেজো হয়ে গেল। ব্রহ্মাস্ত্রের নিয়ম হল, অন্য অস্ত্র প্রয়োগ করলে ব্রহ্মাস্ত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আর কাজ করে না। হনুমান দুর্বলের ভান করে পড়ে রইলেন। পালালেন না। রাবণের সঙ্গে দেখা করতে হবে যে!

হনুমানের উপদেশ

হনুমান আর রাবণ, দুজনেই দুজনকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

হনুমান ভাবলেন, 'কী রূপ! কী তেজ এঁর! অধার্মিক না হলে ইনি তো ত্রিলোকের অধিপতি হতে পারতেন!'

রাবণ ভাবলেন, 'ইনি কি ভগবান নন্দী? যিনি আমার উপহাসে রেগে গিয়ে আমাকে শাপ দিয়েছিলেন? নাকি ইনি অসুররাজ বাণ?'

প্রহস্ত অভয় দিলেন হনুমানকে। বললেন, 'সত্যি কথা বলো। মিথ্যে বললে প্রাণ যাবে।'

হনুমান নিজের পরিচয় দিলেন। আর সীতা-উদ্ধারের জন্যই যে তাঁর লঙ্কায় আসা, তাও জানালেন রাবণকে। বললেন, 'তোমার দর্শন দুর্লভ জেনেই, আমি অশোকবন ধ্বংস করেছি। যাতে তোমার দেখা পাই। তুমি তো অনেক তপস্যা করেছ রাবণ! তোমার মতো লোকের কি পরস্ত্রীকে এভাবে নিজের বাড়িতে আটকে রাখা উচিত?'

রাবণ ভাবতেই পারেন না, তাঁরই সভায় দাঁড়িয়ে এ ভাবে কেউ তাঁর কাজ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন তুলতে পারে।

হনুমান বলে চললেন, 'ত্রিভুবনে দেবাসুর-মানুষ-যক্ষ-রক্ষ কারও সাধ্য নেই রামকে হারাতে পারে। আর স্বর্গের লক্ষ্মী সীতা লঙ্কার পক্ষে কালরাত্রির মতো।

'তপস্যার বলে তুমি দেবাসুরের অবধ্য। কিন্তু রাম মানুষ। আর সুগ্রীব বানর। আমিও একাই গোটা লঙ্কাটাকে ধ্বংস করতে পারি। কিন্তু রাম নিজেই তাঁর শত্রুকে বধ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। তাই আমি সারা লঙ্কা ধ্বংস করলাম না। রাম এই ত্রিলোককে ধ্বংস করে আবার সৃষ্টি করতে পারেন। কাজেই তুমি সীতাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দাও।'

বিভীষণের উপদেশ

হনুমানের কথায় তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন রাবণ। হনুমানকে বধ করার আদেশ দিলেন।

বাধা দিয়ে বিভীষণ বললেন, 'এ কী করছেন দাদা! আপনি এত শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে শেষে কিনা অবধ্য দূতকে বধ করবেন?'

রাবণ বললেন, 'যে পাপী, তাকে বধ করলে আবার পাপ কীসের? একে আমি বধ

করবই করব।'

বিভীষণ বললেন, 'হে লঙ্কেশ্বর! এই বানর আপনার প্রবল শত্রু। এবং এ অনেক ক্ষতি করেছে লঙ্কার। ঠিক কথা। কিন্তু, যতই হোক, এ তো দূত! বড় জোর দূতকে বেত মারা যায়। বা তার মাথা মুড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে কখনওই তাকে বধ করা যায় না। প্রাণে মারা যায় না।

'আর তা ছাড়া, এ তো বার্তাবহ মাত্র। যারা একে পাঠিয়েছে, ভাল হোক, মন্দ হোক, এ তো শুধু তাদের কথাই আবৃত্তি করেছে। শাস্তি যদি দিতেই হয়, তবে সেই দুই রাজপুত্রকে দিন। তাদের এখানে বেঁধে আনতে আপনার বীর সেনাপতিদের পাঠান। কিন্তু নিজে এত বড় শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে, দয়া করে এমন অশাস্ত্রীয় কাজ করবেন না।'

হনুমানের লেজে আগুন

বিভীষণের কথায় খানিকটা রাগ পড়ল রাবণের। বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ বিভীষণ। একে হত্যা করা উচিত হবে না। তবে, একে কিছু শাস্তি দিতেই হবে। এক কাজ করো। লেজই তো বানরের সবচেয়ে প্রিয় অঙ্গ! এর লেজ পুড়িয়ে দাও।'

রাবণের আদেশ পেয়েই, রাক্ষসরা তেলে-ভেজানো কাপড় হনুমানের লেজে জড়িয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দিল। সেই অবস্থায় রাক্ষসরা শাঁখ আর ভেরী বাজাতে বাজাতে হনুমানকে নিয়ে সারা লঙ্কাপুরী পরিক্রমা করতে লাগলেন।

হনুমান ভাবলেন, 'ভালই হল। রাতে ভাল দেখতে পাইনি। এখন দিনের আলোয় লঙ্কার পথ-ঘাট-বাড়ি-ঘর-দোর ভাল করে দেখে নেওয়া যাবে।'

রাক্ষসরা মহানন্দে সে দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলেন। রাক্ষসীদের মুখে হনুমানের এই নির্যাতনের কথা শুনলেন সীতা। অগ্নিদেবের কাছে প্রার্থনা জানালেন; 'হে অগ্নিদেব! আমি যদি পতিব্রতা হই, যদি তপশ্চর্যা পালন করে থাকি, তবে তোমার কৃপায় হনুমানের লেজ তোমার স্পর্শে দগ্ধ না হয়ে, যেন শীতল হয়।'

'কী আশ্চর্য! আমার লেজে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে! কিন্তু কোনও তাপ লাগছে না তো! বরং মনে হচ্ছে, যেন লেজে বরফ পড়ছে! এ নিশ্চয়ই রাম, সীতা আর বাবা পবনের কাজ!' অবাক হলেন হনুমান।

সোনার লঙ্কা ছারখার

হঠাৎই, প্রতিশোধ-স্পৃহায়, হনুমান নিজেকে এক ঝটকায় মুক্ত করে এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি, এ গাছ থেকে ও গাছ করে লাফাতে লাগলেন। তাঁর লেজের আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল সোনার লঙ্কা।

শুধু বিভীষণের বাড়িটিকে বাদ দিয়ে, বাদবাকি সবার বাড়িতে আগুন লাগালেন হনুমান।

(বেছে বেছে বিভীষণের বাড়িটিকেই বা কেন যে বাদ দিলেন হনুমান, তা ঠিক বোঝা গেল না। কারণ, বিভীষণ এখনও তো রামের পক্ষ নেননি। তবে কি বিভীষণ সম্বন্ধে আগেই খোঁজ-খবর নিয়ে নিয়েছিলেন হনুমান? প্রশ্ন থেকেই যায়।)

রাবণ, কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ—কারও বাড়িই বাদ গেল না। অগ্নিশিখা পাহাড় ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেল। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল সারা লঙ্কা।

দেব-ঋষি-গন্ধর্ব-বিদ্যাধররা হনুমানের স্তব করতে লাগলেন।

মনের সুখে অগ্নিকাণ্ড চালিয়ে, সাগরের জলে লেজ ডুবিয়ে, আগুন নেবাতে নেবাতে তীব্র অনুশোচনা হল হনুমানের মনে।

'ছিঃ! ছিঃ! এ আমি কী করলাম? ক্রোধের বশে এত বড় অন্যায় করলাম? মা সীতা? তিনি কি আগুনের হাত থেকে বেঁচেছেন? তাঁর যদি কিছু হয়? তবে এই সাগরের জলেই আমি আত্মাহুতি দেব। তিনি নিশ্চয়ই অক্ষত দেহেই আছেন!'

ফিরে গেলেন হনুমান

সেই শিংশপা (শিশু) গাছের তলায় সীতাকে দেখে আশ্বস্ত হলেন হনুমান। সীতার চরণে প্রণাম জানিয়ে, সীতাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উদ্ধারের আশ্বাস দিয়ে, সীতার কাছ থেকে বিদায় নিলেন তিনি।

অরিষ্ট পর্বতের চূড়ায় উঠে নিজের দেহকে বিশাল করলেন হনুমান। তাঁর পায়ের চাপে দশ যোজন চওড়া আর তিরিশ যোজন উঁচু অরিষ্ট পর্বত ঢুকে গেল মাটির নীচে।

মহালাফ দিলেন হনুমান। পথে মৈনাকের মাথায় হাত বুলিয়ে, মহাবেগে চললেন মহেন্দ্র পর্বতের দিকে।

'ওই দেখা যাচ্ছে মহেন্দ্র পর্বতের চূড়া!' মহানন্দে গর্জন করতে লাগলেন হনুমান।

বানরদের আনন্দ

হনুমানের মুখে সব শুনে বানররা মহানন্দে কিচির মিচির শব্দে বন কাঁপিয়ে তুলল।

কিষ্কিন্ধ্যার পথে তারা এসে পড়ল মধুবন নামে এক অপূর্ব সুন্দর বনে। বনরক্ষকদের পিটিয়ে, বানররা মধু আর ফল খেয়ে প্রচণ্ড উন্মত্ততা দেখাতে লাগল। বনের কর্তা দধিমুখ বাধা দিতে এসে প্রচণ্ড মার খেয়ে পালালেন।

দধিমুখ বিচারের জন্য ছুটলেন সুগ্রীবের কাছে।

সুগ্রীব সব শুনে বললেন, 'হনুমান নিশ্চয়ই সীতার দেখা পেয়েছেন। তাই বানরদের এত আনন্দ। এত উচ্ছ্বাস। দধিমুখ! বড় ভাল খবর দিলে হে! তুমি এখুনি মধুবনে গিয়ে সব বানরদের এখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করো।'

দধিমুখ ফিরে এলেন মধুবনে। অঙ্গদকে নিবেদন করলেন সুগ্রীবের বার্তা।

সীতার খবর পেলেন রাম-লক্ষ্মণ

অঙ্গদের নির্দেশে সব বানররা ফিরে চললেন কিষ্কিন্ধ্যায়। কিষ্কিন্ধ্যায় তাঁদের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলেন রাম-লক্ষ্মণ-সুগ্রীব।

হনুমান আর অঙ্গদের নেতৃত্বে বানররা এসে প্রণাম করলেন রাম-লক্ষ্মণকে।

হনুমানই দিলেন সেই শুভ সংবাদ—'সীতা অক্ষত দেহে বেঁচে আছেন! আমি তাঁকে দেখেছি!'

রামের হাতে তুলে দিলেন সীতার দেওয়া স্মারক চিহ্ন—'দিব্য চূড়ামণি'। বললেন সব কথা।

সীতার পাঠানো চূড়ামণি (মেয়েদের অলঙ্কার। মাথায় পরার টিকলি।) হাতে নিয়ে রাম কাঁদতে লাগলেন। বার বার জিগ্গেস করতে লাগলেন সীতার কথা।

হনুমান বললেন, 'হে রাম! মা সীতা বলেছেন, আপনি যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাবণকে বধ করে তাঁকে উদ্ধার করেন। আমিও সীতা মাকে বলেছি, ভয় নেই মা আপনার! খুব শিগগিরি রাম-লক্ষ্মণ আর বানর সেনারা এসে আপনাকে উদ্ধার করবেন। আপনি শিগগিরি অযোধ্যায় রামের অভিষেক দেখতে পাবেন!'

লঙ্কা কাণ্ড (বা যুদ্ধ কাণ্ড)

শুরু হল লঙ্কা যাত্রা

কী ভাবে শতসহস্র বানর সেনা নিয়ে দুস্তর সাগর পার হবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না রাম। সাহস যোগালেন সুগ্রীব।

রাম হনুমানকে একের পর এক প্রশ্ন করে চললেন। 'লঙ্কায় কতগুলো দুর্গ আছে হনুমান? সৈন্য-সংখ্যা কত হবে? নগরে ঢোকার দরজা দিয়ে নগরে প্রবেশ করা কি খুবই কঠিন কাজ? লঙ্কাকে রক্ষা করবার জন্য রাবণ কী কী ব্যবস্থা নিয়েছেন? রাক্ষসদের প্রাসাদগুলোই বা কী ধরনের?'

হনুমান লঙ্কার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বললেন, 'লঙ্কা অত্যন্ত সুরক্ষিত। দুর্লঙ্ঘ পরিখায় ঘেরা। রাবণ যুদ্ধ খুবই ভালবাসেন। তবে খুব ধীর স্থির। আমি লঙ্কাকে প্রায় ধ্বংস করে এসেছি। অর্ধেক কাজ করেই এসেছি। এখন কোনওক্রমে একবার সাগরপার করতে পারলেই হয়। জয় আমাদের অনিবার্য।'

রাম বললেন, 'আজ উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র। কাল হস্তা নক্ষত্রের সঙ্গে যুক্ত হবেন চন্দ্র। এই হল যুদ্ধযাত্রা শুরু করার শ্রেষ্ঠ সময়।'

রামের ইচ্ছে মতো, সুগ্রীবের আদেশে, লঙ্কার উদ্দেশে ছুটে চলল বিশাল বানর-বাহিনী। তাদের নেতৃত্ব দিলেন সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান, জাম্ববান, সুষেণ, বেগদর্শী, গজ, গবয়, গবাক্ষ, ঋষভ, গন্ধমাদন ইত্যাদি বীররা।

মহেন্দ্রপর্বত পার হয়ে সমুদ্রের তীরে এসে থামল সেনাবাহিনী। রামের নির্দেশে, সেখানেই তৈরি হল শিবির।

সলাপরামর্শে বসলেন রাবণ

সভাসদ্‌দের কাছে কী ভাবে শত্রুর মোকাবিলা করবেন, সে বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন রাবণ। হনুমানের 'লঙ্কা-দহন' তিনি ভুলতে পারছেন না। রাবণের উঁচু মাথা নত করে দিয়ে গেছেন হনুমান।

রাক্ষস বীররা রাবণের স্তাবকতা করে রাবণকে রাম-লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উস্কানি দিলেন। রাম-লক্ষ্মণের শক্তি না জেনেই, তাঁরা খুব আস্ফালন করতে লাগলেন।

সবাইকে থামিয়ে, বিভীষণ বললেন, 'রাম-লক্ষ্মণকে দুর্বল বা সামান্য শত্রু ভাববেন না দাদা! হনুমান যে সাগর পার হয়ে লঙ্কায় আসতে পারবেন, এ কথা কি আমরা কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম? রামের কোন অপরাধে তাঁর সতী-সাধ্বী স্ত্রী সীতাকে হরণ করা হল, তা কিন্তু আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। খরকে প্রাণ দিতে হয়েছে তাঁর অধিকারবহির্ভূত কাজের জন্য। রামের দোষে নয়।

'মহারাজ! দয়া করে ক্রোধ ত্যাগ করুন। এখনও সময় আছে। সীতাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দিন। নইলে কিন্তু সমস্ত রাক্ষস সমেত লঙ্কার ধ্বংস অনিবার্য।'

বিভীষণের কথা রাবণের পছন্দ হল না। সভা ভেঙে দিয়ে নিজের প্রাসাদে ফিরে গেলেন রাবণ।

বিভীষণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন রাবণ

পরদিন। ভোরেই রাবণের প্রাসাদে গিয়ে হাজির হলেন বিভীষণ। বললেন, 'দাদা! একটা কথা ছিল। সীতাকে আপনি এখানে আনার পর থেকেই লঙ্কায় নানারকম সব অলক্ষুনে কাণ্ড কারখানা ঘটছে।

'হোমের আগুন ভাল করে জ্বলছে না। হোমের ঘরে সরীসৃপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাভীর দুধ হচ্ছে না। ঘোড়া, উট আর অশ্বেতর জীবরা সব কাঁদছে। কাক গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। ঘরের ওপর শকুন বসছে। শিয়াল ডাকছে।

'মন্ত্রীদের স্তাবকতায় না ভুলে, আপনি সীতাকে ফিরিয়ে দিন দাদা। তাতে সবারই মঙ্গল হবে।'

প্রচণ্ড রেগে গিয়ে রাবণ বললেন, 'কখনওই না। সীতাকে আমি কিছুতেই ফিরিয়ে দেব না। রামের সঙ্গে সব দেবতারা এলেও না। কারণ, তাঁরা কেউই আমার সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারবেন না।'

জেগে উঠলেন কুম্ভকর্ণ

ছ' মাসের ঘুমের শেষে, জেগে উঠে সব শুনলেন কুম্ভকর্ণ। রাবণকে সীতাহরণের মতো জঘন্য কাজের জন্য যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করলেন কুম্ভকর্ণ। পরে, আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'যাক গে, যা করেছেন করেছেন। ওর জন্য ভয় পাবেন না। আপনি নিশ্চিন্ত মনে মদ খান। আমি একাই রাম-লক্ষ্মণকে যমালয়ে পাঠিয়ে গোটা বানর-বাহিনীকে পেটে পুরব।'

পুঞ্জিকস্থলা-রম্ভা কাহিনী

মহাপার্শ্ব পরামর্শ দিলেন, 'ভয় না পেয়ে, সীতাকে ভোগ করুন মহারাজ! আপনার মতো বীরের পক্ষে সেটাই মানানসই কাজ হবে।'

কথাটা খুবই মনে ধরল রাবণের। বললেন, 'ব্রহ্মা অভিশাপ না দিলে, কবেই তাই করতাম।'

'একবার। পুঞ্জিকস্থলা নামে এক রাক্ষসী আকাশ-পথে যাচ্ছিল ব্রহ্মার কাছে। আমি জোর করে তাকে বিবস্ত্রা করি।

'ব্রহ্মা শাপ দেন, "আজ থেকে কোনও নারীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে যদি জোর করে তার সঙ্গে তুমি মিলিত হও, তবে তোমার মাথা একশো টুকরো হয়ে যাবে।" এই শাপের ভয়েই আমি সীতাকে ভোগ করতে পারছি না'।

রম্ভাও একবার রাবণের হাতে কৈলাসে ধর্ষিতা হন। রাবণের দাদা কুবেরের ছেলে নলকুবেরও তখন রাবণকে একই রকম অভিশাপ দিয়েছিলেন। রম্ভা ছিলেন নলকুবেরের বাগদত্তা। যাচ্ছিলেনও তাঁরই কাছে। রম্ভার কোনও নিষেধ না শুনে রাবণ গায়ের জোরে তাঁকে ধর্ষণ করেন।

রাবণের কাছ থেকে বিদায় নিলেন বিভীষণ

বিভীষণ শেষবারের মতো রাবণকে বোঝাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। রাবণ, প্রহস্ত আর ইন্দ্রজিৎ তাঁকে যথেচ্ছ অপমান করলেন।

রাবণ বললেন, 'বরং ক্রুদ্ধ সর্পের সঙ্গে বাস করা ভাল। তবু শত্রুর সমর্থক তোমার মতো মিত্রনামধারীর সঙ্গে থাকা উচিত নয়। ওহে কুলাঙ্গার! এ কথা তুমি না বলে অন্য কেউ বললে এক্ষুনি তার গর্দান যেত। বুঝলে?'

বিভীষণও প্রচণ্ড রেগে গেলেন। তাঁর চার দেহরক্ষীকে নিয়ে আকাশে উঠে বললেন, 'আপনি দাদা হলেও, ধর্মচ্যুত। আপনার ভালর জন্যই আমি সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলাম। তা যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তবে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি চললাম। আপনি লঙ্কাকে রক্ষা করুন। আপনার মঙ্গল হোক।'

বিভীষণ এলেন রামের পক্ষে

চার দেহরক্ষীকে নিয়ে বিভীষণ এলেন রামের সঙ্গে দেখা করতে। বানররা তাঁকে রাবণের চর ভেবে মেরে ফেলতে যাচ্ছিলেন।

বিভীষণ বললেন, 'আমি চর নই। আমি রাবণের ভাই বিভীষণ। রাবণকে আমি অনেক বুঝিয়েছি সীতাকে ফিরিয়ে দিতে। তার ফলে আমার কপালে জুটেছে চরম অপমান। তাই তাঁকে, এবং এমন কী আমার স্ত্রীপুত্রকেও, ত্যাগ করে আমি রামের আশ্রয় নিতে এসেছি।'

খবর গেল রামের কাছে। রাম পরামর্শ চাইলেন। বানরবীরদের কাছে।

অঙ্গদ বললেন, 'তাঁর হাবভাবে সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পাইনি। আমার মনে হয় তাঁকে গ্রহণ করাই উচিত।'

সুগ্রীব বললেন, 'চরম বিপদের সময়ে নিজের দাদাকে যিনি ত্যাগ করে এসেছেন, তাঁকে বর্জন করাই উচিত।'

রাম বললেন, 'দেখো সুগ্রীব, সকলেই তো আর ভরতের মতো ভাই, আমার মতো

ছেলে বা তোমার মতো বন্ধু হয় না। বিভীষণ চান লঙ্কার রাজা হতে। শত্রু যদি অসৎও হয়, আশ্রয় ভিক্ষে করলে তাকে রক্ষা করাই কর্তব্য। কাজেই, তুমি বিভীষণকে অভয় দাও। আর এখানে নিয়ে এসো।'

বিভীষণ রামকে প্রণাম করে আত্মপরিচয় দিলেন। রাম বিভীষণের কাছে রাবণের শক্তি সম্বন্ধে ধারণা নিলেন। রাবণকে বধ করে বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসাবার প্রতিজ্ঞা করলেন। বিভীষণও রামকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হলেন।

রামের আদেশে, সমুদ্রের জল এনে রাক্ষসদের রাজা রূপে বিভীষণের অভিষেক করা হল। সাগর পারের জন্য বিভীষণ রামকে সমুদ্রের আরাধনা করার পরামর্শ দিলেন। রামও তৎক্ষণাৎ বসে গেলেন সমুদ্র-পূজায়।

সুগ্রীবের কান ভাঙাতে এলেন শুক

রাবণের চর শার্দূল রামের লঙ্কা আক্রমণের আয়োজনের সব খবর দিলেন রাবণকে। সুগ্রীবের মন ভেঙে দিতে রাবণ তাঁর মন্ত্রী শুককে পাঠালেন সুগ্রীবের কাছে।

পাখির রূপ ধরে শুক এলেন সুগ্রীবের কাছে। আকাশ থেকেই শোনালেন রাবণের বার্তা। বানররা শুককে নির্দয়ভাবে মারতে লাগল। শেষে রামের হস্তক্ষেপে বেঁচে গেলেন শুক।

সুগ্রীব শুককে বললেন, 'রাবণকে বোলো, তাকে বাঁচাতে পারে, তিন লোকে এমন কেউ নেই। আমরা লঙ্কা ভস্ম করে ফেলব।'

শুক পালাচ্ছিলেন। অঙ্গদের নির্দেশে তাঁকে ধরে আবার পেটানো শুরু হল।

শুক রামকে বললেন, 'হে রাম! এরা যদি আমায় মেরে ফেলে, তবে আমি জন্মের পর থেকে যত পাপ করেছি, তার সব ফল তোমাকে ভোগ করতে হবে।'

তখন রামের নির্দেশে, শুককে ছেড়ে দেওয়া হল।

সমুদ্রকে বশে আনলেন রাম

সমুদ্রের বহু আরাধনা করলেন রাম। তাতেও দেখা দিলেন না সমুদ্র। রাম ব্রহ্মাস্ত্র জুড়লেন ধনুকে। কেঁপে উঠল ত্রিভুবন। দেখা দিলেন সমুদ্র।

সমুদ্র বললেন, 'বিশ্বকর্মার ছেলে নল আমার বুকে সেতু তৈরি করুক। সেই সেতু বেয়ে তোমরা চলে যাও লঙ্কায়। আমি কোনও বাধা দেব না। বরং ধরে রাখব সেই সেতু।'

সেতুবন্ধন

রামের আদেশে শাল, তাল, আম, অর্জুন ইত্যাদি গাছ প্রচুর পরিমাণে জোগাড় করা হল। নলের নেতৃত্বে এবং তত্ত্বাবধানে গাছ আর পাথর দিয়ে মাত্র পাঁচ দিনে একশো যোজন (প্রায় ৮০০ মাইল) লম্বা আর দশ যোজন (প্রায় ৮০ মাইল) চওড়া

সেতু তৈরি করে ফেললেন বিশাল বানরবাহিনী। বিভিন্ন দিনে কাজ এগোল এই রকম:—

প্রথম দিনে	১৪ যোজন	(প্রায় ১১২ মাইল)
দ্বিতীয় দিনে	২০ যোজন	(প্রায় ১৬০ মাইল)
তৃতীয় দিনে	২১ যোজন	(প্রায় ১৬৮ মাইল)
চতুর্থ দিনে	২২ যোজন	(প্রায় ১৭৬ মাইল)
পঞ্চম দিনে	২৩ যোজন	(প্রায় ১৮৪ মাইল)
মোট ৫ দিনে	১০০ যোজন	(প্রায় ৮০০ মাইল)

বিভীষণ তাঁর চার বিশ্বস্ত রাক্ষস দেহরক্ষীকে নিয়ে, সেতুর লঙ্কার দিকের মাথায়, পাহারায় রইলেন।

এক হাজার কোটি বানর লাফাতে লাফাতে আর গর্জন করতে করতে সেতু পার হয়ে গেল।

হনুমানের কাঁধে চেপে রাম, আর অঙ্গদের কাঁধে চেপে লক্ষ্মণ সেতু পার হলেন।

কে কোথায় থাকবেন এবং কে কোন দলের নেতৃত্ব দেবেন, তা সব ঠিক করে দিলেন রাম।

চর পাঠালেন রাবণ

শুকের কাছে সব শুনে, ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেন রাবণ। আরও খবর আনতে চর হিসেবে পাঠালেন দুই অমাত্য শুক আর সারণকে।

বানরের ছদ্মবেশে বানরদের মধ্যে মিশে গেলেও, বিভীষণের চোখে ধরা পড়ে গেলেন শুক-সারণ। গুপ্তচর জেনেও, রাম দু'জনকেই মার্জনা করলেন।

ছাড়া পেয়ে, রামের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে পালালেন শুক-সারণ। রাবণকে তাঁরা বললেন রাম-লক্ষ্মণ-সুগ্রীবের অমিত শক্তির কথা। যুদ্ধে না গিয়ে সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথাও বললেন।

রাবণ তিরস্কার করে তাড়িয়ে দিলেন শুক-সারণকে। শার্দূলের নেতৃত্বে পাঠালেন আর এক গুপ্তচর বাহিনী। সে বাহিনীও ধরা পড়ে গেল বিভীষণের হাতে। রাম এঁদেরও মুক্তি দিলেন।

সীতাকে রামের নকল মাথা দেখালেন রাবণ

শার্দূলের কাছ থেকে সব শুনে, বেশ চিন্তায় পড়লেন রাবণ। ডেকে পাঠালেন মায়াবী রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্বকে। বললেন, 'যাও। রামের মায়ামুণ্ড তৈরি করে আনো। একেবারে নিখুঁত হওয়া চাই।'

এবার সীতার কাছে গেলেন রাবণ। বললেন, 'আমার সেনাপতি প্রহস্ত রামের মাথা কেটে ফেলেছে। লক্ষ্মণ বানরদের সঙ্গে কোথায় পালিয়েছে। বিভীষণ ধরা পড়েছে।

হনুমান, জাম্ববান ইত্যাদি বানরদের ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। কাজেই, এখন আর আমাকে বিয়ে করতে তোমার নিশ্চয়ই কোনও আপত্তি নেই?'

রাবণের আদেশে বিদ্যুজ্জিহ্ব রামের নকল মাথা এনে সীতাকে দেখাতেই, সীতা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। চেতনা ফিরলে, খুব বিলাপ করে কাঁদতে লাগলেন। সেনাপতিদের সঙ্গে কথা বলার জন্য রাবণ ফিরে গেলেন মন্ত্রণাসভায়।

সরমা এলেন সীতার কাছে

রাবণের নির্দেশে সীতার দেখাশোনা করতে এলেন বিভীষণের স্ত্রী। সরমা।

সরমা বললেন, 'সব মিথ্যে কথা। রাম লঙ্কায় এসে গেছেন। রাবণের সবংশ ধ্বংস অনিবার্য। ওই শোনো রামের শঙ্খনিনাদ! যুদ্ধের ভেরী আর বানর-সেনাদের গর্জন।

আশ্বস্তা হয়ে চোখের জল মুছলেন সীতা।

সুগ্রীবের সঙ্গে রাবণের লড়াই

রাবণের দাদামশাই মাল্যবান রাবণকে সদুপদেশ দিতে এসে অপমানিত হয়ে ফিরে গেলেন। রাবণ সেনাপতিদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দিলেন।

বিভীষণের চার অমাত্য অনল, পনস, সম্পাতি আর প্রমতি রাবণের সেনাবাহিনীর পুরো খবর নিয়ে এল ।

বিভীষণ রামকে জানালেন রাবণের পক্ষে ইন্দ্রজিৎ, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, মহোদর, বিরূপাক্ষের মতো বীররা ছাড়াও, এক কোটি রাক্ষস সেনা, দশ হাজার হাতি, দশ হাজার রথ আর বিশ হাজার ঘোড়া যুদ্ধের জন্য তৈরি।

কে কার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, ঠিক করে দিলেন রাম

পরদিন। সুবেল পর্বতের চূড়া থেকে লঙ্কার তোরণের চূড়ায় রাবণকে দেখতে পেলেন রাম। এই প্রথম দেখা!

রাবণকে দেখেই, উত্তেজিত হয়ে পড়লেন সুগ্রীব। এক লাফে একেবারে রাবণের সামনে গিয়ে হাজির হলেন। রাবণের মুকুট কেড়ে নিয়ে মেঝেতে ফেলে দিলেন রাবণকে। রাবণও ছাড়বার পাত্র নন। দু'জনে তুমুল লড়াই হল। রক্তারক্তি কাণ্ড। রাবণ মায়াবল কাজে লাগাবার উপক্রম করতেই, এক লাফে আবার রামের কাছে ফিরে এলেন সুগ্রীব।

শুরু হল যুদ্ধ যাত্রা

রামের নির্দেশ পেয়ে, শুভ সময়ে, বিশাল বানর আর ভল্লুকবাহিনী ছুটে চলল লঙ্কাপুরীর দিকে।

শুরু হল যুদ্ধযাত্রা।

রাম-লক্ষ্মণ আর হনুমান-সুগ্রীব-অঙ্গদ-নীল প্রমুখ বীরের নেতৃত্বে বানর আর ভল্লুকরা ঘিরে ফেলল গোটা লঙ্কাপুরী। অবরোধ করল সব প্রবেশপথ। তাদের গর্জনে কেঁপে উঠল সারা লঙ্কা।

রাবণের সভায় অঙ্গদ

রামের আদেশে, অঙ্গদ এক লাফে উঠে গেলেন আকাশে। তারপর সোজা একেবারে রাবণের সভায়। রাবণকে বললেন, 'আমি রামের দূত অঙ্গদ। বালীর ছেলে। আমাকে রাম পাঠিয়েছেন তোমাকে বলতে, যে, তুমি বেরিয়ে গিয়ে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করো। তোমার পৌরুষ দেখাও।

'তোমাকে আত্মীয় পরিজনসহ তিনি বধ করবেন। তোমার মৃত্যু হলে তিন লোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। যদি হাত জোড় করে সীতাকে পূর্ণমর্যাদায় ফিরিয়ে না দাও, তা হলে তুমি মরবে। আর তোমার সব ঐশ্বর্য পাবেন বিভীষণ।'

রাবণ রাগে দিশেহারা হয়ে অঙ্গদকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। চার রাক্ষস এসে ধরল অঙ্গদকে।

অঙ্গদ চার রাক্ষসকে নিয়েই আকাশে উঠে তাদের ঝেড়ে ফেলে দিলেন মাটিতে। তারপর রাবণের প্রাসাদের চূড়া ভেঙে দিয়ে ফিরে এলেন রামের কাছে।

শুরু হল যুদ্ধ

রামের আদেশ পেয়ে বানরবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল লঙ্কার ওপর। শুরু হল লড়াই। অঙ্গদের সঙ্গে ইন্দ্রজিতের। হনুমানের সঙ্গে জম্বুমালীর। নীলের সঙ্গে নিকুম্ভের। সুগ্রীবের সঙ্গে প্রঘসের। লক্ষ্মণের সঙ্গে বিরূপাক্ষের। আর রামের সঙ্গে অগ্নিকেতু ইত্যাদি চার রাক্ষসের ভয়ানক যুদ্ধ লেগে গেল।

হনুমানের হাতে প্রাণ হারালেন জম্বুমালী। সুগ্রীবের হাতে প্রঘস। লক্ষ্মণের হাতে বিরূপাক্ষ। রামের হাতে অগ্নিকেতু প্রমুখ চার রাক্ষস। নীলের হাতে নিকুম্ভের সারথি। আর সুষেণের হাতে বিদ্যুন্মালী।

রাতেও যুদ্ধ চলতে লাগল। রামের তীরে মৃতপ্রায় হয়ে পালালেন মহা মহা রাক্ষসবীররা। অঙ্গদের কাছে হার মেনে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন ইন্দ্রজিৎ। মায়াবলে নিজেকে অদৃশ্য রেখে, তীরে তীরে বিদ্ধ করতে লাগলেন রাম-লক্ষ্মণকে।

রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে বিদ্ধ করলেন ইন্দ্রজিৎ

অদৃশ্য ইন্দ্রজিতের ছোড়া নাগপাশে বদ্ধ হলেন রাম-লক্ষ্মণ। চেতনা হারালেন দু'জনেই। শোকে কাতর হলেন বিভীষণ আর বানরবীররা।

মায়াবলে বিভীষণ দেখতে পেলেন ইন্দ্রজিৎকে।

ইন্দ্রজিৎ বললেন, 'খর আর দূষণকে যারা হত্যা করেছিল, তাদেরকে বধ করে সেই হত্যার প্রতিশোধ নিলাম। দেবাসুর কেউই এদের বাঁচাতে পারবেন না।'

ইন্দ্রজিতের মুখে সুখবরটা শুনেই, আনন্দে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন রাবণ।

রাবণের আদেশে, রাক্ষসী ত্রিজটা সীতাকে পুষ্পক রথে করে নিয়ে গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। অচৈতন্য রাম-লক্ষ্মণ আর অসংখ্য বানরের রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে সীতা শোকে উন্মাদিনী হলেন।

ত্রিজটা তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, 'রাম লক্ষ্মণের সংজ্ঞা লোপ হয়েছে, তাঁরা জীবিতই আছেন। মারা যাননি।'

অনেকক্ষণ পরে, রাম চেতনা ফিরে পেয়ে উঠে বসে, লক্ষ্মণকে অচৈতন্য দেখে শোকে বিলাপ করতে লাগলেন। সুষেণ হনুমানকে, দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনের জন্য বিখ্যাত, ক্ষীরোদ সাগরের 'চন্দ্র' আর 'দ্রোণ' পর্বত থেকে 'মৃত সঞ্জীবনী বিশল্যা' নামের ঔষধি নিয়ে আসতে বললেন।

তার আর প্রয়োজন হল না। চারদিক কাঁপিয়ে হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন সাপের যম গরুড়। তাঁকে দেখেই, সব নাগ রাম-লক্ষ্মণকে ছেড়ে পালাল। তাঁর স্পর্শে দু'জনেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। বিদায় নিলেন গরুড়। আনন্দে আত্মহারা হল বানরসেনারা।

ধূম্রাক্ষবধ

রাম-লক্ষ্মণের পুনর্জীবন লাভের খবরে বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ রাবণ তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি ধূম্রাক্ষকে পাঠালেন যুদ্ধে। ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অগণিত রাক্ষস আর বানর প্রাণ হারাল।

হনুমানের ছোড়া পাথরে ধূম্রাক্ষের রথ ভেঙে চুরমার হল। ধূম্রাক্ষের কাঁটা-লাগানো গদা এসে লাগল হনুমানের মাথায়। সে আঘাত অগ্রাহ্য করে হনুমান এক পাহাড়ের চূড়া ছুড়ে মেরে ধূম্রাক্ষের মাথা একেবারে গুঁড়িয়ে দিলেন।

বজ্রদংষ্ট্রবধ

রাবণের আদেশে, এবার যুদ্ধে গেলেন মহাবীর বজ্রদংষ্ট্র। প্রচুর হাতি, উট আর সেনা নিয়ে বজ্রদংষ্ট্র চললেন লঙ্কার দক্ষিণ দুয়ারের দিকে—যেখানে অঙ্গদ নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বানরসেনার। প্রথমে গাছ-পাথর-অস্ত্রের যুদ্ধ। তারপর মুষ্টিযুদ্ধ। সবার শেষে, খড়্গযুদ্ধে অঙ্গদের হাতে প্রাণ দিলেন বজ্রদংষ্ট্র।

অকম্পনবধ

এবার রাবণের আদেশ পেয়ে অস্ত্রবিশারদ বীর 'অকম্পন' চললেন যুদ্ধে। ধুলোয় ঢেকে গেল চারপাশ। কিছুই দেখা যায় না। রাক্ষস আর বানরদের অনেকেই নিজেদের অস্ত্রে নিজেরাই প্রাণ দিল। বীরের মতো যুদ্ধ করে হনুমানের ছোড়া অশ্বকর্ণ গাছের আঘাতে প্রাণ দিলেন অকম্পন।

প্রহস্তবধ

অকম্পনেরও পতন হওয়ায়, রাবণ এবার যুদ্ধে পাঠালেন প্রহস্তকে।

রামের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে বিভীষণ বললেন, 'লঙ্কার মোট সেনার তিন ভাগের এক ভাগ আসছে এই যুদ্ধ বিশারদ মহাবীর প্রহস্তের সঙ্গে।'

প্রহস্তের চার সচিবকে শমন-সদনে পাঠালেন দ্বিবিদ, জাম্ববান, দুর্মুখ আর তার। অসংখ্য বানর মারলেন প্রহস্ত।

নীল আর প্রহস্তে লাগল ভীষণ লড়াই। প্রহস্তের তীরে আহত নীল গাছ ছুড়ে প্রহস্তের সব ঘোড়া মেরে ফেললেন। শেষে কামড়াকামড়ি। নীলের কপালে মারলেন প্রহস্ত। নীল মস্ত এক পাথরের ঘায়ে মাথা গুঁড়িয়ে দিলেন প্রহস্তের।

রাবণ স্বয়ং গেলেন যুদ্ধে

প্রহস্তেরও পতন হওয়ায়, রাবণের টনক নড়ল। বুঝলেন, এ শত্রুকে অবহেলা করাটা একেবারেই উচিত হবে না। কাজেই, তিনি নিজেই এবার চললেন যুদ্ধে। তাঁর সঙ্গী হলেন ইন্দ্রজিৎ, অতিকায়, মহোদর, কুম্ভ, নিকুম্ভ, নরান্তক প্রমুখ রাক্ষস বীররা। আর অসংখ্য রাক্ষস-সেনা।

সুগ্রীবের ছুড়ে মারা এক বিশাল পাহাড়ের চূড়াকে বাণ মেরে হেলায় টুকরো টুকরো করে ফেললেন রাবণ। রাবণের বাণে জ্ঞান হারালেন সুগ্রীব। পেছু হটলেন বানরবীররা।

হনুমান রাবণকে আক্রমণ করলেন। দু'জনে কিছুক্ষণ ঘুষোঘুষি চলল। রাবণের অস্ত্রে অচেতন হলেন নীল।

এবার এগিয়ে এলেন লক্ষ্মণ। রাবণ 'শক্তি-শেল' ছুড়লেন। লক্ষ্মণের বাণ সেই শেলকে পুরোপুরি আটকাতে পারল না। অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ পড়ার সময় বিষ্ণুর নাম স্মরণ করায়, রাবণ লক্ষ্মণকে তুলে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেও পারলেন না।

ছুটে এলেন হনুমান। তাঁর এক ঘুষিতে জ্ঞান হারালেন রাবণ। রাবণের চোখমুখ দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল। লক্ষ্মণকে তুলে রামের কাছে নিয়ে গেলেন হনুমান।

কী আশ্চর্য! রামের কাছে আসতেই, শক্তি অস্ত্র লক্ষ্মণকে ছেড়ে ছুটে পালাল রাবণের রথে। সুস্থ হয়ে উঠলেন লক্ষ্মণ। এ দিকে, রাবণেরও জ্ঞান ফিরে এল।

প্রথম মুখোমুখি রাম-রাবণ

সুস্থ হয়ে উঠেই, নির্বিচার বানর-সংহার করতে লাগলেন রাবণ।

এবার রাবণ-দমনে হনুমানের পিঠে চড়ে এলেন স্বয়ং রাম। রাম বললেন, 'কোথায় পালাবে রাবণ? ইন্দ্র, যম, স্বয়ম্ভু, বৈশ্বানর বা শঙ্কর—কেউই তোমায় বাঁচাতে পারবেন না। তুমি লক্ষ্মণকে শক্তিশেল মেরেছ। আমি তোমায় নির্বংশ করব।'

হনুমানের ঘুষির কথা ভোলেননি রাবণ। এক 'আগুনে-বাণ' ছুড়ে মারলেন

হনুমানকে।

প্রচণ্ড রেগে গিয়ে রাম রাবণের রথ, ঘোড়া, সারথি, শূল আর খড়্গ কেটে ফেললেন। রাবণের বুকে এমন এক তীর মারলেন যে, রাবণ মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। হাত থেকে ধনু খসে পড়ল রাবণের। রাম তাঁর মুকুটও উড়িয়ে দিলেন।

রাম বললেন। 'ওহে রাবণ! আজ তুমি যুদ্ধ করে বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। আজ তোমায় ছেড়ে দিলাম। কাল তোমার সব রথী-মহারথীদের নিয়ে এসো। কাল দেখা যাবে।'

ভয় পেলেন রাবণ

রামের হাতে যাচ্ছেতাই রকমের হেনস্তা হওয়ায়, বেশ ভয় পেলেন রাবণ। সভাসদ্‌দের বললেন, 'ব্রহ্মার কাছে দেব-দানব-গন্ধর্বের হাতে মৃত্যু না হওয়ার বর চেয়েছিলাম। ব্রহ্মা বলেছিলেন, "শুধু মানুষকেই তোমার ভয়।" এখন মনে হচ্ছে এই রামই সেই মানুষ। রামই আমায় বধ করবে।

'আজ থেকে অনেক দিন আগে, ইক্ষ্বাকু বংশের অনরণ্য আমাকে শাপ দিয়ে বলেছিলেন, যে, তাঁরই এক বংশধরের হাতে আমার সবংশ নিধন হবে।'

(রাবণের অযোধ্যা আক্রমণের সময় রাবণের হাতে পরাজিত অনরণ্য রাবণকে এই শাপ দিয়েছিলেন।)

রাবণ বলে চললেন, 'বেদবতীকে যখন ধর্ষণ করেছিলাম, তখন তিনিও শাপ দিয়েছিলেন। সেই বেদবতীই বোধ হয় সীতা।

'এ ছাড়া উমা, নন্দীশ্বর, রম্ভা, বরুণের মেয়ে পুঞ্জিকস্থলা—এঁরাও সবাই আমাকে শাপ দিয়েছিলেন। ঋষিবাক্যও মিথ্যে হওয়ার নয়।

'যাও তোমরা কুম্ভকর্ণকে জাগাও। এই বিপদে সে-ই একমাত্র ভরসা।'

ঘুম ভাঙানো হল কুম্ভকর্ণের

রাবণের আদেশ পেয়ে রাক্ষসরা দলে দলে চলল কুম্ভকর্ণের মহাঘুম ভাঙাতে। কুম্ভকর্ণের নিঃশ্বাসে ছিটকে পড়তে লাগল তারা। অনেক কষ্টে পর্বতপ্রমাণ সেই দেহের কাছে তারা রাশি রাশি হরিণ, মোষ আর শুয়োরের মাংস এনে রাখল। আর কলসি কলসি ভর্তি রক্ত। আর মদ।

কুম্ভকর্ণের সারা গায়ে চন্দন লেপে সুগন্ধি ফুলের মালা পরিয়ে দিল। গদা, মুগুর, পাথর—যে যা পেল—তাই দিয়েই পেটাতে লাগল কুম্ভকর্ণের বুকে। উট-গাধা-হাতির মিছিল চালাল কুম্ভকর্ণের শরীরের ওপর দিয়ে।

শাঁখ, ভেরী, মৃদঙ্গ বাজাতে লাগল তারস্বরে। কেউ কুম্ভকর্ণের কান কামড়ে দিল। কেউ শত শত কলসি জল ঢেলে দিল তাঁর কানে।

তবু সেই মহানিদ্রা ভাঙানো গেল না। শেষে এক হাজার হাতিকে ছোটানো হল তাঁর দেহের ওপর দিয়ে। তাতে সুড়সুড়ি লেগে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙল। প্রচণ্ড খিদেয় প্রকাণ্ড এক হাঁ করলেন তিনি।

রাশি রাশি মদ-মাংস-রক্ত খেয়ে কুম্ভকর্ণ জানতে চাইলেন, 'কী ব্যাপার? আমাকে এমন অসময়ে জাগালে যে? রাজার খবর সব ভাল তো?'

যূপাক্ষ তখন হাত জোড় করে সব ঘটনা বললেন তাঁকে।

কুম্ভকর্ণ বললেন, 'আজই আমি সব সৈন্যসহ রাম-লক্ষ্মণকে খাব।'

কুম্ভকর্ণ বধ

রাম বললেন, 'বিভীষণ! ওই ভীষণ পর্বতাকার চেহারার যে রাক্ষসকে দেখে বানররা ভয়ে পালাচ্ছে, উনি কে?'

বিভীষণ বললেন, 'ইনিই কুম্ভকর্ণ। আমার ভাই। জন্মের পরেই, খিদে সামলাতে না পেরে, এক হাজার প্রজাকে খেয়ে ফেলায়, ব্রহ্মা এঁকে মৃতপ্রায় হয়ে বেঁচে থাকার অভিশাপ দেন। রাবণের প্রার্থনায়, শেষে ব্রহ্মা বলেন, ইনি ছ' মাস ঘুমের পর মাত্র একদিনের জন্য জেগে প্রচুর মানুষ খেতে পারবেন। এ দুর্ধর্ষ। একে আটকানো বানরের সাধ্য নয়।'

এ দিকে, কুম্ভকর্ণ সব শুনে রাবণকে তাঁর কৃতকর্মের জন্য যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করলেন।

রাবণ বললেন, 'আমি যা করেছি, করেছি। কিন্তু তাই বলে তুমি গুরুজনকে উপদেশ দেবে?'

মহোদর পরামর্শ দিলেন, 'সীতাকে মিথ্যে খবর দেওয়া হোক, যে, আমরা রাম-লক্ষ্মণকে খেয়ে ফেলেছি। আমরা রক্তাক্ত দেহে গিয়ে সে কথা বলব। লঙ্কাতেও তা প্রচার করা হোক। একবার সীতাকে বশে আনলেই, রাম-লক্ষ্মণকে জব্দ করা যাবে।'

মহোদরের পরামর্শ রাবণ বা কুম্ভকর্ণ কেউই কানে তুললেন না।

যুদ্ধে চললেন কুম্ভকর্ণ। তাঁকে সাজিয়ে দিলেন রাবণ স্বয়ং।

বানরদের দলে দলে পালাতে দেখে অঙ্গদ সাহস দিলেন। হনুমান কুম্ভকর্ণকে প্রকাণ্ড এক পর্বত ছুড়ে মারলেন। কুম্ভকর্ণের শূলে হনুমানের বুক ফেটে গেল। রক্ত বমি করতে লাগলেন তিনি।

সুগ্রীব এক বিশাল পাহাড় ছুড়ে মারলেন কুম্ভকর্ণের বুকে। সে পাহাড়ই গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে গেল। কুম্ভকর্ণ পাহাড়ের চূড়া দিয়ে পিটিয়ে, সুগ্রীবকে অজ্ঞান করে, বগলদাবা করে লঙ্কায় নিয়ে চললেন। চেতনা ফিরে পেয়ে কুম্ভকর্ণকে আঁচড়ে কামড়ে পালিয়ে এলেন সুগ্রীব।

লক্ষ্মণের আক্রমণকে উপেক্ষা করে কুম্ভকর্ণ এগিয়ে গেলেন রামের দিকে।

রাম বায়ব্য অস্ত্রে কুম্ভকর্ণের গদাসমেত এক হাত কাটতেই, অন্য হাতে এক তাল গাছ নিয়ে তেড়ে এলেন কুম্ভকর্ণ। রাম ঐন্দ্রাস্ত্রে কুম্ভকর্ণের সে হাতও কেটে ফেললেন। তারপর অর্ধচন্দ্র বাণে কাটলেন কুম্ভকর্ণের দুই পা।

সেই অবস্থাতেই, রামকে খেতে আসছিলেন কুম্ভকর্ণ। রাম মহাশক্তিশালী ঐন্দ্র শরে তাঁর মাথা কেটে দিলেন।

বীরশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণের বিশাল পর্বতের মতো দেহ সমুদ্রে তলিয়ে গেল। চিরকালের জন্য।

রাবণের অনুশোচনা

কুম্ভকর্ণবধের খবরে জ্ঞান হারালেন রাবণ। পরিবারের সকলেই কাঁদতে লাগলেন।

জ্ঞান ফিরে এলে রাবণ বললেন, 'তখন বিভীষণের কথা শুনিনি। তাই আজ আমার এই অবস্থা। কুম্ভকর্ণের মতো এমন ভাইই যখন চলে গেল, তখন কী হবে আমার এই রাজ্য নিয়ে? কী-ই বা করব সীতাকে নিয়ে? বানররা এখন লঙ্কাকে লুটেপুটে খাবে।'

ছেলে ত্রিশিরা প্রবোধ দিলেন রাবণকে। ত্রিশিরার সঙ্গে রাবণের আরও তিন ছেলে— দেবান্তক, নরান্তক, অতিকায় আর দুই সৎ ভাই মহোদর আর মহাপার্শ্ব। চললেন যুদ্ধে।

নরান্তক বধ

অঙ্গদের প্ররোচনায় নরান্তক বজ্রের মতো শক্তিশালী প্রাস ছুড়লেন। অঙ্গদের বুকে লেগে প্রাস গুঁড়িয়ে গেল। অঙ্গদের ঘুসিতে নরান্তকের ভবলীলা সাঙ্গ হল।

(যুদ্ধের সময় অত্যন্ত উন্নত ধরনের অস্ত্রের ব্যবহার হয়েছে রামায়ণ এবং মহাভারতের দুই মহাযুদ্ধে। মাথা, বুক, হাত-পা ইত্যাদি বেশ শক্তপোক্ত ধাতব পাতে ঢাকা থাকত বলেই মনে হয়। নইলে অঙ্গদের বুকে লেগে প্রাস গুঁড়িয়ে যাবে কেন?)

দেবান্তক বধ

নরান্তকের মৃত্যুতে দেবান্তক, ত্রিশিরা আর মহোদর এক সঙ্গে অঙ্গদকে আক্রমণ করলেন। মহোদরের হাতির দাঁত উপড়ে ফেলে সেই দাঁত দিয়ে দেবান্তককে পেটালেন অঙ্গদ। দেবান্তক পরিঘ ছুড়লেন অঙ্গদের দিকে। হনুমান দেবান্তকের মাথায় এক ঘুষি মারলেন। দেবান্তকের দেহান্ত হল।

মহোদর বধ

তীরে তীরে নীলকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন মহোদর। নীল এক পাহাড় ছুড়ে তাঁকে যমালয়ে পাঠালেন।

ত্রিশিরা বধ

ত্রিশিরা আর হনুমানে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। ত্রিশিরা 'শক্তি' ছুড়ে মারলেন। হনুমান তা ভেঙে রাগে গজরাতে লাগলেন। ত্রিশিরা খড়্গ দিয়ে মারলেন হনুমানকে। হনুমান সেই খড়্গ কেড়ে নিয়ে তা দিয়েই শিরশ্ছেদ করলেন ত্রিশিরার।

মহাপার্শ্ব বধ

মহাপার্শ্ব তাঁর লোহার গদা দিয়ে মারলেন ঋষভের বুকে। রক্তের ফোয়ারা ছুটতে লাগল সেখান থেকে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে, মহাপার্শ্বেরই গদা কেড়ে নিয়ে তাঁকে শমন-সদনে পাঠালেন 'ঋষভ'।

অতিকায় বধ

তিন ভাই আর দুই কাকার পতন দেখে অতিকায় চললেন যুদ্ধে।

বিভীষণ রামকে বললেন, 'ইনি রাবণ আর ধান্যমালিনীর ছেলে। অতিকায়। সর্বশাস্ত্র বিশারদ। দেবাসুরের অবধ্য। এঁকে এখুনি মারুন। নইলে ইনি বানরকুল বিনাশ করবেন।'

লক্ষ্মণের সঙ্গে অতিকায়ের অতি ভীষণ লড়াই হল। লক্ষ্মণের সব অস্ত্র ফিরে এল অতিকায়ের দুর্ভেদ্য বর্ম থেকে। তখন পবনের পরামর্শে, ব্রহ্মাস্ত্র ছুড়লেন লক্ষ্মণ। শত চেষ্টা করেও, তা আটকাতে পারলেন না অতিকায়। তাঁর মাথা মুকুট সমেত লুটিয়ে পড়ল লঙ্কার রক্তাক্ত মাটিতে।

(অতিকায়ের এই দুর্ভেদ্য বর্ম কীসের ছিল? মনে তো হয় হালকা অথচ বেশ শক্তপোক্ত ধাতব পাতের তৈরি ছিল সে বর্ম।)

ইন্দ্রজিতের বাণে চেতনা হারালেন রাম-লক্ষ্মণ

রাবণকে সান্ত্বনা দিয়ে ইন্দ্রজিৎ প্রতিজ্ঞা করলেন, 'আজই আমি রাম-লক্ষ্মণকে বধ করব।'

বায়ুর-গতিতে-ছোটা রথে (বিমানে?) চেপে যুদ্ধভূমির দিকে চললেন ইন্দ্রজিৎ। অত্যন্ত ভক্তিভরে হোম করলেন। অগ্নিদেব স্বয়ং তাঁর হাত থেকে হবি গ্রহণ করলেন। সব অস্ত্র মন্ত্রসিদ্ধ এবং অগ্নিশুদ্ধ করে নিলেন ইন্দ্রজিৎ।

(কী নিষ্ঠা ইন্দ্রজিতের! ভাবা যায় না! এমন নিশ্ছিদ্র নিষ্ঠা আর শ্রদ্ধা ছাড়া কি কেউ এত বড় যোদ্ধা হতে পারে?)

মায়াবলে অদৃশ্য থেকে নালীক, নারাচ, গদা, মুষল, প্রাস, শূল, বাণ ইত্যাদি অস্ত্রে সাতষট্টি কোটি বানর সংহার করলেন ইন্দ্রজিৎ।

(সাতষট্টি কোটি! বাবারে! ভারতের জনসংখ্যার । প্রায় ৭৫%! ভাবা যায়!)

রাম লক্ষ্মণকে বললেন, 'লক্ষ্মণ! মনে হচ্ছে ব্রহ্মাস্ত্রই প্রয়োগ করছেন যোদ্ধা। মহাবীর বানররা অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। আমরাও মৃতবৎ পড়ে থাকি। ইন্দ্রজিৎ বিজয়ী হয়ে ফিরে যাক।'

মেঘনাদের (ইন্দ্রজিৎ) অস্ত্রে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইলেন রাম-লক্ষ্মণ। ইন্দ্রজিৎ বিজয়গর্বে প্রাসাদে ফিরে, রাবণকে এই বিরাট সুখবর দিলেন।

ঔষধি আনলেন হনুমান

বিভীষণ সুস্থ বানরবীরদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, যে, ব্রহ্মাস্ত্রকে সম্মান দেখাতেই রাম-লক্ষ্মণ স্বেচ্ছায় এই মোহাবিষ্ট অবস্থা গ্রহণ করেছেন। এতে চিন্তার কিছুই নেই।

আহত জাম্ববান বললেন, 'হনুমান! একমাত্র তুমিই পারো এ বিপদ থেকে আমাদের সবাইকে রক্ষা করতে। হিমালয়ের ঋষভ আর কৈলাস শৃঙ্গের মাঝে আছে ঔষধি পর্বত। তার চূড়ায় আছে মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী আর সন্ধানী—এই চার রকমের ঔষধি। তুমি সেই চার মহৌষধি নিয়ে এসো বীর!

হনুমান এক লাফে গেলেন ঔষধি পর্বতে। কিন্তু তাঁকে দেখেই, সব ঔষধি অদৃশ্য হল। রেগে গিয়ে হনুমান ঔষধি পর্বতের গোটা চূড়াটাই তুলে নিয়ে চলে এলেন।

ঔষধির গন্ধে রাম-লক্ষ্মণসহ সমস্ত মৃত বানরসেনা সম্পূর্ণ সুস্থ আর তরতাজা হয়ে উঠলেন। যেন এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলেন সবাই। হনুমান আবার যথাস্থানে রেখে এলেন ঔষধিপর্বতের চূড়া।

লঙ্কাপুরীতে ঢুকে পড়ল বানরবাহিনী

বীর রাক্ষসদের বেশির ভাগই নিহত। তাই সুগ্রীবের আদেশে লঙ্কাপুরীতে ঢুকে পড়ল বানররা। তারা লঙ্কার বহু তোরণে আর প্রাসাদে আগুন লাগিয়ে দিল। রাবণ কুম্ভকর্ণের দুই বীর ছেলে কুম্ভ আর নিকুম্ভকে লঙ্কার দ্বার রক্ষা করতে পাঠালেন। তাঁদের সঙ্গে গেলেন যূপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ, কম্পন প্রমুখ বীররা।

কম্পন বধ

অঙ্গদের সঙ্গে যুদ্ধ লাগল কম্পনের। পাথর ছুড়ে কম্পনকে মেরে ফেললেন অঙ্গদ

প্রজঙ্ঘ বধ

শোণিতাক্ষের সঙ্গে অঙ্গদের লড়াই লাগলে শোণিতাক্ষকে বাঁচাতে যূপাক্ষ আর প্রজঙ্ঘ ছুটে এলেন। অঙ্গদের ঘুষিতে প্রজঙ্ঘের মাথা গুঁড়িয়ে গেল।

শোণিতাক্ষ বধ

অঙ্গদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর দুই ভাগ্নে মৈন্দ আর দ্বিবিদ। দ্বিবিদ শোণিতাক্ষকে নখে আঁচড়ে, মাটিতে ফেলে, পিষে মেরে ফেললেন।

যূপাক্ষ বধ

যূপাক্ষের সঙ্গে লড়াই হল মৈন্দের। মৈন্দের হাতে প্রাণ দিলেন যূপাক্ষ।

কুম্ভ বধ

কুম্ভের বাণে ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়ে গেলেন অঙ্গদ।

সুগ্রীব কুম্ভের বীরত্বের প্রশংসা করে বললেন, 'তুমি খুবই ক্লান্ত! এ অবস্থায় তোমায় মারলে লোকে আমার নিন্দে করবে। তুমি বিশ্রাম করে এসো। তারপর আমার শক্তির পরীক্ষা দেব।'

কুম্ভ প্রচণ্ড রেগে সুগ্রীবকে জড়িয়ে ধরলেন। সুগ্রীব কুম্ভকে ছুড়ে ফেলে দিলেন সমুদ্রে। জল থেকে উঠে সুগ্রীবের বুকে প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলেন কুম্ভ। সুগ্রীবের পালটা ঘুষিতে প্রাণ হারালেন কুম্ভ।

নিকুম্ভ বধ

নিকুম্ভ 'পরিঘ' (মুগুর জাতীয় প্রাচীন অস্ত্র) ছুড়ে মারলেন হনুমানের বুকে। পরিঘ গুঁড়ো হয়ে গেল। হনুমানের ঘুষিতে নিকুম্ভের বুক থেকে রক্তের ফোয়ারা ছুটল। ওই অবস্থাতেই, নিকুম্ভ হনুমানকে ধরে নিয়ে চললেন লঙ্কার রাজপ্রাসাদের দিকে। হনুমান নিকুম্ভের বুকের ওপর বসে দু'হাতে নিকুম্ভের মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেললেন।

মকরাক্ষ বধ

খরের ছেলে মকরাক্ষ এবার যুদ্ধে গেলেন। বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে। রামকে শাসালেনও খুব। মকরাক্ষ মহাশূল নিয়ে তেড়ে এলেন। রাম চার বাণে মহাশূল টুকরো টুকরো করে ফেললেন। তারপর পাবকাস্ত্রে মকরাক্ষকে বধ করলেন।

মায়াসীতা

রাবণের নির্দেশে, ক্ষিপ্ত ইন্দ্রজিৎ নিজে অদৃশ্য হয়ে থেকে, বাণে বাণে রাম-লক্ষ্মণসহ সমস্ত বানর সেনাকে ক্ষত-বিক্ষত করলেন। বহু বানর প্রাণ হারাল।

কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্রজিৎ আবার ফিরে এলেন।

'কিন্তু, ইন্দ্রজিতের রথে উনি কে?'

হনুমান বিস্মিত হলেন।

'মা সীতা নাকি? হুবহু মা সীতার মতোই চেহারা! তাঁর চুলের মুঠি ইন্দ্রজিতের হাতে! খড়্গ দিয়ে ইন্দ্রজিৎ তাঁকে নির্দয়ভাবে মারছেন!'

হনুমান বললেন, 'ওহে পাপিষ্ঠ! তুমি স্ত্রীলোকের ওপর এ ভাবে অত্যাচার করছ? নরকেও তোমার স্থান হবে না।'

ইন্দ্রজিৎ বললেন, 'শত্রুদের দুঃখ যাতে বাড়ে, তা-ই করা উচিত।' বলেই ইন্দ্রজিৎ সেই নারীকে খড়্গের এক কোপে কেটে ফেললেন।

শোকে অধীর হয়ে হনুমান এসে খবর দিলেন রাম-লক্ষ্মণকে। দু'জনেই শুনে উন্মাদের মতো বিলাপ করতে লাগলেন।

সব শুনে, বিভীষণ বললেন, 'এ অসম্ভব ব্যাপার। উনি কখনওই সত্যিকারের সীতা নন। উনি মায়াসীতা। ইন্দ্রজিতের এ এক ছলনা। এই ছলনায় সবাইকে শোকে আচ্ছন্ন করে, সেই ফাঁকে সে নির্বিঘ্নে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হোম করতে চায়। এই হোম করলেই, তার হাতে আমাদের সবার মৃত্যু অনিবার্য।

'হে রাম! আপনি এখানেই থাকুন। লক্ষ্মণকে নিয়ে আমরা নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যাচ্ছি। ব্রহ্মার বর আছে, যজ্ঞের আগে যে ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ করতে পারবে, তার হাতেই ইন্দ্রজিতের মরণ হবে।'

ইন্দ্রজিৎ বধ

বিভীষণ বললেন, 'লক্ষ্মণ! আপনি তীর ছুড়ে রাক্ষসসেনাকে ছত্রাকার করে দিন। ইন্দ্রজিৎ এখন যজ্ঞে বসেছে। তা হলে সে যজ্ঞ থেকে উঠে আসবে।'

সত্যিই উঠে এলেন ইন্দ্রজিৎ। হনুমানকে দেখতে পেয়ে তাঁর দিকেই তেড়ে গেলেন।

বিভীষণ এক বটগাছের তলায় লক্ষ্মণকে নিয়ে এলেন। লুকিয়ে লুকিয়ে। বললেন, 'এই বটগাছের তলায় ভূতদের উপহার দিয়ে মায়াযুদ্ধ করতে যায় ইন্দ্রজিৎ। এখুনি সে আসবে এখানে। আসলেই তাকে বধ করবেন।'

এলেন ইন্দ্রজিৎ।

লক্ষ্মণের সঙ্গে বিভীষণকে সেখানে দেখে বিস্মিত, ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ বললেন, 'তুমি আমারই বাবার ভাই হয়ে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করছ? বাঃ! চমৎকার! নিজের লোককে ছেড়ে যে অন্যের সঙ্গে হাত মেলায়, নিজের লোকরা দুর্বল হয়ে পড়লে, সেই অন্যরাই কিন্তু তখন তাকে মেরে ফেলে। এ কথাটা মনে রেখো কাকা!'

বিভীষণ বললেন, 'আমি রাক্ষসকুলে জন্মেও সত্ত্বগুণী। ধর্মত্যাগী নই। তুমি অহংকারী। দুর্বিনীত। লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করো। আজই তোমার শেষ দিন।'

ইন্দ্রজিতের সঙ্গে লক্ষ্মণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হল। ইন্দ্রজিৎ রথে। লক্ষ্মণ হনুমানের পিঠে। লক্ষ্মণের বাণের প্রত্যুত্তরে ইন্দ্রজিৎ সাত বাণে লক্ষ্মণকে, দশ বাণে হনুমানকে আর একশো বাণে বিভীষণকে আঘাত করলেন। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সোনার বর্ম কেটে ফেললেন।

বিভীষণ ইন্দ্রজিৎকে বধের জন্য বানরদের উত্তেজিত করতে লাগলেন। কিন্তু নিজেরই দাদার ছেলে, পুত্রবৎ প্রিয় ইন্দ্রজিৎকে মারার কথা ভেবে, চোখের জলে ভাসতে লাগলেন।

বানর-রাক্ষসে ভয়ঙ্কর লড়াই চলতে লাগল। ইন্দ্রজিতের সারথি আর রথের ঘোড়াকে হত্যা করলেন লক্ষ্মণ। ইন্দ্রজিৎ ওরই মধ্যে, লুকিয়ে লঙ্কাপুরীতে গিয়ে, নতুন রথ নিয়ে ফিরে এসে, নতুন উদ্যমে বানর সংহার করতে লাগলেন।

এরপর বিভীষণের গদার ঘায়ে মারা পড়লেন ইন্দ্রজিতেব নতুন সারথি। মারা গেল নতুন রথের ঘোড়া। ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে মারতে শক্তি ছুড়লেন। লক্ষ্মণ তা কেটে ফেললেন।

লক্ষ্মণকে রক্ষা করতে, ছুটে এলেন দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব এবং পিতৃপুরুষরা। এবার

লক্ষ্মণ ঐন্দ্রাস্ত্র ছুড়লেন।

বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিতের মাথা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

রাক্ষসরা প্রাণভয়ে পালাল। বানররা আনন্দে লাফাতে লাগল। গন্ধর্ব আর অপ্সরারা নাচ শুরু করে দিলেন। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন।

রামের আনন্দ

ইন্দ্রজিতের পতনের খবরে আনন্দে বিহ্বল হলেন রাম। লক্ষ্মণকে বুকে টেনে নিলেন। সুষেণের চিকিৎসায় লক্ষ্মণের ঘা শুকিয়ে গেল।

(কি রামায়ণে, কি মহাভারতে, দু' জায়গাতেই আমরা দেখছি, যুদ্ধক্ষেত্রে আহত যোদ্ধাদের দ্রুত সুস্থ করে তোলার জন্য অত্যন্ত দক্ষ চিকিৎসকরা থাকতেন। তাঁদের সঙ্গে থাকত প্রয়োজনীয় যাবতীয় ওষুধপত্রও।)

রাবণের বিলাপ

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুসংবাদে যেন শেল বিদ্ধ হল রাবণের বুকে। মূর্ছা গেলেন রাবণ। জ্ঞান ফিরলে, বিলাপ করতে লাগলেন—'হায় রে ইন্দ্রজিৎ! দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করে শেষে কিনা সামান্য মানুষ লক্ষ্মণের হাতে তুই প্রাণ দিলি বাবা! তুই-ই যখন চলে গেলি, তখন আমারও আর বেঁচে থাকার কোনও মানেই হয় না!'

রাবণের ক্রোধ

মুহূর্তে শোক ভুলে, ক্রোধে উন্মাদ হয়ে উঠলেন রাবণ। তাঁর চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরোতে লাগল।

রাক্ষস সেনাদের মনে বল আনার জন্য তিনি গর্জে উঠলেন, 'আমি ব্রহ্মার দেওয়া বরে দেবাসুরের অবধ্য। ব্রহ্মার 'কবচ' (বর্ম) পরে, ব্রহ্মারই দেওয়া ধনুর্বাণ হাতে, আজ আমি ভঙ্ককর যুদ্ধ করব। আমার ছেলে ইন্দ্রজিৎ তো 'মায়াসীতা'কে কেটেছিল! আমি সত্যিকারের সীতাকেই আজ কাটব।'

সীতাকে হত্যা করতে চললেন রাবণ

রাবণকে সদলবল আসতে দেখেই, সীতা বুঝতে পারলেন, রাবণ তাঁকে হত্যা করতে আসছেন। তাঁর মনে হল, হয় রাম-লক্ষ্মণ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। আর নয়, পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে আসছেন রাবণ।

আফসোস হল সীতার। 'হনুমান তখন কতবার বলেছিল, তার পিঠে করে চলে যেতে। কেন তখন গেলাম না?'

রাবণের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অমাত্য সুপার্শ্ব বললেন, 'আপনি শুধু শুধু স্ত্রীহত্যার মতো জঘন্য কাজ করবেন কেন মহারাজ? তার চেয়ে রাম-লক্ষ্মণকে বধ করে নিশ্চিন্ত মনে

এই সুন্দরীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করুন। আজ কৃষ্ণা-চতুর্দশী। কাল অমাবস্যা। কালই রাম-লক্ষ্মণ বধের উপযুক্ত তিথি।'

সুপার্শ্বের কথা মনে ধরল রাবণের। ফিরে গেলেন তিনি।

রাক্ষসীদের বিলাপ

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে সারা লঙ্কা হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

সবারই কোনও না কোনও নিকট-আত্মীয় এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশে বিলাপ করতে লাগলেন রাক্ষসীরা। সে এক হৃদয়-বিদারক, মর্মান্তিক দৃশ্য।

'শূর্পণখাই যত নষ্টের মূল। সেই কুৎসিত রাক্ষসী কেন যে সেই প্রিয়দর্শন সর্বগুণের অধিকারী রামকে বিয়ে করতে চাইল!'

'রাবণ কেন বিভীষণের উপদেশ শুনে সীতাকে ফিরিয়ে দিলেন না?'

'কুম্ভকর্ণ, অতিকায় আর ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতেও কি রাবণের চোখ খুলল না?' ইত্যাদি বলে রাক্ষসীরা কাঁদতে লাগলেন।

রাবণের যুদ্ধযাত্রা

এত বিলাপ আর হা-হুতাশ রাবণের ক্রোধকে হুতাশনের মতোই জ্বালিয়ে দিল। রাবণ রাম-লক্ষ্মণকে বধ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে, আট ঘোড়ার রথে চেপে, নানা অলঙ্কারে সেজেগুজে, যুদ্ধযাত্রা করলেন।

রাবণের আদেশে, তাঁর সঙ্গী হলেন মহাপার্শ্ব, মহোদর আর বিরূপাক্ষ।

(এই মহাপার্শ্ব এবং মহোদর রাবণের দুই অমাত্য। রাবণের সৎ ভাই মহাপার্শ্ব আর মহোদর আগেই মারা গেছেন।)

রাবণের সঙ্গে চলল দশ লক্ষ রথ। তিরিশ লক্ষ হাতি, ষাট কোটি ঘোড়া, ষাট কোটি গাধা আর উট। আর অসংখ্য রাক্ষস সেনা।

(সংখ্যাগুলো একটু অবিশ্বাস্য রকমের বেশি বেশি ঠেকছে। তা হোক। আমরা গল্প শুনতে বসেছি। গল্প তার নিজের মতো করেই এগোক। আমরা বাধা দিয়ে রসভঙ্গ করতে চাই না। আমরা গল্প শুনতে বসেছি বাল্মীকির কাছে। তিনি যেমনটি শোনাবেন, তেমনটিই শুনব।)

শুরু হল লঙ্কার যুদ্ধের ভয়ঙ্করতম লড়াই।

বিরূপাক্ষ বধ

বিরূপাক্ষ খড়্গ দিয়ে মেরে সুগ্রীবকে অজ্ঞান করে দিলেন। জ্ঞান ফিরে পেয়েই, সুগ্রীব চড় মেরে, মেরে ফেললেন বিরূপাক্ষকে।

মহোদর (অমাত্য) বধ

সুগ্রীবকে মারতে গিয়ে সুগ্রীবের বর্মে আটকে গেল মহোদরের খড়্গ। সে খড়্গ টেনে খুলবার আগেই, সুগ্রীব মহোদরের মাথা কেটে মাটিতে ফেলে দিলেন।

মহাপার্শ্ব (অমাত্য) বধ

অঙ্গদ পরিঘ (মুগুর জাতীয় প্রাচীন অস্ত্র) ছুড়ে কাবু করে ফেললেন মহাপার্শ্বকে। তারপর ঘুষি মেরে তাঁকে হত্যা করলেন।

দ্বিতীয়বার মুখোমুখি হলেন রাম-রাবণ

রাবণকে সামনে পেয়ে বেশ খুশি হলেন রাম। টঙ্কার দিলেন ধনুকে। লক্ষ্মণ রাবণের সামনে এসে পড়লেন। লক্ষ্মণকে পাশ কাটিয়ে, রামের দিকে তীর ছুড়তে লাগলেন রাবণ।

রামও যোগ্য জবাব দিলেন। দু'জনেই দু'জনের তীরকে মাঝপথেই নিষ্ক্রিয় করে দিলেন। কেউই কম যান না।

রাবণের আসুরাস্ত্রকে রুখে দিল রামের পাবকাস্ত্র। রাবণের রৌদ্রাস্ত্র (ময়দানবের তৈরি) আটকালেন রাম। গন্ধর্বাস্ত্র ছুড়ে। রাবণের সৌরাস্ত্র থেকে যে সব অসংখ্য চক্র চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল, রাম তাদের সব কটাকে কেটে টুকরো টুকরো করলেন।

রাবণের শক্তিশেল

[অস্ত্রটা রাবণের। ছুড়ে ছিলেন লক্ষ্মণকে। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নামেই বহুখ্যাত।]

লক্ষ্মণ রাবণের সারথিকে মারলেন। লক্ষ্মণ আর বিভীষণ মিলে রাবণের ঘোড়া, ধ্বজ, ধনু কেটে রাবণকে নাস্তানাবুদ করে তুললেন।

বিভীষণকে লক্ষ করে রাবণ ছুড়লেন বজ্রের মতো শক্তিশালী 'শক্তি' অস্ত্র। লক্ষ্মণ তাকে কেটে ফেললেন। তখণ রাবণ ভয়ঙ্কর ক্রোধে ফুঁসে উঠে, ছুড়লেন ময়দানবের তৈরি আটঘণ্টাওয়ালা, মহাশক্তিশালী অব্যর্থ, প্রাণঘাতী, 'শক্তি শেল'। সে শেল যেন ব্যর্থ হয়, তার জন্য প্রার্থনা জানালেন রাম। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন লক্ষ্মণ।

রাম কোনওক্রমে লক্ষ্মণের বুক থেকে শেল বার করে, তাকে ভেঙে ফেললেন। সুগ্রীব আর হনুমানকে লক্ষ্মণের পাহারায় রেখে, শোক ভুলে, রাম ছুটলেন রাবণকে শিক্ষা দিতে। বহুদিনের কামনা চরিতার্থ করতে। রাম বৃষ্টির মতো তীর ছুড়তে লাগলেন। প্রাণভয়ে পালালেন রাবণ।

লক্ষ্মণের দেহে প্রাণের লক্ষণ নেই! রাম কাঁদতে লাগলেন। প্রিয়তম ভাইয়ের শোকে বিলাপ করতে লাগলেন, 'আমি কার জন্য বাঁচব? বনে আসার সময় লক্ষ্মণ আমার সঙ্গী হয়েছিল। এখন যমালয়ে যাওয়ার সময়, আমিও তার সঙ্গী হব।

'সব দেশেই স্ত্রী বা বন্ধু পাওয়া যায়। কিন্তু এমন দেশ কোথায়, যেখানে (লক্ষ্মণের

মতো) ভাই পাওয়া যায়?'

সুষেণ বললেন, 'লক্ষ্মণ বেঁচে আছেন। হনুমান! তুমি এর আগে যেমন একবার এনেছিলে, এবারও সেই ঔষধি পর্বত থেকে বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী, সঞ্জীবকরণী আর সন্ধানী—এই চার রকমের মহৌষধি নিয়ে এসে এঁর প্রাণ বাঁচাও!'

ঔষধি খুঁজে না পেয়ে, হনুমান এবারও গোটা ঔষধি পর্বতের চূড়াই উপড়ে নিয়ে এলেন। সেই মহৌষধির গন্ধ নাকে যেতেই, উঠে বসলেন লক্ষ্মণ।

রাম লক্ষ্মণকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুমি না থাকলে সীতা-উদ্ধার বা জয়লাভ নিরর্থক।' বলে কাঁদতে লাগলেন।

লক্ষ্মণ বললেন, 'আপনি কি প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেলেন দাদা? দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে আজই রাবণকে বধ করুন!'

রাবণ বধ

অন্য এক রথ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এলেন রাবণ।

ইন্দ্র এক দিব্য রথ পাঠিয়ে দিলেন। রামের জন্য। কারণ, রামের কোনও রথ ছিল না। মাতলি হলেন সেই রথের সারথি।

রাবণের গান্ধর্ব, দৈব আর সর্পাস্ত্র ফিরিয়ে দিলেন রাম। মাতলি আহত হলেন। রামের রথের ধ্বজ উড়ে গেল। ঘোড়া মারা গেল।

সমুদ্র উত্তাল হল। চারপাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। ধূমকেতু দেখা দিল আকাশে। অসুররা রাবণের নামে আর দেবতারা রামের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন।

রাবণ লক্ষ্মণকে যে শক্তিশেল ছুড়ে মেরেছিলেন, রামকেও ঠিক তেমনই এক শেল ছুড়ে মারলেন, রাম সেই শেল দু' টুকরো করলেন। রামের অস্ত্রপ্রহারে জর্জরিত রাবণের সারথি ভয় পেয়ে রথ নিয়ে পালালেন, রাবণ তাঁকে তিরস্কার করে আবার রথ ফেরালেন।

অগস্ত্য এসেছিলেন যুদ্ধ দেখতে। তিনি রামকে আদিত্যহৃদয় স্তোত্র শিখিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই স্তোত্র তিনবার জপ করলেই জয় তোমার অনিবার্য।'

রাম রাবণের মাথা কেটে ফেললেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! সেই কাটা মাথার জায়গায় আবার নতুন করে মাথা গজাল।

মাতলির পরামর্শে, রাম এবার ব্রহ্মাস্ত্র ছুড়লেন। বেদোক্ত মন্ত্রপাঠ করে। ত্রিলোক কাঁপিয়ে সেই বাণ রাবণের বুক ভেদ করে মাটিতে ঢুকে আবার রামের তূণীরেই ফিরে এল।

অতি দর্পে, দশানন রাবণের পতন হল।

দেবতারা রামের রথের ওপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। বানররা মহানন্দে রামের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। জীবিত অবশিষ্ট রাক্ষসরা প্রাণভয়ে যে যে দিকে পারল পালাল।

রাবণকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বিভীষণ বললেন, 'হে নীতিজ্ঞ মহাবীর! মহামূল্যবান বিছানা ছেড়ে এই মাটিতে আপনি শুয়ে আছেন কেন? কতবার

বুঝিয়েছিলাম! শোনেননি কোনও কথা। যা ভয় করেছিলাম, তাই হল। লঙ্কা আজ বীরশূন্য হল!'

রাম বললেন, 'বিভীষণ! মৃত্যুর পর কারও সঙ্গে আর শত্রুতা থাকে না। রাবণ যে মহাবীর, নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন, এতে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি ক্ষত্রিয়ের আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুই বরণ করেছেন। তুমি এঁর সৎকারের ব্যবস্থা করো। ইনি শুধু তোমারই নন, আমারও স্বজন।'

(যে রাবণ অত্যন্ত অন্যায় এবং কাপুরুষোচিতভাবে তাঁর প্রাণসমা স্ত্রী সীতাকে অপহরণ করার মতো গর্হিত কাজ করেছেন, মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি এতটা শ্রদ্ধা প্রদর্শন নিঃসন্দেহে রামের উদারতা এবং মহত্ত্বের প্রতীক।)

রাবণের স্ত্রীদের শোক

রাবণের স্ত্রীরা কাঁদতে কাঁদতে যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন। নানা স্মৃতির রোমন্থন করে তাঁরা বিলাপ করতে লাগলেন। বিশেষ করে মন্দোদরী। রাবণের সীতাহরণের মতিভ্রমের কথাই তিনি বার বার বলতে লাগলেন। রাম যে স্বয়ং বিষ্ণুরই অবতার, সে কথাও তিনি বললেন।

রাবণের সৎকার

বিভীষণ প্রথমে, নীতিগত কারণে, ধর্মচ্যুত রাবণের সৎকার করতে চাননি। শেষে, রামের উপদেশে, রাবণের মুখাগ্নি এবং তর্পণ করলেন। এ কাজে পৌরোহিত্য করলেন মাল্যবান।

বিভীষণের অভিষেক

রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখতে আসা দেবতা-গন্ধর্ব-দানবরা যাঁর যাঁর নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন। রামের নির্দেশে সোনার ঘটে করে সমুদ্রের জল আনলেন লক্ষ্মণ। বিভীষণকে বসালেন সুন্দর এক আসনে। তারপর বিভীষণকে লঙ্কার রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন রাম।

হনুমান রাবণ-বধের খবর দিলেন সীতাকে

রামের নির্দেশে, বিভীষণের অনুমতি নিয়ে হনুমান গেলেন সীতাকে রাবণ-বধের খবর দিতে।

আনন্দে মুখ দিয়ে কথা বেরচ্ছিল না সীতার। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সীতা বললেন, হে মহাবীর! তোমাকে দিয়ে সুখ পাই, এমন কোনও উপহার পৃথিবীতে আছে বলে তো দেখতে পাচ্ছি না।'

হনুমান বললেন, 'এই সব রাক্ষসীরা আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে মা। আপনি

আদেশ করুন! আমি এক্ষুনি এদের মেরে ফেলছি।'

সীতা বললেন, 'এরা অন্যের আজ্ঞাবহ মাত্র। অন্যের আদেশে যারা অন্যায় কাজ করে, জ্ঞানীরা তাদের ক্ষমাই করেন। এদের আমি ক্ষমা করলাম।'

সীতাকে প্রণাম জানিয়ে ফিরে গেলেন হনুমান।

সীতাকে দেখতে চঞ্চল হলেন রাম

হনুমান এসে রামকে বললেন, 'প্রভু! মা সীতা আপনাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন।'

রাম সীতাকে দেখার জন্য চঞ্চল হলেন। বিভীষণকে বললেন, 'এখুনি সীতাকে আনার ব্যবস্থা করো।'

এলেন সীতা

সীতা আসবেন বলে বিভীষণ রামের সামনে থেকে বানর, ভালুক আর রাক্ষসদের সরিয়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন। পাগড়ি বাঁধা নিরাপত্তারক্ষীরা বেত মেরে সবাইকে সরাতে লাগল।

(এটাই বিশ্বের প্রথম লাঠি চার্জের লিখিত ঘটনা।)

(কী আশ্চর্য! বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়কদের নিরাপত্তারক্ষীরা একালেও ঠিক একই রকম আচরণ করেন যে!)

বাধা দিলেন রাম। বললেন, 'ও কী করছ বিভীষণ? সীতা আসবে বলে এদের সরাচ্ছ কেন? চরিত্রই নারীর আসল ভূষণ। লোকজন সরিয়ে কী হবে? আর তা ছাড়া, বিপদে, রোগে, যুদ্ধে, স্বয়ংবর-সভায়, যজ্ঞে আর বিয়ের সময়, নারীকে সবাই দেখতে পারে। তাতে দোষ হয় না।

'আর সীতা তো, সত্যি কথা বলতে কী, চরম বিপদেই পড়েছিল! কাজেই, ওকে বলো, পালকি থেকে বেরিয়ে, পায়ে হেঁটে আমার কাছে আসতে। আমি চাই, সীতার সঙ্গে আমার এই মিলন-দৃশ্য সবাই দেখুক।'

লজ্জায় যেন মাটিতে ঢুকে গেলেন সীতা। কিন্তু, তাঁর প্রাণেশ্বর রঘুনাথকে আবার কাছে পাবেন, এই ভেবে, এক বুক-ভর্তি চাপা আনন্দ নিয়ে, এসে দাঁড়ালেন রামের পাশে।

রাম সীতাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ আর চেপে রাখতে পারছিলেন না। বললেন, 'সীতা! পুরুষকারকে কাজে লাগিয়ে বীরের মতো লড়াই করেই তোমাকে ফিরে পেলাম। আমার কপালদোষে আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে দুর্মতি রাবণ তোমাকে হরণ করেছিল।

'আমি আমার কর্তব্য করেছি। যে নিজের শক্তিতে অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারে না, তার পুরুষকারকে ধিক্। হনুমান সুগ্রীব আর বিভীষণ তোমাকে উদ্ধারের জন্য যা করেছে, তার তুলনা নেই। এদের চেষ্টা সত্যিই আজ সার্থক হয়েছে।'

রামের সীতা-প্রেমের গভীরতা দেখে, মুগ্ধ হয়ে, সব লোকলজ্জা ভুলে, রামের

দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মৃগনয়না সীতা। চোখে সুখের জল! আর কৃতজ্ঞতা!

সীতাকে প্রত্যাখ্যান করলেন রাম

রামের মনে হঠাৎ লোকনিন্দার ভয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। হঠাৎ করেই ঘুরে গেল তাঁর কথার মোড়।

আচমকা গম্ভীর হলেন রাম। বললেন, 'সীতা! তোমার কল্যাণ হোক। একটা কথা জেনে রেখো। শুধু তোমাকে উদ্ধার করার জন্যই কিন্তু এ যুদ্ধ নয়। নিজের চরিত্রবল, লোক-অপবাদের ভয় আর আমাদের বংশমর্যাদা বজায় রাখার কথা মাথায় রেখেও কিন্তু এই লড়াই।'

সীতাকে বিস্মিত করে রাম বললেন, 'তোমার চরিত্রের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে আমি কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারছি না সীতা! চোখের রোগি যেমন প্রদীপের শিখাকে সহ্য করতে পারে না, আমিও তেমনি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না। রাবণ তোমাকে কোলে করেছিল। তোমাকে খারাপ চোখে দেখেছে সে। এখন তোমাকে ফিরিয়ে নিলে আমাদের বংশমর্যাদা রাখব কী করে?'

সীতার বুকে যেন বাজ পড়ল।

রাম তাঁর তূণীর থেকে আরও শাণিত বাক্যশেল বার করলেন। বললেন, 'সীতা! যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে তোমাকে উদ্ধার করেছি, তা সফল হয়েছে। তোমার প্রতি আমার আর বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই। তুমি যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো।'

রাম সম্বন্ধে সীতার তিলে তিলে গড়ে তোলা শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের বিশাল মূর্তিটাকে এক মুহূর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে রাম বললেন, 'সীতা! আমি বেশ ঠাণ্ডা মাথাতেই বলছি, তুমি ইচ্ছে করলে লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব বা বিভীষণ—যাকে তোমার পছন্দ—তার কাছেই যেতে পারো। কিংবা তোমার যা প্রাণে চায়, তুমি তাই করো।

'তবে তোমার মতো সুন্দরীকে নিজের বাড়িতে পেয়েও, রাবণ তোমাকে স্পর্শ করেনি, এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত।'

সবার সামনে রামের মুখে এমনতর অশ্রুতপূর্ব কথা শুনে লজ্জায় মরে গেলেন সীতা। অনেক কষ্টে চোখের জল সামলে, নিজের সুপ্ত ব্যক্তিত্বকে ঘোমটার আড়াল থেকে বার করে আনলেন সীতা।

সীতা বললেন, 'প্রভু! নীচ লোকেরা নিজের স্ত্রীর সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলে, আপনি আমাকে ঠিক সে ভাষায় বলছেন কেন? হনুমানকে যখন লঙ্কায় পাঠালেন, তখনই কেন আমাকে বর্জন করার কথা জানিয়ে দিলেন না? আমি তখনই এ দেহ ত্যাগ করতাম! আপনাদেরও আর অহেতুক সীতা-উদ্ধারের জন্য এত কষ্ট করতে হত না!'

সীতা আরও বললেন, 'আমার দেহ হয়তো সেখানে পড়ে ছিল, কিন্তু, হৃদয় তো আপনার কাছেই ছিল প্রভু! এতদিন একসঙ্গে বাস করেও, আর আমার বংশ-মর্যাদার কথা মাথায় রেখেও, আপনি এ ভাবে কথা বলতে পারলেন!'

লক্ষ্মণকে সীতা বললেন, 'লক্ষ্মণ! তুমি আমার জন্য চিতা সাজাও। আমি আগুনে আত্মাহুতি দেব।'

লক্ষ্মণ রাগে ফুঁসছিলেন। রামের মনোভাব জানতে রামের দিকে তাকালেন।

কী আশ্চর্য! রাম ইঙ্গিতে সম্মতিই দিলেন।

অগত্যা লক্ষ্মণ চিতা সাজালেন।

সীতা মুখ নিচু করে রামকে প্রদক্ষিণ করলেন।

দেবতা এবং ব্রাহ্মণদের প্রণাম করলেন।

তারপর হাত জোড় করে অগ্নিদেবের উদ্দেশে প্রার্থনা জানালেন, 'হে অগ্নিদেব! আমি যদি রাঘব ছাড়া আর কোনও পুরুষের প্রতি আসক্ত না হয়ে থাকি, রাঘব যাকে 'নষ্টচরিত্রা' বলে সন্দেহ করছেন, সেই আমার চরিত্রে যদি কোনও কলঙ্ক স্পর্শ না করে থাকে, তবে আপনি উপস্থিত সকলকে সাক্ষী রেখে আমাকে রক্ষা করুন।

এই বলে সীতা অকুতোভয়ে আগুনে প্রবেশ করলেন।

ঠিক তখনই, সূর্যের মতো বিমানে চেপে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন কুবের, যম, পিতৃগণ, ইন্দ্র, বরুণ, মহাদেব আর ব্রহ্মা।

তাঁরা রামকে বললেন, 'তুমি স্বয়ং সর্বশক্তিমান ভগবান হয়ে এ রকম সামান্য মানুষের মতো আচরণ করছ কেন?'

রাম বললেন, 'আমি নিজেকে শুধু দশরথের ছেলে বলেই জানি।'

দেবতারা বললেন, 'তুমিই স্বয়ং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ!'

এ দিকে অগ্নিদেব নিজে সীতাকে কোলে করে নিয়ে উঠে এলেন চিতা থেকে। বললেন, 'হে রাম! সীতা অপাপবিদ্ধা! রাক্ষসীদের শত প্রলোভনে বা ভীতিপ্রদর্শনেও সীতা কখনও তোমাকে তার হৃদয়াসন থেকে সরিয়ে দেয়নি। তার মনে রাবণের কোনও জায়গাই নেই। আমি বলছি, তুমি সীতাকে নিশ্চিন্তমনে গ্রহণ করো।'

এবার রাম খুলে বললেন, কেন সীতার প্রতি তিনি এতখানি নিষ্ঠুর এবং কর্কশ আচরণ করেছিলেন। বললেন, 'আমি তো জানতামই, সীতা অপাপবিদ্ধা। সে আমাকে ছাড়া এ জগতে আর কাউকেই জানে না। জানতে চায়ও না। কিন্তু আপনারাই বলুন, আমি যদি বিনাবাক্যব্যয়ে সীতাকে বুকে টেনে নিতাম, তা হলে আপনারাই কি বলতেন না, যে, রাম খুব স্ত্রৈণ? রাম খুব কামুক? রাম ভীষণ বোকা?

'সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস এবং লোকাচারকে আমি তো অমান্য বা অমর্যাদা করতে পারি না! সীতাকে ত্যাগ করার কথা আমি ভাবতেই পারি না। আপনাদের মহার্ঘ্য উপদেশ আমি মাথায় তুলে নিলাম।'

(রামের এই যুক্তিকে বিচার করতে হবে সে যুগের সামাজিক আচরণ এবং দণ্ডবিধির পরিপ্রেক্ষিতে। এ যুগের আইনের চোখে নয়।)

আশীর্বাদ করলেন মহাদেব

মহাদেব বললেন, 'রাম! দৈবনির্দেশে তুমি রাবণকে মেরে সীতাকে উদ্ধার করেছ। এবার অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে মনের সুখে বাস করো। বংশ রক্ষা করো। অশ্বমেধ যজ্ঞ করো। ব্রাহ্মণদেব দান-ধ্যান করো। তারপর সময় হলে স্বর্গে যেয়ো।

'ওই দেখো, তোমার বাবা স্বর্গ থেকে রথে চেপে এসেছেন। তোমাকে দেখতে।'

(মহাদেবের এই আশীর্বাদই প্রমাণ করে সীতা লঙ্কায় গর্ভবতী ছিলেন না। অযোধ্যার প্রজাদের সন্দেহ অমূলক। কারণ, মহাদেব বলছেন, 'অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে বংশরক্ষা করো।')

দশরথ এলেন রামকে দেখতে

পুত্রস্নেহে-অন্ধ দশরথ স্বর্গের বিমানে চেপে এসেছেন। এসেছেন ছেলে, ছেলের বউকে দেখতে। চোদ্দো বছর পর এই দেখা-সাক্ষাতে সকলেই দারুণ খুশি।

রাম-লক্ষ্মণ দশরথকে প্রণাম করলেন। দশরথ রামকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তোমাকে ছেড়ে স্বর্গেও আমি সুখ পাচ্ছিলাম না বাবা। আজ তোমাদের দেখে মনটা শান্তিতে ভরে গেল। চোদ্দো বছর বনে অনেক কষ্ট পেয়েছ বাবা! যাও, এবার অযোধ্যায় গিয়ে ভাইদের সঙ্গে রাজ্য ভোগ করো। দীর্ঘায়ু হও!'

রাম বললেন, 'বাবা! আপনি ভরত সমেত মা কৈকেয়ীকে ত্যাগ করেছিলেন। আপনার কথা আপনি ফিরিয়ে নিন!'

দশরথ বললেন, 'বেশ বাবা! তাই হবে!' তারপর লক্ষ্মণকে জড়িয়ে ধরে দশরথ বললেন, 'লক্ষ্মণ! রাম কে, তা জানো? রামই স্বয়ং পুরুষোত্তম ভগবান। তুমি মনপ্রাণ ঢেলে রাম-সীতার সেবা করো। তা হলেই তোমার ধর্ম, কর্ম, যশোলাভ, স্বর্গলাভ—হয়ে যাবে!'

সীতা কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। হাত জোড় করে। দশরথ বললেন, 'মা! তুমি রামের ওপর রাগ কোরো না। সে তোমার মঙ্গল আর শুদ্ধির জন্য তোমাকে ত্যাগ করার কথা বলেছিল। তুমি যা চরিত্রবল দেখিয়েছ মা, জগতে তা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আর পতিসেবার কথা তোমায় আর কী বলব মা? তবু বলি, রামই তোমার আরাধ্য দেবতা। এ কথাটি যেন কখনও ভুলে যেয়ো না।' বলে বিদায় নিলেন দশরথ।

বর দিলেন ইন্দ্র

ইন্দ্র বর দিতে চাইলে, রাম বললেন, 'আমার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে যাঁরা মৃত্যুকে বরণ করেছেন, তাঁদের সবাইকে জীবন ফিরিয়ে দিন। তাঁদের সবার যেন নীরোগ-বলশালী দেহ হয়। তাঁদের দেশ যেন অকালেও সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা হয়।'

ইন্দ্র বললেন, 'তথাস্তু'।

লঙ্কার যুদ্ধে যত বানর আর ভালুক মারা গিয়েছিল, সবাই আবার জীবন ফিরে পেয়ে মহানন্দে লাফালাফি লাগিয়ে দিল।

অযোধ্যায় ফেরা

পরদিন। ভোর হতেই বিভীষণ এলেন রামের কাছে। সঙ্গে লঙ্কার শ্রেষ্ঠা সুন্দরীরা। বিভীষণ বললেন, 'রাম! এঁরা সবাই লঙ্কার ডাকসাইটে সুন্দরী। এঁরা আপনার স্নানের জন্য দামি কাপড়-চোপড়, প্রসাধনের জিনিস, গয়নাগাটি, চন্দন, মালা ইত্যাদি নিয়ে

এসেছেন। এঁরা সকলেই প্রসাধন-বিশেষজ্ঞা। আপনি এঁদের সঙ্গে স্নানে যান।'

বিভীষণকে এ সবের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে রাম বললেন, 'বিভীষণ! ভরত আমার জন্য এখনও কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করছে। এ অবস্থায় আমি এই বিলাসিতায় গা ভাসাতে পারব না। তবে হ্যাঁ, সুগ্রীব এবং অন্যরা যদি চান, তো এই সব সুন্দরীদের সঙ্গে স্নানে যেতে পারেন। আমার আপত্তি নেই। তুমি বরং দেখো, যাতে আমরা অবিলম্বে অযোধ্যায় ফিরতে পারি। আমার মন পড়ে রয়েছে সেখানে।'

বিভীষণ বললেন, 'চিন্তা কী রাম? আমার বড়দা কুবেরের পুষ্পক তো আছে। যাতে করে রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় এনেছিলেন। সেই পুষ্পক আপনাকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। পুষ্পকই আপনাকে অযোধ্যায় পৌঁছে দিয়ে আসবে। একদিনেই পৌঁছে যাবেন। তবে, এখানে কিছুদিন থেকে গেলে খুবই খুশি হতাম আমরা।'

রাম বললেন, 'না বিভীষণ! তা হয় না। এখানে তো অনেক আদর যত্ন পেলামই। তোমাদের অতিথি সৎকারে কোনও ত্রুটি তো হয়নি। অযোধ্যার প্রজাদের জন্য আমার প্রাণ কাঁদছে। প্রাণ কাঁদছে ভরত আর মায়েদের দেখার জন্য। কিছু মনে কোরো না ভাই। আমাদের ফেরার ব্যবস্থা করো।'

বিভীষণ কী আর করেন। অগত্যা। সাজালেন সুসজ্জিত পুষ্পক রথ। রামের ইচ্ছে মতো বিভীষণ বানরদের মুঠো মুঠো ধনরত্ন দিলেন।

একে একে বিমানে উঠলেন সবাই। জানালার ধারে একটা আসনে সীতাকে কোলে নিয়ে বসলেন রাম। সীতা খুব লজ্জা পাচ্ছিলেন। লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, বিভীষণ আর শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন বানর, ভল্লুক আর রাক্ষস বীরও চললেন একই বিমানে।

দেখতে দেখতে বিমান আকাশে উঠল। রাম সীতাকে জানালা দিয়ে দর্শনীয় সব জায়গা দেখাতে দেখাতে ওই সব জায়গা সম্পর্কে একটা ধারাবিবরণী দিতে লাগলেন।

রাম বললেন, 'ওই দেখো সীতা! ত্রিকূট পর্বতের মাথায় লঙ্কাপুরী দেখা যাচ্ছে! ইস্! যুদ্ধক্ষেত্রটার দিকে একদম তাকানোই যাচ্ছে না! রক্তে-মাংসে ভরে আছে একেবারে!

'ওই দেখো সীতা! নলের তৈরি সেই সেতু! এই সেতুর ওপর দিয়েই আমরা লঙ্কায় গিয়েছিলাম! ওই দেখো সাগর! ঢেউগুলো কী বিশাল দেখেছ? ওই যে পাহাড়ের চূড়া দেখছ? সমুদ্র থেকে মাথা বার করে আছে? ওই হচ্ছে মৈনাক!

'ওই হচ্ছে সেতুবন্ধ। ওখানেই মহাদেব আমার ওপর খুব খুশি হয়ে আমাকে বর দিয়েছিলেন। ওই যে দূরে একটা পাহাড় দেখতে পাচ্ছ? ওইখানেই আছে কিষ্কিন্ধ্যা।'

'কিষ্কিন্ধ্যা!' পুলকিত হলেন সীতা। বললেন, 'ওখানে একটু বিমানটাকে নামাতে বলুন না প্রভু!'

রাম বললেন, 'কেন?'

সীতা বললেন, 'সুগ্রীবের স্ত্রী তারা আর অন্যান্য বানরবীরদের স্ত্রীদের আমাদের বিমানে তুলে নিতে চাই।'

সীতার ইচ্ছে মতো, বিমান নামল কিষ্কিন্ধ্যায়। বানর স্ত্রীরা তো মহা খুশি! খুব সেজেগুজে সবাই মিলে উঠে পড়লেন বিমানে।

বিমান আবার উড়ল আকাশে। রাম আবার সীতাকে দেখাতে লাগলেন তাঁদের স্মৃতিবিজড়িত নানা জায়গাগুলো।

'ওই দেখো সীতা! ঋষ্যমূক পর্বত!

'রাবণ তোমাকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময়, বানররা এখানেই ছিল। ওরা তোমাকে দেখতে পেয়েছিল। তোমার ফেলা অলঙ্কারগুলো ওরা কুড়িয়ে রেখেছিল। আমি তোমার খোঁজে এখানে এলে, আমার হাতে অলঙ্কারগুলো ওরা তুলে দিয়েছিল।' আবেগে অস্থির হয়ে উঠলেন রাম।

'ওই যে পম্পা সরোবর! ওখানেই বৃদ্ধা তাপসী শবরী আমার প্রতীক্ষায় দিন গুনছিলেন।

'ওই দেখো সীতা! জনস্থান! ওই আমাদের পর্ণকুটিরটা! স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! ইস! কী সুখেই না ছিলাম ওখানে!

'এখন আমরা গোদাবরীর ওপর দিয়ে যাচ্ছি। ওই যে দেখো, অগস্ত্য মুনির আশ্রম দেখা যাচ্ছে! ওই দেখো, শরভঙ্গ মুনির আশ্রম! অত্রিমুনির আশ্রমটাকে চিনতে পারছ? ওখানেই তো তাপসী অনসূয়ার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল!

'চিত্রকূটকে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছ সীতা? এখন যমুনা নদীর ওপর দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু আমরা! ওই যে আশ্রম দেখছ? ওটাই ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম!

'গঙ্গাকে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছ? প্রণাম করো। ওই শৃঙ্গবেরপুর! আমার বন্ধু গুহকে মনে পড়ে?

'সীতা! সীতা! তুমি আবার অযোধ্যায় ফিরে এসেছ সীতা! ওই দেখো তোমার প্রাণের অযোধ্যা! দেখতে পাচ্ছ? প্রণাম করো সীতা। প্রাণভরে প্রণাম করো তোমার সোনার অযোধ্যাকে। তোমার শান্তির অযোধ্যাকে।'

অযোধ্যা আসতেই, বানর আর রাক্ষসরা মহা হই চই লাগিয়ে দিল। তারা মহানন্দে অমরাবতীর মতো সুন্দর অযোধ্যাকে দেখতে লাগল।

আনন্দে ভরে উঠল রাম-লক্ষ্মণ-সীতার মন। 'উঃ! দুঃখের দিন তা হলে এতদিনে সত্যিই শেষ হল!' তিন জনেরই মনের কথা যেন বেজে উঠল একই সুরে!

ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে

বনবাসের ঠিক চোদ্দো বছর পূর্ণ হল। পঞ্চমী তিথিতে রাম পুষ্পক থেকে নেমে এসে পা রাখলেন ভরদ্বাজের আশ্রমে। ভরদ্বাজের কাছে মায়েদের, ভরতের আর অন্য সবার কুশল সংবাদ নিলেন রাম।

রাম বনে যাওয়ার সময় ভরদ্বাজ খুব কষ্ট পেয়েছিলেন মনে। আজ রাম লঙ্কা জয় করে ফিরেছেন। ভরদ্বাজ তো মহা খুশি। তাঁর বরে তাঁর আশ্রম থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত তিন যোজন পথের সর্বত্র যত গাছ ছিল, সব অকালে ফলে ভরে গেল। বানররা মহা আনন্দে ভূরিভোজ লাগিয়ে দিল।

হনুমান এলেন ভরতের কাছে

রামের নির্দেশে, হনুমান ছুটলেন ভরতকে খবর দিতে। এবং রামের ফেরার খবর পেয়ে ভরতের মনোভাব কী হয়, তা বুঝতে।

পথে শৃঙ্গবেরপুরে গুহকে খবরটা দিয়ে হনুমান সটান হাজির হলেন নন্দিগ্রামে। অযোধ্যা থেকে এক ক্রোশ দূরে। ভরত সেখানে তপস্বীর বেশে রামের পাদুকা সিংহাসনে বসিয়ে সেই পাদুকার প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসন করছেন।

রামের ফেরার খবর পেয়ে ভরত এত খুশি হলেন, যে তক্ষুনি হনুমানকে এক লক্ষ গরু, একশোটা গ্রাম আর ষোলো জন পরমাসুন্দরী মেয়েকে উপহার হিসেবে দিলেন।

(হনুমান তো আকুমার ব্রহ্মচারী। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য তাঁর। পরমাসুন্দরীদের নিয়ে তিনি কী করবেন?)

হনুমান ভরতকে সবিস্তার শোনালেন রামের চোদ্দো বছর বনবাসের কাহিনী। বললেন, 'কাল শুভ পুষ্যা নক্ষত্রযোগ। কালই রাম ভরদ্বাজ আশ্রম থেকে এখানে আসবেন।'

ভরত হাত জোড় করে বললেন, 'আঃ! এত দিনে আমার প্রতীক্ষা শেষ হল হনুমান!'

আনন্দে ছল ছল করে উঠল ভরতের চোখ।

রামের সম্বর্ধনা

পরদিন। ভরত আর শত্রুঘ্নের ব্যবস্থাপনায় এক বিরাট বাহিনী চলল রামকে স্বাগত জানাতে। মা কৌশল্যা, মা কৈকেয়ী আর মা সুমিত্রার পেছন পেছন দশরথের অন্যান্য মহিষীরা চললেন।

ভরত তাঁর মন্ত্রী আর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে চললেন। মাথায় রামের পাদুকা নিয়ে। সবার গন্তব্য নন্দিগ্রামের এক প্রশস্ত মাঠ। যেখানে রামের বিমান এসে নামবে।

(বিমানবন্দর কি? না কি হেলিপ্যাড? প্রশস্ত মাঠ কি রানওয়ের জন্য? কল্পনা কি বাস্তবের ভিত ছাড়া এমন নিখুঁতভাবে ভবিষ্যতের বাস্তবকে ধরতে পারে? মনে হয় না।)

দেখতে দেখতে রামের বিমান এসে গেল মাথার ওপর। 'ওই যে রাম!' 'ওই যে রাম!' রামের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন সবাই।

বিমান থেকে নেমেই, রাম ভরতকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দে জল এল সবার চোখে। ভরত রামের পা ধুইয়ে দিলেন। পুজো করলেন রামকে। বেজে উঠল হাজার হাজার শাঁখ।

দীর্ঘ চোদ্দো বছরের বিচ্ছেদের পর রাম-লক্ষ্মণ-সীতার সঙ্গে সকলেই একে একে এসে দেখা করলেন। পরস্পরের কুশল বিনিময় করলেন।

মা কৌশল্যার চরণে প্রণাম জানালেন রাম। কৌশল্যা বুকে জড়িয়ে ধরলেন রামকে। আনন্দে আর অশ্রুজলে ভেসে গেলেন দু'জনেই।

এরপর রাম একে একে মা কৈকেয়ী এবং মা সুমিত্রাসহ সব মায়েদেরই প্রণাম

জানালেন। সকলেই রামকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। লক্ষ্মণ আর সীতাও রামের সঙ্গে সঙ্গে সব প্রণম্যদের প্রণাম করলেন। স্নেহাস্পদদের আলিঙ্গন করলেন।

ভরত বললেন, 'দাদা! এতকাল আপনার প্রতিনিধি হয়ে আমি অযোধ্যা শাসন করেছি। আপনার আশীর্বাদে এই চোদ্দো বছরে আমাদের রাজকোষ আর সৈন্যদল দশ গুণ বেড়েছে! এবার আপনি দয়া করে ওই গুরুভার থেকে আমাকে মুক্তি দিন! আপনার সিংহাসনে আপনি নিজে বসুন!'

রাম বললেন, 'বেশ ভরত! তবে তাই হোক।'

রাজপদে অভিষিক্ত হলেন রাম

দক্ষ নাপিতরা রাম-লক্ষ্মণ-ভরতের জটা কেটে দিলেন। স্নান করে এসে দামি কাপড় পরলেন রাম। মালা-চন্দনে-ফুলে-অলঙ্কারে রাম-লক্ষ্মণকে রাজবেশে সাজালেন শত্রুঘ্ন। সীতাকে রাজরানির বেশে সাজালেন দশরথের যত রানিরা। বানরীদের সাজাবার ভার নিলেন কৌশল্যা নিজে।

(রামায়ণ-মহাভারতের যুগে রূপচর্চার যে বেশ রমরমা ছিল তার প্রমাণ দুই মহাকাব্যের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।)

হনুমান, জাম্ববান, বেগদর্শী আর ঋষভ চার সাগরের জল নিয়ে এলেন। এল পাঁচশো বিভিন্ন নদীর জল।

সীতাকে বাঁ পাশে নিয়ে রাম বসলেন রত্ন-সিংহাসনে। বশিষ্ঠ, বিজয়, জাবালি ইত্যাদি পুরোহিতরা রামকে অযোধ্যার রাজপদে অভিষিক্ত করলেন।

বশিষ্ঠ রামের মাথায় পরিয়ে দিলেন অযোধ্যার রাজমুকুট, ব্রহ্মার তৈরি যে-মুকুট ইক্ষ্বাকু বংশের রাজারা বংশানুক্রমে শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথায় ধারণ করে আসছেন।

ব্রাহ্মণদের অনেক গাড়ি, বৃষ, ঘোড়া, সোনা আর কাপড়-চোপড় দিলেন রাম। সুগ্রীব আর অঙ্গদকে দিলেন দামি অলঙ্কার।

সীতাকে চাঁদের কিরণের মতো উজ্জ্বল এক মুক্তোমালা, আর দামি শাড়ি আর গয়নাগাটি দিলেন রাম। সীতা সে মুক্তোর মালা, রামের অনুমতি নিয়ে, পরিয়ে দিলেন হনুমানের গলায়। হনুমান তার তেজ, ধৈর্য, যশ, দক্ষতা, সামর্থ্য, বিনয়, নীতি, পৌরুষ, বিক্রম আর বুদ্ধির স্বীকৃতিস্বরূপ পেলেন সে পুরস্কার।

অভিষেকপর্ব মিটে গেল। সুগ্রীব আর বিভীষণ তাঁদের লোকজন নিয়ে ফিরে গেলেন যে যাঁর দেশে।

রাম লক্ষ্মণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চাইলেন। লক্ষ্মণ কিছুতেই রাজি হলেন না। রাম তখন ভরতকেই যুবরাজপদে অভিষিক্ত করলেন। রাজা হয়ে রাম অনেক যজ্ঞ করলেন। দশ হাজার বছর রাজত্ব করেছেন রাম।

(রামের সময়ে 'এক বছর'-এর সংজ্ঞা বা পরিমাপ কী ছিল, আমরা জানি না। তবে দশ হাজার বছরের রাজত্বকাল বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে, যদি তখনকার এক বছর = এখনকার এক দিন বা তার কাছাকাছি সময় বলে ধরে নিই।)

তাঁর রাজত্বকালে রাম দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন। রাম-রাজত্বে প্রজারা সবাই মহানন্দে ছিলেন। কোনও হিংস্র পশু বা চোর-ডাকাতের ভয় ছিল না। রোগ-ব্যাধি

কিছু ছিল না। গাছে গাছে অপর্যাপ্ত ফল-ফুল হত।

রাম-রাজত্বে সকলেই ছিলেন অত্যন্ত দীর্ঘায়ু। কেউ বিধবা হতেন না। অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সীকে অপেক্ষাকৃত কম বয়সীর শব দাহ করতে হত না। সব মা-বাবারই অনেক সন্তান ছিল। আর প্রত্যেকেই হাজার হাজার বছর (তখনকার হিসেবে) বাঁচতেন।

সকলেই নিজের নিজের কাজে তৃপ্ত ছিলেন। প্রত্যেকেই ছিলেন ধার্মিক আর সত্যবাদী।

(বাল্মীকি মুনি সম্ভবত 'রামায়ণ' এখানেই শেষ করেছিলেন। কারণ, এর পরেই তিনি রামায়ণ-মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। উত্তরকাণ্ড সম্ভবত প্রক্ষিপ্ত। যদিও, তা মূলের সঙ্গে একই সুরে, একই মেজাজে বাঁধা। কারও কারও মতে বাল এবং উত্তর, দুই কাণ্ডই প্রক্ষিপ্ত।)

রামায়ণ মাহাত্ম্য

মহর্ষি বাল্মীকি বলেছেন, রামায়ণ যিনি পাঠ করেন, বা শোনেন, তিনি, ধর্ম, অর্থ, আয়ু, যশ, বিজয়, পুত্র ইত্যাদি যা চান, তা-ই পান। তাঁর সর্বপাপ নাশ হয়। তাঁর সর্ব মনস্কামনা পূর্ণ হয়। যিনি অত্যন্ত ভক্তি নিয়ে এই পুণ্যকাহিনী লেখেন, তাঁর স্বর্গ লাভ হয়।

উত্তরকাণ্ড

মুনিরা এলেন রামের কাছে

লঙ্কা জয় করে ফিরে এসে, রাম অযোধ্যার রাজ-সিংহাসনে বসে মহাসুখে রাজত্ব করছেন। এ খবর পেয়ে অগস্ত্য, কৌশিক, গার্গ, কণ্ব, ধৌম্য, অত্রি, কশ্যপ, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, ইত্যাদি মুনিরা এলেন রামকে আশীর্বাদ করতে। বললেন, 'রাবণ বধের জন্য নয়, ইন্দ্রজিৎকে বধের জন্যই আমরা তোমাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি।'

রাম তো অবাক! বললেন, 'সে কী! ইন্দ্রজিৎকে আপনারা রাবণ, কুম্ভকর্ণ, মহোদর বা প্রহস্তের চেয়েও বেশি মর্যাদা দিচ্ছেন কেন? আমি তো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। যদি একটু বুঝিয়ে বলেন।'

অগস্ত্য বললেন, 'বেশ! শোনো তা হলে! আগে রাবণের বংশ পরিচয় শোনো। তারপরে ইন্দ্রজিতের কথা শোনাব।'

কুবের কাহিনী

অগস্ত্য শুরু করলেন তাঁর কাহিনী—

'ব্রহ্মার ছেলে ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্য সত্যযুগে সুমেরু পর্বতের কাছে রাজর্ষি তৃণবিন্দুর আশ্রমে তপস্যা করতেন। সেখানে ঋষি, নাগ আর রাজর্ষিদের মেয়েরা নাচগান করে তপস্বীদের তপস্যায় বাধা সৃষ্টি করত।

"পুলস্ত্য একদিন রেগে গিয়ে বললেন, 'কোনও নারী আমার তপস্যার সময় আমার চোখের সামনে এলেই, তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী হবে।'

"তৃণবিন্দুর মেয়ে এ কথা জানতেন না। একদিন পুলস্ত্যের সামনে এসে পড়ায়, তাঁর গর্ভসঞ্চার হল। তৃণবিন্দু পুলস্ত্যের শরণাপন্ন হলেন। বললেন, 'আপনি আমার মেয়েকে গ্রহণ করুন।'

"পুলস্ত্য গ্রহণ করলেন তৃণবিন্দুর মেয়েকে। সেই মেয়ের গর্ভজাত ছেলেই পৌলস্ত্য। পুলস্ত্যের বেদপাঠের সময় তৃণবিন্দুর মেয়ের গর্ভসঞ্চার হয়েছিল। তাই পৌলস্ত্যের আর এক নাম হল বিশ্রবা। (বি অর্থাৎ, বিশেষ, শ্রব অর্থাৎ, কীর্তি যাঁর।)

"ভরদ্বাজের মেয়ে দেববর্ণিনীর গর্ভে বিশ্রবার বৈশ্রবণ নামে এক ছেলে হল। দু' হাজার বছরের তপস্যায় ব্রহ্মাকে খুশি করলেন বৈশ্রবণ।

"ব্রহ্মা বর দিলেন, 'যম, ইন্দ্র আর বরুণের মতো তোমাকেও আমি লোকপাল করলাম। আজ থেকে তুমি হলে চতুর্থ লোকপাল। আমার ধনাধ্যক্ষ। কুবের। এই সূর্যের মতো দিব্য পুষ্পক বিমানও আমি তোমাকেই দিলাম।'

"বিশ্রবার নির্দেশে, কুবের চলে গেলেন লঙ্কায়। দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে ত্রিকূট পর্বতের ওপর রাক্ষসদের জন্য স্বর্গের অমরাবতীর মতো সুন্দর করে স্বর্ণলঙ্কাকে তৈরি করলেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা। বিষ্ণুর ভয়ে রাক্ষসরা লঙ্কা থেকে পালিয়ে বাস করছিল পাতালে। এরা আবার ফিরে এল লঙ্কায়।"

রাক্ষসদের সঙ্গে বিষ্ণুর যুদ্ধ হল

অগস্ত্যের কথায় অবাক হলেন রাম। বললেন, 'তা কী করে হয় মুনিবর? আমরা তো শুনেছি রাক্ষসরা পুলস্ত্যের বংশধর। কিন্তু আপনি বলছেন, বৈশ্রবণের আগেও, লঙ্কায় রাক্ষসরা বাস করত। এটা কী করে সম্ভব হল? তা হলে ওই সব রাক্ষসরা কি রাবণ- কুম্ভকর্ণ ইত্যাদির চেয়েও শক্তিমান ছিল? আর বিষ্ণু তাদের তাড়ালেনই বা কেন?'

অগস্ত্য বললেন, 'শোনো তা হলে। সে আর এক কাহিনী।' অগস্ত্য শোনালেন তাঁর কাহিনী—

"প্রজাপতি ব্রহ্মা সবার আগে সৃষ্টি করলেন জল। তারপর সৃষ্টি করলেন প্রাণীদের। জল রক্ষা করার ভার দিলেন প্রাণীদের।

"প্রাণীরা দু ভাগে ভাগ হয়ে গেল। একদল বলল, 'রক্ষামঃ'। অর্থাৎ, 'আমরা রক্ষা করব'। আর একদল বলল, 'যক্ষামঃ'। অর্থাৎ 'আমরা পুজো করব'।

"যারা বলল, 'রক্ষামঃ'। তারাই হল 'রাক্ষস'। আর যারা বলল, 'যক্ষামঃ' তারাই হল 'যক্ষ'।

"রাক্ষসদের মধ্যে হেতি আর প্রহেতি নামে দুই ভাই ছিলেন। শক্তিতে এঁরা ছিলেন মধু আর কৈটভের সমতুল্য।

"প্রহেতি তপস্যা করতে বনে চলে গেলেন। হেতি বিয়ে করলেন যমের ভয়ঙ্করা বোন 'ভয়া'কে। ভয়ার ছেলে বিদ্যুৎকেশ।

"রাক্ষসী সন্ধ্যার মেয়ে সালকটঙ্কটা-কে বিয়ে করলেন বিদ্যুৎকেশ। সালকটঙ্কটা

সদ্যোজাত ছেলে সুকেশকে মন্দর পর্বতে ফেলে রেখে, পালিয়ে এলেন স্বামীর কাছে।

"হর-পার্বতী চলেছিলেন সেই পথে। তাঁরা শুনতে পেলেন সেই নবজাতকের কান্না। পার্বতীর অনুরোধে শিব সুকেশকে এক মুহূর্তে তার মার সমবয়সী করে দিলেন। সুকেশকে আকাশে ঘুরে বেড়াবার, আর অমর হওয়ার বরও দিলেন।

"পার্বতীও বর দিলেন, 'এখন থেকে রাক্ষসীদের গর্ভধারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। আর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই, শিশুরা হয়ে উঠবে তাদের মায়েদের সমবয়সী।'

"সুকেশ বিয়ে করলেন গন্ধর্ব গ্রামণীর মেয়ে দেববতীকে। এঁদের তিন ছেলে হল। মাল্যবান, সুমালী আর মালী। ব্রহ্মার বরে এঁরা অজেয় হলেন। এঁদের অনুরোধেই, বিশ্বকর্মা তৈরি করলেন লঙ্কাপুরী।

"গন্ধর্বী নর্মদার তিন মেয়ে ছিল। সুন্দরী, কেতুমতী আর বসুদা। এঁদের বিয়ে করলেন যথাক্রমে মাল্যবান, সুমালী আর মালী।

"সুন্দরী জন্ম দিলেন বিরূপাক্ষ, মত্ত ইত্যাদি ছেলের। কেতুমতীর গর্ভে জন্মালেন প্রহস্ত, অকম্পন, ধূম্রাক্ষ ইত্যাদি ছেলে। আর কৈকসী, কুম্ভীনসী ইত্যাদি মেয়ে। অনল প্রভৃতি ছেলের জন্ম দিলেন বসুদা।

"রাক্ষসদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবতা আর ঋষিরা মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন।

"মহাদেব বললেন, 'এরা আমার অবধ্য। তোমরা নারায়ণের শরণ নাও।'

"নারায়ণ বললেন, 'তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। আমিই এদের বধ করব।'

"বিষ্ণুকে রাক্ষসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করার জন্য রাক্ষসদের রাগ গিয়ে পড়ল দেবতাদের ওপর। দেবতাদের আক্রমণ করতে গেলেন তাঁরা।

"বিষ্ণু নিজে গেলেন যুদ্ধে। মালী প্রাণ হারালেন। সুমালী আর মাল্যবান পালালেন পাতালে।"

অগস্ত্য বললেন, "বুঝলে রাম! সালকটঙ্কটার বংশধর এই সব রাক্ষসদের শক্তি রাবণের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। এদের বধ করার ক্ষমতা নারায়ণ ছাড়া আর কারওই ছিল না। "হে রাম! তুমিই সেই নারায়ণ!"

জন্ম নিলেন রাবণ

অগস্ত্য বলে চললেন—

"সুমালীর রূপবতী মেয়ে কৈকসী, বাবার পরামর্শে, বিশ্রবাকে স্বামী হিসেবে পেতে ধ্যানস্থ বিশ্রবার সামনে বসে মাটিতে আঁক কাটছিলেন। বিশ্রবা তাঁর মনোভাব বুঝে বললেন, 'তুমি প্রদোষকালে এসেছ। তাই তোমার সন্তানরা সব ভয়ঙ্কর রাক্ষস হবে।'

"কৈকসী কেঁদে বললেন, 'দোহাই প্রভু! আমাকে দয়া করুন। অমন ছেলে আমি চাই না।'

"বিশ্রবা বললেন, 'বেশ! তোমার ছোট ছেলে ধার্মিক হবে।'

"কৈকসীর প্রথম ছেলের জন্ম হল। ভয়ঙ্কর (মতান্তরে, অত্যন্ত সুদর্শন,

বীরোচিত) তার চেহারা। দশটা মাথা। কুড়িটা হাত। বিশাল বিশাল দাঁত। তুঁতের মতো গায়ের রং।

"দশটা 'আনন' (মুখমণ্ডল)। তাই 'দশানন' নাম হল শিশুর। দশটা 'গ্রীবা' (ঘাড় বা গলা) তাই 'দশগ্রীব'। অনেক পরে আঙুলে কৈলাস পর্বতের চাপ পড়ায় প্রচণ্ড 'রব' (চিৎকার) করেছিলেন। তাই মহাদেব খুশি হয়ে নাম দিয়েছিলেন 'রাবণ'।

"কৈকসীর মেজো ছেলে কুম্ভকর্ণেরও অতি বিশাল, অতি বিকট চেহারা। কুম্ভের (কলসির) মতো কান। তাই 'কুম্ভকর্ণ'। কুম্ভকর্ণের ভুঁড়ির বেড় ছিল চার শো হাত (৬০০ ফুট)! উচ্চতা দু' হাজার চার শো হাত (৩৬০০ ফুট)!"

(একালের পাঠকের কাছে একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে। উচ্চতা এবং ভুঁড়ির মাপ মাপার 'হস্ত' হয়তো খুবই ছোট 'একক' ছিল।)

"কৈকসীর তৃতীয় সন্তান মেয়ে। 'শূর্পণখা'। বিকট চেহারা তাঁরও। 'শূর্পণখা' অর্থাৎ কুলোর মতো তাঁর নখ। তাই 'শূর্পণখা'।

"সবার শেষে জন্ম হল কৈকসীর ছোট ছেলে 'বিভীষণের'। তাঁর চেহারা অন্য তিন ভাইবোনের মতো কদাকার নয়। মোটামুটি সুদর্শন।"

(তাই যদি হবে, তবে নামটা সুদর্শন না হয়ে, বিভীষণ হল কেন, কে জানে!)

রাবণদের তিন ভাইকে বর দিলেন ব্রহ্মা

অগস্ত্যের কাহিনী চলতে থাকে।

অগস্ত্য বললেন—

"মা কৈকসীর ইচ্ছে অনুসারে, সৎ দাদা কুবেরের সমকক্ষ হতে চেয়ে রাবণ দু'ভাইকে নিয়ে ব্রহ্মার তপস্যা শুরু করলেন। তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করলেন।

"ব্রহ্মা বর দিতে চাইলে, রাবণ বললেন, 'আমি যেন পাখি, সাপ, যক্ষ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস আর দেবতাদের অবধ্য হতে পারি। অন্য প্রাণীদের জন্য আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। আর মানুষকে আমি ঘাসের মতো তুচ্ছ জ্ঞান করি।'

"মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নিজের কবর নিজেই খুঁড়ে রাখলেন রাবণ। ব্রহ্মা বললেন, 'তথাস্তু।'

"বিভীষণ বললেন, 'মহাবিপদেও আমি যেন ধর্মকে না ছাড়ি। আর শিক্ষা না পেলেও আমার যেন ব্রহ্মজ্ঞান হয়।'

"ব্রহ্মা খুব খুশি হয়ে বললেন, 'বাঃ! তুমি তো খুব ধার্মিক দেখছি। বেশ! তুমি যা চেয়েছ, তা তো পাবেই। এ ছাড়াও, আমি বর দিচ্ছি, রাক্ষস হয়েও তোমার এই ধর্মপ্রীতির জন্য তুমি অমর হবে।'

"দেবতারা হাতজোড় করে ব্রহ্মাকে বললেন, 'ভগবান! দোহাই আপনার। দয়া করে এই দুরাত্মা কুম্ভকর্ণকে যেন বর দেবেন না! এই পাজিটা সাত জন অপ্সরা, ইন্দ্রের দশ জন অনুচর, অনেক ঋষি আর মানুষকে খেয়েছে। আপনার বর পেলে তো এ ত্রিভুবনকেই ও খেয়ে শেষ করবে!'

"তখন, ব্রহ্মার ইঙ্গিতে সরস্বতী গিয়ে বসলেন কুম্ভকর্ণের জিবে। এতে কাজ হল।

সরস্বতীর কৌশলে মোহাবিষ্ট হয়ে কুম্ভকর্ণ বললেন, 'আমি বছরের পর বছর ঘুমোতে চাই।'

(কৌশলে যে দেবতারা বরাবরই এগিয়ে, তা আরও একবার প্রমাণিত হল।)

"ব্রহ্মা মুখ টিপে হেসে বললেন, 'তথাস্তু'।

"সর্বনাশ! ভাই এ কী বর চাইল?' রাবণ জড়িয়ে ধরলেন ব্রহ্মার পা।

"ব্রহ্মা বললেন, 'বেশ! ছ' মাস্ অন্তর একদিনের জন্য জেগে উঠবে তোমার ভাই।'

"ব্রহ্মার কাছ থেকে বর পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লাগলেন রাবণ। দাদামশাই সুমালী আর মামা প্রহস্তের প্ররোচনায়, রাবণ সৎ দাদা কুবেরকে লঙ্কা ছাড়তে বললেন। বাবা বিশ্রবার উপদেশ মতো, শান্তিপ্রিয় কুবের লঙ্কা ছেড়ে চলে গেলেন কৈলাসে।"

মন্দোদরীকে বিয়ে করলেন রাবণ

অগস্ত্য বললেন—

"দানব ময় আর অপ্সরা হেমার মেয়ে মন্দোদরীকে বিয়ে করলেন রাবণ। ময় রাবণকে বিয়ের যৌতুক হিসেবে 'শক্তি শেল' দিলেন। এই শক্তি শেলেই লক্ষ্মণকে আঘাত করেছিলেন রাবণ। চেতনা হারিয়েছিলেন লক্ষ্মণ। নিজে বিয়ে করার আগেই, দানবরাজ বিদ্যুজ্জিহ্বের সঙ্গে বোন শূর্পণখার বিয়ে দিয়েছেন রাবণ।

"বৈরোচনের নাতনি (দৌহিত্রী) বজ্রজ্বালার সঙ্গে কুম্ভকর্ণের আর গন্ধর্বরাজ শৈলূষের মেয়ে সরমার সঙ্গে বিভীষণের বিয়ে হয়ে গেল।

"মন্দোদরীর এক ছেলে হল। জন্মেই, 'মেঘের মতো নাদ' (শব্দ) করতে লাগল সে। তাই তার নাম হল 'মেঘনাদ'। ইন্দ্রকে জয় করায়, পরে তার নাম হয়েছিল 'ইন্দ্রজিৎ'।

"কুম্ভকর্ণের ঘুমোবার জন্য এক যোজন (প্রায় আট মাইল) লম্বা বিশাল এক রত্নপ্রাসাদ তৈরি করিয়ে দিলেন রাবণ। কুম্ভকর্ণ মহাসুখে সেখানে ঘুমোতে লাগলেন।"

কুবের হারলেন রাবণের কাছে

অগস্ত্যের গল্প চলতে লাগল—

"রাবণ খুব বাড়াবাড়ি করছেন শুনে, কুবের ভাইকে সংযত থাকার পরামর্শ দিয়ে, দূত পাঠালেন রাবণের কাছে। রাবণ দূতকে মেরে ফেললেন।

"কুবেরকে যমালয়ে পাঠাতে, রাবণ ছয় সেনাপতি আর বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে ছুটলেন কৈলাসে। কুবের মার খেয়ে পালালেন। কৈলাসের সঙ্গে কুবেরের দিব্য পুষ্পক বিমানও দখল করে নিলেন রাবণ।"

রাবণকে বর দিলেন মহাদেব

অগস্ত্য বলে চললেন—

"পুষ্পকে চড়ে রাবণ লঙ্কায় ফিরছিলেন। কার্তিকেয়র জন্মস্থান শরবনে পুষ্পক অচল হয়ে গেল। শিবের অনুচর নন্দী এসে রাবণকে ধমক দিয়ে বললেন, 'এটা শিবের পাহাড়। বাঁচাতে চাও, তো পালাও এখান থেকে।

"রাবণ নন্দীর বানরমুখ দেখে হেসে ফেললেন। নন্দী শাপ দিলেন, 'এই বানরমুখ দেখে হাসছ? তবে শুনে রাখো, তোমার ধ্বংসের জন্যই অসংখ্য বানর জন্ম নেবে।'

"রাবণ অহঙ্কারে শিবকে অগ্রাহ্য করে, কৈলাস পর্বতকে উপ্‌ড়ে ফেলতে চাইলেন। কেঁপে উঠল কৈলাস। ভয়ে শঙ্করকে জড়িয়ে ধরলেন পার্বতী।

"মহাদেব পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিলেন কৈলাসের ওপর। রাবণের হাত চাপা পড়ে গেল। কৈলাসের তলায়। গর্জন করে উঠলেন রাবণ।

"অমাত্যদের পরামর্শে, শিবের স্তব করে শিবকে তুষ্ট করলেন রাবণ। তুষ্ট হয়ে মহাদেব বললেন, 'দশানন! এক হাজার বছর ধরে তোমার হাতের ওপর এই পর্বতের ভার তুমি সয়েছ। তোমার বীরত্বে আমি খুশি। পর্বতের ভার হাতে পড়ায় তুমি প্রচণ্ড 'রব' করেছিলে। তাই আজ থেকে তোমার নাম হলে 'রাবণ'।'

"রাবণের প্রার্থনায় মহাদেব রাবণকে 'চন্দ্রহাস' নামে এক মহাশক্তিশালী খড়্গ দিলেন, বললেন, 'সাবধান! এর অবজ্ঞা কোরো না। তা হলেই কিন্তু এ আমার কাছে ফিরে আসবে।'

"মহাদেবকে প্রণাম করে পুষ্পক নিয়ে লঙ্কায় ফেরার আগে, পৃথিবী পরিক্রমা করে, যত ক্ষত্রিয় বীরদের হারিয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করলেন রাবণ।"

রাবণকে শাপ দিলেন বেদবতী

অগস্ত্য বলতে থাকলেন—

"বৃহস্পতির নাতনি আর কুশধ্বজের মেয়ে বেদবতী বিষ্ণুকে পতি হিসেবে পাওয়ার জন্য বিষ্ণুর ধ্যান করছিলেন। হিমালয়ে। রাবণ তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাঁকে বিয়ে করতে চেয়ে তাঁর চুল ধরে টানতেই, বেদবতী আগুনে আত্মাহুতি দিলেন।

"আত্মাহুতি দেওয়ার আগে, বেদবতী রাবণকে অভিশাপ দিলেন, 'তোমার ধ্বংসের জন্য আমি কোনও ধর্মপরায়ণ মানুষের অযোনিসম্ভূতা কন্যা হয়ে জন্মাব।'"

অগস্ত্য রামকে বললেন, 'রাম! সীতাই সেই বেদবতী! আর তুমিই স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু!'

মরুত্তের যজ্ঞে রাবণ: দেবতাদের ভয়

চলতে লাগল অগস্ত্যের কাহিনী—

"রাজা 'মরুত্ত' দেবতাদের সঙ্গে যজ্ঞ করছিলেন 'উশীরবীজ' দেশে। রাবণ এলেন সেখানে।

"রাবণকে দেখে, দেবতারা ভয়ে পশুপাখির রূপ ধারণ করলেন। ইন্দ্র ময়ূরের, যম কাকের, বরুণ হাঁসের আর কুবের গিরগিটির রূপ ধারণ করলেন।

"পুরোহিত সংবর্তের কথা মতো যজ্ঞ ছেড়ে উঠলেন না মরুত্ত। রাবণ ভাবলেন, মরুত্ত ভয় পেয়েছেন। নিজেকে জয়ী ঘোষণা করে, উপস্থিত ঋষিদের খেয়ে, চলে গেলেন রাবণ।

"রাবণ চলে যেতে, দেবতারা আবার নিজের নিজের রূপ ধরলেন। ইন্দ্র ময়ূরকে বর দিলেন। বললেন, 'তোমার সাপের ভয় থাকবে না।

"যম কাককে বর দিয়ে বললেন, 'মানুষ না মারলে তোমার মৃত্যু নেই। তুমি খেলে ক্ষুধার্ত মানুষের তৃপ্তি হবে।'"

"বরুণ হাঁসকে বর দিলেন। বললেন, 'তোমার গায়ের রং ধবধবে সাদা হবে।'

"কুবের গিরগিটিকে বর দিয়ে বললেন, 'তোমার গায়ের রং সোনার মতো হবে।'

অযোধ্যায় রাবণ: অনরণ্য বধ

অগস্ত্য বলে চললেন—

"অন্য রাজারা রাবণের বশ্যতা স্বীকার করে নিলেও, অযোধ্যার তখনকার রাজা অনরণ্য রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। রাবণের হাতে প্রাণ দিতে দিতে তিনি বললেন, 'আমি যদি দান, হোম, তপস্যা আর প্রজাদের ঠিক মতো পালন করে থাকি, আর যদি সর্বদা সত্যকথা বলে থাকি, তবে আমার বংশে ভগবান বিষ্ণু 'রাম' হয়ে জন্মাবেন। আর সেই রামই তোমাকে বধ করবেন।' বলে, স্বর্গে চলে গেলেন অনরণ্য।"

যমলোকে রাবণ

অগস্ত্যের কাহিনী চলতেই থাকল—

"নারদ এসে রাবণকে তাতালেন। যমের বিরুদ্ধে। আবার যমকেও তাতালেন। রাবণের বিরুদ্ধে। (ঝগড়া লাগাতে নারদের জুড়ি নেই।) সফল হলেন নারদ। রাবণ চললেন যমলোকে। যমকে জয় করতে।

"যমলোকে পাপীদের মুক্ত করে দিলেন রাবণ। যমের সৈন্যদের সঙ্গে রাবণের সৈন্যদের তুমুল লড়াই লেগে গেল।

"যম রাবণকে তাঁর 'কালদণ্ড' দিয়ে মারতে গেলেন। ব্রহ্মা তক্ষুনি এসে পড়লেন সেখানে। যমকে থামিয়ে বললেন, 'আমার বরে রাবণ তোমার কাছে অবধ্য। তুমি একে মারলে আমার বর মিথ্যে হয়ে যাবে। আবার তোমার কালদণ্ড যদি আমার বরের জন্য এঁকে মারতে ব্যর্থ হয়, তবে আমার কালদণ্ড যে অমোঘ, তা মিথ্যে প্রমাণিত হবে। কাজেই, তুমি একে মেরো না।'

"যম অভিমান করে সেখান থেকে চলে গেলেন। রাবণ ঘোষণা করলেন, 'আমি যমলোক জয় করেছি।"

নিবাতকবচদের প্রাসাদে রাবণ

অগস্ত্য কাহিনীর জাল ছড়াতেই লাগলেন—

"সমুদ্রের নীচে ভোগবতী পুরীতে গিয়ে, নাগদের বশে আনলেন রাবণ। তারপর গেলেন মণিময়ী পুরীতে। নিবাতকবচ নামে দৈত্যদের হারাতে।

"দু'পক্ষে প্রবল যুদ্ধ হল। কেউই জয়ী হল না। তখন ব্রহ্মা এসে সন্ধি-প্রস্তাব দিলেন। রাবণ নিবাতকবচদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নানারকম মায়াবিদ্যা শিখলেন।

"অশ্মনগরে গিয়ে চার শো কালকেয় দৈত্যকে বধ করলেন রাবণ। এই যুদ্ধেই প্রাণ হারালেন শূর্পণখার স্বামী বিদ্যুজ্জিহ্ব।

বরুণলোকে রাবণ

অগস্ত্য বলে চললেন—

"বরুণের প্রাসাদে গিয়ে হানা দিলেন রাবণ। বরুণের ছেলেরা যুদ্ধ করতে এসে হেরে গেল। বরুণকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন রাবণ। বরুণের মন্ত্রী প্রহাস বললেন, 'বরুণ ব্রহ্মলোকে গান শুনতে গেছেন।'

(গান শুনতে ব্রহ্মলোকে গেছেন! কোনও বিচিত্রানুষ্ঠান ছিল নাকি? দারুণ ব্যাপার তো!)

"রাবণ ধরে নিলেন, তিনি বরুণকেও হারিয়েছেন।'

বলির প্রাসাদে রাবণ

অগস্ত্য বললেন—

"অশ্মনগরে বলি রাজাকে মুক্ত করতে চাইলেন রাবণ। বলি হেসে বললেন, 'বেশ তো! দরজায় যাঁকে দেখে ভয় পেয়েছিলে, সেই ভগবান বিষ্ণুকে হারাতে পারলেই আমাকে মুক্ত করতে পারবে।'

"রাবণ বললেন, 'এ আর কি কথা? আমি তো যমলোকও জয় করে এসেছি। মৃত্যু ভয় নেই আমার।' বলেই ছুটলেন দরজায়।

"বিষ্ণু তখনই রাবণকে বধ করতে পারতেন। করলেন না। কারণ, আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, যে, রাম রূপ ধরে তিনি রাবণকে বধ করবেন। কাজেই রাবণের মুখোমুখি না হয়ে, তিনি অদৃশ্য হলেন।

"বিষ্ণু তাঁর ভয়েই পালিয়েছেন, এ কথা ভেবে রাবণ মহানন্দে ফিরে গেলেন।"

সূর্যলোকে রাবণ

অগস্ত্য বলে চললেন—

"সুমেরুর মাথায় রাত কাটিয়ে, রাবণ এলেন সূর্যলোকে। সূর্যকে আহ্বান করলেন যুদ্ধে। সূর্য তাঁর দ্বারপাল দণ্ডীকে বললেন, 'হয় তুমি নিজে লড়াই করো। নয় রাবণকে বলো যে, আমরা পরাজয় মেনে নিচ্ছি। যা ভাল বোঝো, তাই করো।'

"দণ্ডীর কাছে সূর্যের কথা শুনে রাবণ নিজেকে জয়ী ঘোষণা করে চলে গেলেন।"

মান্ধাতার সঙ্গে সন্ধি

অগস্ত্য বললেন—

"চন্দ্রলোক বিজয়ে যাওয়ার পথে যুবনাশ্বের ছেলে মান্ধাতার সঙ্গে তুমুল লড়াই হল রাবণের। শেষে পুলস্ত্য আর গালবের মধ্যস্থতায় সন্ধি হল দু'জনের মধ্যে।"

চন্দ্রলোকে রাবণ

রাবণের আরও কাহিনী রামকে শোনালেন অগস্ত্য। বললেন—

"রাবণ এলেন চন্দ্রলোক জয় করতে। রাবণ চন্দ্রকে ঠাণ্ডা আগুনে পোড়াতে লাগলেন। [চাঁদের আলো ঠাণ্ডা বলে? আইডিয়াটা দারুণ তো? (চন্দ্র রাবণকে 'নারাচ' (লোহার তীর) দিয়ে মারতে লাগলেন।]

"শেষে ব্রহ্মা এসে সর্বলোকের মঙ্গলকামী চন্দ্রকে মারতে নিষেধ করলেন রাবণকে। রাবণকে তিনি মহাদেবের একশো আট নাম শিখিয়ে দিয়ে বললেন, 'প্রাণসংশয় দেখা দিলে এই নাম জপ কোরো।'"

কপিলের আশ্রমে রাবণ

রামকে কপিলের কথা শোনালেন অগস্ত্য। বললেন—

"কপিলের সুড়ঙ্গের আশ্রমে ঢুকে রাবণ একেবারেই অসহায়ভাবে পরাজিত হলেন। চূড়ান্ত হেনস্তা হল রাবণের। শেষে হাত জোড় করে কপিলকে রাবণ বললেন, 'হে ভগবান! ব্রহ্মার বরে আমি দেবাসুরের অবধ্য। যদি মরতেই হয়, তো আমি তোমার হাতেই মরতে চাই। সে মৃত্যু আমার পক্ষে অনেক যশের এবং বাঞ্ছিত হবে।'

কপিল ইচ্ছে করলেই রাবণকে ভস্ম করে দিতে পারতেন। তা করলেন না। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেই জ্ঞান হারালেন রাবণ। পরে, জ্ঞান আসতেই, ফিরে গেলেন তাঁর সচিবদের কাছে।

শূর্পণখাকে শান্ত করলেন রাবণ

রামকে শূর্পণখা-রাবণ সংবাদ শোনালেন অগস্ত্য। বললেন—

"কপিলের আশ্রম থেকে ফেরার পথে যত সুন্দরী নারী দেখলেন, সবাইকেই নিজের বিমানে তুলে নিলেন রাবণ। তাঁরা অভিশাপ দিলেন, 'পরস্ত্রী ধর্ষণের পাপের শাস্তি পরস্ত্রীই তোমাকে দেবে।'

"পথে শূর্পণখা ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'তুমি আমার স্বামী বিদ্যুজ্জিহ্বকে মেরেছ। লজ্জা হচ্ছে না তোমার?'

" রাবণ বললেন, 'আমি যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্যুজ্জিহ্বকে চিনতে না পারায় এই মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে আমাদের। তুমি দণ্ডকারণ্যে গিয়ে স্বাধীনভাবে থাকো। সেখানে খর আর দূষণ চোদ্দো হাজার রাক্ষস সঙ্গে নিয়ে তোমার আদেশ পালন করবে।'"

ইন্দ্রজিতের সপ্তযজ্ঞ

অগস্ত্য বললেন—

"রাবণ নিকুম্ভিলায় এসে দেখলেন, ইন্দ্রজিৎ সপ্তযজ্ঞ করে শিবের বর আর অনেক অস্ত্র পেয়েছেন। শত্রু ইন্দ্রের যজ্ঞ করাটাকে রাবণ মোটেই ভাল চোখে দেখলেন না।"

মধুর কুম্ভীনসী হরণ

"বিভীষণ রাবণকে বললেন, 'আপনার পরস্ত্রীদের হরণ আর ধর্ষণের পাপে, আজ আমাদের দূর সম্পর্কের বোন কুম্ভীনসীকে হরণ করেছে মধু দৈত্য। বাড়িতে আপনি ছিলেন না। কুম্ভকর্ণ ঘুমোচ্ছিলেন। ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ করছিলেন। কুম্ভীনসীর একটা গতি হল। আর লোকেও আপনার কুকীর্তির ফল হাতে হাতে দেখতে পেল। এই ভেবে আমি বাধা দিইনি।'

"রাবণ ছুটলেন মধুকে মারতে। বোন কুম্ভীনসী রাবণের পা জড়িয়ে ধরলেন। মধুও রাবণকে খুব খাতির করল। খুশি হয়ে, মধুকে নিয়ে দেবলোক জয় করতে চললেন রাবণ।"

রাবণের হাতে ধর্ষিতা হলেন রম্ভা

রামকে রাবণ-রম্ভা কাহিনী শোনালেন অগস্ত্য। বললেন—

"রাত্রিবেলা সৈন্যরা ঘুমিয়ে পড়লে কৈলাসের শোভা দেখছিলেন রাবণ। ঠিক তখনই, ইন্দ্রসভার অপ্সরা রম্ভা যাচ্ছিলেন। দেবতাদের উৎসবে যোগ দিতে। রাবণ রম্ভার পাণিপ্রার্থী হলেন।

"রম্ভা লজ্জায় জিব কেটে বললেন, 'ছিঃ! আপনার দাদা কুবেরের ছেলে নলকুবের যে আমার প্রতি আসক্ত! আমি যে আপনার পুত্রবধূর তুল্য! আপনি যে আমার শ্বশুর!'

"রাবণ বললেন, 'অপ্সরাদের আবার পতি-ফতি কী? আর দেবতারাও এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকেন না। আর আমি তো রাক্ষস। তুমি কি সতী-সাধ্বী স্ত্রী? যে, তোমাকে ছেড়ে দেব?' বলে রাবণ রম্ভাকে ধর্ষণ করলেন।"

নলকুবের অভিশাপ দিলেন রাবণকে

অগস্ত্য বলে চললেন—

"রম্ভার কাছ থেকে সব শুনে, নলকুবের রাবণের উদ্দেশে অভিশাপ দিলেন, 'রাবণ যদি এরপর আর কোনও স্ত্রীলোকের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার ওপর বলপ্রয়োগ করে, তবে রাবণের মাথা তৎক্ষণাৎ সাত টুকরো হয়ে যাবে।'

"এ অভিশাপের কথা রাবণের কানেও গেছে। অতঃপর এ ব্যাপারে সাবধান হয়েছেন তিনি। এইজন্যই, কাছে পেয়েও, সীতার ওপরে বলপ্রয়োগ করতে পারেননি রাবণ।"

রাবণের ইন্দ্রলোক জয়

রামকে রাবণের ইন্দ্রলোক জয়ের কথা শোনালেন অগস্ত্য। বললেন—

"বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে রাবণ ইন্দ্রলোক আক্রমণ করলেন। ইন্দ্র বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু বললেন, 'যথাসময়েই আমি রাবণকে বধ করব। এখন তোমরা, দেবতারা, রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।'

"ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যুদ্ধে ইন্দ্রের ছেলে জয়ন্ত হেরে গিয়ে, তার দাদামশাই পুলোমার সঙ্গে সাগরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে মায়াযুদ্ধে হারিয়ে বেঁধে এনে দিলেন রাবণের সামনে। রাবণ ইন্দ্রকে লঙ্কায় নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন।'

"ইন্দ্রকে, ছাড়াতে গিয়ে, ব্রহ্মাকে বর দিতে হল ইন্দ্রজিৎকে। এই বর, যে, অগ্নির পুজো করলে মেঘনাদ অগ্নির কাছে এক দিব্য রথ পাবেন। সেই রথে চড়ে যুদ্ধ করলে তিনি সবার অবধ্য হবেন। তবে পুজো অসমাপ্ত রেখে যুদ্ধে গেলে আর তিনি অবধ্য থাকবেন না।"

অহল্যা

অগস্ত্য বললেন—

"ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বললেন, 'গৌতমের শাপেই তোমার এই অবস্থা। আমি অসামান্যা সুন্দরী অহল্যাকে যখন সৃষ্টি করলাম, তুমি তখন তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে। কিন্তু, আমি অহল্যাকে তুলে দিলাম জিতেন্দ্রিয় তপস্বী গৌতমের হাতে। 'হল', অর্থাৎ খুঁত, ছিল না বলেই, সেই রূপবতীর নাম দিয়েছিলাম 'অহল্যা'।

"কিন্তু, তুমি একদিন অন্যায়ভাবে গৌতমের ছদ্মবেশে অহল্যাকে ধর্ষণ করলে। গৌতম সব জেনে তোমাকে শাপ দিয়েছিলেন, "শোনো শতক্রতু! তোমার শত্রুর হাতে তুমি বন্দি হবে। মানুষের মধ্যে কেউ তোমার মতো পাপ করলে, সে পাপের অর্ধেক বর্তাবে তোমার ওপর। তোমার ইন্দ্রত্ব তো চিরস্থায়ী হবেই না। তোমার পরেও, যারা ইন্দ্রের আসনে বসবে, তাদেরও, ইন্দ্রত্ব চিরস্থায়ী হবে না।

(দেবতাদের রাজাকে 'দেবরাজ' বা 'ইন্দ্র' বলা হত। ইন্দ্র কোনও ব্যক্তির নাম নয়। একটা পদের নাম। দেবতাদের রাজার পদ।)

"গৌতম অহল্যাকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, 'তোমার রূপ নষ্ট হয়ে যাবে। আর তোমার মতো আরও অসংখ্য রূপসী জন্ম নেবে।'

"'অহল্যা বললেন, 'কিন্তু, আমার কী অপরাধ? ইন্দ্র তো আপনার রূপ ধরে এসে আমাকে বিভ্রান্ত করেছেন। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন!'

(মিথ্যে বলছেন অহল্যা। তিনি ইন্দ্রকে চিনতে পেরেছিলেন। চিনেও, প্রতিবাদ করেননি। বাধা দেননি।)

"'গৌতম বললেন, 'ভগবান বিষ্ণু রাম রূপে এই আশ্রমে আসবেন। তখন তাঁর সেবা কোরো। তা হলেই তুমি মুক্ত হবে।'

"ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বললেন,

'ইন্দ্র! তুমি বৈষ্ণবযজ্ঞ করে পবিত্র হয়ে স্বর্গে যাও। তোমার ছেলে জয়ন্ত তার

দাদামশাইয়ের কাছে আছে। তুমি যে তাকে মৃত ভেবেছিলে, তা ঠিক নয়।'"

এই পর্যন্ত বলে থামলেন অগস্ত্য। রামের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তিনি।

(ছোট্ট প্রশ্ন। দীর্ঘ উত্তর।)

ইন্দ্র বৈষ্ণবযজ্ঞ করে স্বর্গে গেলেন।

অগস্ত্যের মুখে ইন্দ্রজিতের বীরত্বের কথা শুনে রাম-লক্ষ্মণ বুঝতে পারলেন, কেন বিশেষ করে ইন্দ্রজিৎ বধের জন্যই অগস্ত্য এবং অন্য মুনিরা অভিনন্দন জানাতে এসেছেন রামকে। দেবরাজ ইন্দ্রকে পর্যন্ত যিনি মায়াযুদ্ধে হারিয়ে বন্দি করতে পারেন, তিনি তো কোনও মতেই সাধারণ বীর নন। তিনি অবশ্যই অসাধারণ।

বিভীষণও বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন অগস্ত্য। এখন আমার সব মনে পড়ছে বটে।'

সহস্রবাহু কার্তবীর্যার্জুন।

'রাবণকে ঠেকাবার মতো কোনও বীর কি সারা পৃথিবীতে ছিলেন না?'

রাম জানতে চাইলেন অগস্ত্যের কাছে।

অগস্ত্য তখন হৈহয় দেশের রাজা কার্তবীর্যার্জুনের কথা শোনালেন রামকে। বললেন, "দত্তাত্রেয় মুনির বরে কার্তবীর্যাজুনের এক হাজার হাত ছিল।

"রাবণ যখন নর্মদার তীরে বসে সোনার শিবকে পুজো করে আনন্দে নাচতে শুরু করেছেন, কার্তবীর্যার্জুন তখন তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে নর্মদায় জল-কেলি করছিলেন। খেলার ছলেই, কার্তবীর্যার্জুন তাঁর এক হাজার হাত দিয়ে নর্মদার জল আটকে দিলেন।"

"রাবণের সঙ্গে তাঁর লেগে গেল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। কার্তবীর্যার্জুন রাবণকে হাজার হাতে জাপটে ধরে বাড়িতে নিয়ে এলেন।

"খবর পেয়ে ছুটে এলেন রাবণের বাবা পুলস্ত্য। তাঁর কথায় রাবণকে ছেড়ে দিয়ে, তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালেন কার্তবীর্যার্জুন।"

বালীর কাছে হার মানলেন রাবণ

বালী-রাবণের কাহিনীও রামকে শোনালেন অগস্ত্য। বললেন—

"বালীকে জয় করতে রাবণ গেলেন কিষ্কিন্ধ্যায়। সেখানে শুনলেন, বালী চার সমুদ্রে সন্ধ্যাহ্নিক করতে গেছেন। রাবণের তর সইল না। বালীর সন্ধানে গেলেন দক্ষিণ সমুদ্রে। বালী রাবণকে বগলে পুরে ওই অবস্থায়, চার সমুদ্রে সন্ধ্যা-পূজা সারলেন। তারপর কিষ্কিন্ধ্যায় এসে রাবণকে বগল থেকে বার করলেন।

"বালীর বীরত্বে মুগ্ধ রাবণ বালীর সঙ্গে সখ্য পাতালেন।"

(বালীর বীরত্বের এ-কাহিনী আগে জানা থাকলে, রাম বালীকে বধ না করে হয়তো বন্ধু হিসেবেই পেতে চাইতেন। কিন্তু, নাটকের পাণ্ডুলিপি লেখা হয়েছে

অন্যভাবে। অবতারও সে পাণ্ডুলিপির ওপর কলম চালাতে চাননি। কোনও অবতারই চান না।)

হনুমান-কাহিনী

রাম অগস্ত্যকে বললেন, 'আমার ধারণা, বল, বীর্য, আর নীতিজ্ঞানের বিচারে, বালী বা রাবণ—কেউই হনুমানের ধারে কাছেও আসতে পারেন না। তা হলে বালী-সুগ্রীবের লড়াইতে হনুমান কেন বালীকে বধ করলেন না?'

অগস্ত্য বললেন, "তার কারণ ঋষিদের শাপ ছিল। হনুমানের বাবা কেশরী। আর মা অঞ্জনা। কিন্তু কেশরীর ঔরসে হনুমানের জন্ম হয়নি। হয়েছে পবন বা বায়ুর ঔরসে।

"হনুমানের জন্মের ঠিক পরেই, অঞ্জনা বনে গিয়েছিলেন। ফল আনতে। শিশু হনুমান খিদেয় কাঁদতে লাগলেন। পুবের আকাশে তখন সূর্যদেব উঠছিলেন। লাল সূর্যকে দেখে, হনুমান ফল ভেবে ধরবার জন্য লাফ দিয়ে আকাশে উঠলেন।

"বায়ু বিপদ বুঝে ছেলেকে বাঁচাবার জন্য ঠাণ্ডা হয়ে বইতে লাগলেন। রাহুও তখন গেছেন সূর্যকে খেতে। হনুমান সূর্যকে ছেড়ে রাহুকে তাড়া করলেন।

"রাহু ইন্দ্রকে গিয়ে বললেন, 'আপনি চন্দ্র-সূর্যকে খাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন শুধু আমাকে। কিন্তু অন্য একজন সূর্যকে খেতে চাইছে কেন?'

"ইন্দ্র রাহুকে নিয়ে এলেন ব্যাপার দেখতে। হনুমান প্রথমে রাহুকে এবং পরে ইন্দ্রের ঐরাবতকে আক্রমণ করতেই, ইন্দ্র তাঁর বজ্র ছুড়ে মারলেন শিশু হনুমানকে। হনুমানের বাঁ দিকের 'হনু' ভেঙে গেল। তাই তাঁর নাম হল 'হনুমান'।

"হনুমান অজ্ঞান হয়ে সুমেরু পর্বতে পড়লেন। বায়ু তাঁকে নিয়ে গুহায় ঢুকে গেলেন। বায়ুর অভাবে ত্রিলোকের প্রাণ যায় যায়!

"ব্রহ্মা দেবাসুর-গন্ধর্ব-মানুষ ইত্যাদির সঙ্গে গেলেন বায়ুর কাছে। ব্রহ্মার হাতের ছোঁয়ায় হনুমানের জ্ঞান ফিরে এল। বায়ু আবার সর্বত্র সঞ্চালিত হলেন।

"ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সূর্য, যম, বরুণ, কুবের ইত্যাদি দেবতা আর যক্ষরা হনুমানকে অনেক বর দিলেন।"

"বর পেয়ে, হনুমান ঋষিদের আশ্রমে খুব উৎপাত লাগিয়ে দিলেন। তখন ঋষিরা হনুমানকে শাপ দিলেন, 'তোমার নিজের শক্তির কথা তুমি অনেকদিন ভুলে থাকবে। তবে কেউ তোমাকে মনে করিয়ে দিলে, তুমি আবার সে শক্তি ফিরে পাবে।'

"বালী-সুগ্রীবের লড়াইয়ের সময় হনুমান নিজের শক্তির কথা ভুলে ছিলেন।"

বালী সুগ্রীবের মা-বাবা—দুই-ই ঋক্ষরজা

রাম অগস্ত্যকে প্রশ্ন করলেন, 'মুনিবর! বালী আর সুগ্রীবের বাবা তো ঋক্ষরজা। কিন্তু ওদের মা কে? আর ওদের এ রকম নামই বা হল কেন?'

অগস্ত্য বললেন, "বেশ, শোনো তা হলে। আমাকে অবশ্য বলেছিলেন দেবর্ষি নারদ।

"ব্রহ্মা যখন সুমেরু পর্বতে বসে ধ্যান করছিলেন, তখন তাঁর চোখ থেকে এক ফোঁটা জল পড়ে। তা থেকে জন্ম হয় ঋক্ষরজা নামে এক বানরের।

"একবার সুমেরুরই এক সরোবরের জলে নিজের প্রতিবিম্বকে কোনও শত্রু-বানর ভেবে, তাকে শিক্ষা দিতে সরোবরে ঝাঁপ দিলেন ঋক্ষরজা। স্নান করে যখন তিনি উঠলেন, তখন আর তাঁর না রইল বানর-রূপ, না রইল পুরুষ-রূপ। তখন তিনি এক পরমা সুন্দরী নারী।

"সুন্দরী ঋক্ষরজাকে দেখে, ইন্দ্র আর সূর্য দু'জনেরই বীর্যক্ষরণ হল। ইন্দ্রের বীর্য এসে পড়ল ঋক্ষরজার চুলে (বালে)। সেই বীর্যজাত সন্তানের নাম হল তাই 'বালী'।

"সূর্যের বীর্য পড়েছিল ঋক্ষরজার ঘাড়ে (গ্রীবাতে)। তাই সূর্যের বীর্যজাত সন্তানের নাম হল সুগ্রীব।

"পরদিনই ঋক্ষরজা আবার ফিরে পেলেন তাঁর সেই পুরুষ এবং বানর-রূপ। দুই সদ্যোজাত ছেলেকে নিয়ে এলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মার নির্দেশে কিষ্কিন্ধ্যায় বিশ্বকর্মার তৈরি এক রাজকীয় প্রাসাদে ঋক্ষরজা আর বালী-সুগ্রীবকে পৌঁছে দিলেন এক দেবদূত। ঋক্ষরজা হলেন কিষ্কিন্ধ্যার রাজা।

"কাজেই, ঋক্ষরজা, বালী আর সুগ্রীবের মাও বটে, আবার বাবাও বটে। একাধারে দুই-ই।"

বিষ্ণুর হাতে মরতে চাইলেন রাবণ

অগস্ত্য রামকে বললেন, "ব্রহ্মার ছেলে সনৎকুমারের মুখে রাবণ একদিন শুনলেন, যে, সর্বলোকের কর্তা হরির হাতে প্রাণ দিলে স্বর্গলাভ অনিবার্য। রাবণ তখন সনৎকুমারের কাছে যুদ্ধক্ষেত্রে হরির মুখোমুখি হওয়ার উপায় জানতে চাইলেন।

"সনৎকুমার বললেন, 'রাবণ! স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু ত্রেতা যুগে রাম রূপে জন্মগ্রহণ করে তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন।'"

অগস্ত্য বললেন, "রাম! তোমার হাতে মরতে চেয়ে তোমাকে যুদ্ধে মুখোমুখি পাওয়ার জন্যই রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল।"

(শত্রুভাবে ভজনা! এখন দেখা যাচ্ছে, রাবণের এই সদিচ্ছা থেকেই 'রামায়ণ'-এর জন্ম। ভৃগুর শাপও কি এ নাটকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই? মনে তো হয়, তা-ই।)

শ্বেতদ্বীপে রাবণের হেনস্থা

অগস্ত্য বলে চললেন—

"নারদ একদিন ব্রহ্মলোক থেকে আসছেন। রাবণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা মুনিবর! আপনি তো সব লোকই ঘুরেছেন। খুব শক্তিশালী কারও সঙ্গে যুদ্ধ করলে আমার যুদ্ধ-তৃষ্ণা খানিকটা মিটবে। কোন লোকে তেমন শক্তিশালী অধিবাসী আছে বলতে পারেন?"

"নারদ বললেন, 'শ্বেতদ্বীপে যাও। সেখানে গেলে তুমি যুদ্ধ করে সুখ পাবে।'

"শ্বেতদ্বীপের ওপরে রাবণের পুষ্পক আসতেই, ঝোড়ো হাওয়ায় পুষ্পক এমন

কাঁপতে লাগল, যে, রাবণের সেনাপতিরা ভয়েই পালালেন।

"অগত্যা। রাবণ একাই নামলেন শ্বেতদ্বীপে। সেখানে বিশাল চেহারার সুন্দরী যুবতীরা রাবণকে ছোট্ট একটা পুতুলের মতো করে হাতে নিয়ে খেলতে লাগলেন। পুঁচকে রাবণ যুদ্ধ করতে এসেছে শুনে তাঁদের কী হাসি। এক সুন্দরী রাবণকে নিয়ে আকাশে উঠলেন। রাবণ তাঁর হাতে আঁচড়ে দিলেন। সুন্দরীর হাত থেকে পড়ে গেলেন অথৈ সমুদ্রে। রাবণের হেনস্তা দেখে, নাটের গুরু নারদ তা-থই-তা-থই করে নাচতে লাগলেন।"

সুদীর্ঘ কাহিনী রামকে শুনিয়ে অগস্ত্য বললেন, "রাম! তুমি স্বয়ং বিষ্ণু! রাবণবধের জন্য রাম-রূপ ধারণ করেছ। সীতাই স্বয়ং লক্ষ্মী!"

এই বলে অগস্ত্য তাঁর কথা শেষ করলেন।

মূল রামায়ণের পাঠকমাত্রই জানেন, অগস্ত্য তাঁর গল্প বলেছেন অনেক বেশি বিস্তারিতভাবে। আমরাও এখানে গল্পই শোনাতে বসেছি। তবে সংক্ষেপে। মেদ ছেঁটে। তাই অগস্ত্যের গল্পের শরীরেও আমাদেরকে কাঁচি চালাতেই হয়েছে।

বিদায় নিলেন রাজারা

রাম সুখে এবং শান্তিতে রাজত্ব করছেন। প্রজারাও মহানন্দে আছেন। রাজারা, যাঁরা রামের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন, সকলেই একে একে বিদায় নিলেন। সীতার বাবা জনক, ভরতের মামা যুধাজিৎ, কাশীরাজ প্রতর্দন, কিষ্কিন্ধ্যারাজ সুগ্রীব, লঙ্কারাজ বিভীষণ ইত্যাদি সকলেই একে একে বিদায় নিলেন।

রাম সকলকেই অনেক দামি উপহার দিলেন। জনক, যুধাজিৎসহ অনেকেই সে উপহার আদর করেই ফিরিয়ে দিলেন। সব রাজাই রামকেও অনেক উপহার দিয়ে গেলেন।

বিদায় নেওয়ার সময় রাম নিজের গলা থেকে খুলে তাঁর একান্ত ভক্ত হনুমানের গলায় পরিয়ে দিলেন মহামূল্যবান বৈদূর্যমণি লাগানো এক চন্দ্রহার।

হনুমান বর চাইলেন। বললেন, 'হে রাম! আপনার চরণে যেন আমার অবিচলিত ভক্তি থাকে। আর যত দিন পৃথিবীতে রামকথা প্রচলিত থাকবে, তত দিন যেন আমি বাঁচি। অপ্সরারা রোজ যেন রামায়ণ গান শুনিয়ে আমার সব উৎকণ্ঠা দূর করে দেয়।'

রাম বললেন, 'বেশ! তাই হবে হনুমান! তথাস্তু।'

ফিরে এল পুষ্পক

একদিন। রামের ফেরত পাঠানো পুষ্পক বিমান হঠাৎই রামের কাছে আবার ফিরে এল। রামকে বলল, 'প্রভু! আমি পুষ্পক! আপনার কথা মতো কুবেরের কাছেই আমি ফিরে গিয়েছিলাম। কিন্তু, তিনি আমাকে আবার আপনার সেবার জন্যই পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

রাম বললেন, 'ঠিক আছে পুষ্পক। কুবের যখন পাঠিয়েছেন, আর আমি না বলতে

পারি না। এখন তুমি যাও। যখন তোমায় ডাকব, তখন এসো।'

(কথা বলা পুষ্পক! পাইলটের সঙ্গে কথা কি?)

সীতা গর্ভবতী হলেন

রাম সীতাকে নিয়ে প্রমোদকাননে ক'দিন খুব আনন্দে কাটালেন। একদিন বুঝতে পারলেন, সীতার গর্ভলক্ষণ দেখা দিয়েছে। বললেন, 'সীতা! তোমার মনে কোনও সাধ আছে? লক্ষ্মীটি! আমায় খুলে বলো।'

সীতা বললেন, 'প্রভু! আমি সব ঋষিদের তপোবন একবারটি দেখতে চাই। আর অন্তত একটা রাত সেই তপোবনে বাস করতে চাই।'

রাম বললেন, 'এই কথা? ওর জন্য তুমি উতলা হোয়ো না। কালই আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।'

অযোধ্যায় কানাঘুষো

বিজয়, মধুমত্ত, ভদ্র, দন্তবক্র, সুমাগধ ইত্যাদি রামের বন্ধুরা সেদিনই রামকে বললেন, "সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় খুব কানাঘুষো চলছে। লোকে বলছে, 'সীতা এতকাল রাবণের প্রাসাদে বন্দিনী ছিলেন। রাম কী করে আবার তাঁকে ফিরিয়ে নিলেন? তা হলে আমাদের ঘরের বউদেরও যদি কেউ জোর করে তুলে নিয়ে নিজের কাছে কিছু দিন রেখে দেয়, তাদেরকেও আমাদের আবার ফিরিয়ে নিয়ে ঘরে তুলতে হবে! প্রজার আদর্শ তো রাজাই!'"

সীতা বিসর্জনের সিদ্ধান্ত

রাম ভরত, লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্নকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, অযোধ্যায় সীতার বিরুদ্ধে ওঠা জনরবের কথা। বললেন, 'শোনো তোমরা! আমি সীতাকে বিসর্জন দিতে চাই। আমি জানি, সীতা অপাপবিদ্ধা। কিন্তু আমার এবং সীতার কুলের একটা মর্যাদা আছে। আর তা ছাড়া, অপবাদকে আমি খুবই ভয় পাই। অপবাদের জন্য দরকার হলে আমি তোমাদেরও সবাইকে ত্যাগ করতে পারি। প্রাণও দিতে পারি।'

তারপর লক্ষ্মণকে রাম বললেন, 'লক্ষ্মণ! তুমি কালই সুমন্ত্রের রথে করে সীতাকে বিসর্জন দিয়ে আসবে। গঙ্গার ও পারে তমসা নদীর তীরে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম। সেখানেই, কোনও নির্জন জায়গায় সীতাকে ছেড়ে দিয়ে এসো।

'মনে রেখো, এটা আমার অনুরোধ নয় আদেশ। আর এ আদেশের যে বিরোধিতা করবে, সে আমার শত্রু। তা ছাড়া, সীতাও, কালই, এ রকম কোনও জায়গায় যেতে চেয়েছিল। তুমি অন্তত সীতার সে ইচ্ছেটাকে পূর্ণ করো।'

(হায় রে! প্রজা-বাৎসল্য বনাম প্রেমের লড়াইয়ে প্রেমই হেরে গেল! সত্যিই কি হারল? না কি 'অমর-প্রেম' হয়ে রইল?)

সীতা বিসর্জন

কালরাত্রি ভোর হল।

লক্ষ্মণের নির্দেশে রথ সাজালেন সুমন্ত্র। সীতা খুব সুন্দর করে সেজেগুজে এসে বসলেন রথে। সত্যিই যেন সোনার প্রতিমা!

সীতা তো আর জানেন না, যে, তাঁর কী সর্বনাশ হতে চলেছে! রাম তাঁর বিসর্জনের সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। বরং সীতা ভাবছেন, 'স্বামী আমার কী দয়াময়! মাত্র কালই ওঁর কাছে মুনি ঋষিদের আশ্রম দেখতে চেয়েছিলাম। আর আজই কিনা উনি আমার আশ্রম-দর্শনের সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন! আমাকে কতই না ভালবাসেন তিনি!'

সীতা সঙ্গে করে অনেক কাপড় আর অলঙ্কার এনেছেন। 'মুনি-পত্নীদের প্রণাম করে প্রণামী দিতে হবে না? তাই।'

রথ ছুটতে শুরু করতেই, সীতা বললেন, 'লক্ষ্মণ! আমি কেমন যেন সব অশুভ লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। আমার চোখের পাতা কাঁপছে। সারা শরীর কাঁপছে। সারা পৃথিবীটাকে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে। সবার খবর ভাল তো?' বলে সীতা হাত জোড় করে ভগবানের চরণে সবার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানালেন। লক্ষ্মণ কৃত্রিম শুকনো হাসি হেসে সীতার অমঙ্গল আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

গোমতীর তীরে এক রাত কাটিয়ে, ভাগীরথীর তীরে আসতেই, কান্নায় ভেঙে পড়লেন লক্ষ্মণ।

সীতা বললেন, 'দু'দিন দাদাকে না দেখেই এই অবস্থা? আমারও অবশ্য রঘুনাথের জন্য মনটা কেমন কেমন করছে। তপস্বীদের আশ্রমে মাত্র একটাই তো রাত কাটাব। তারপর আবার আমরা ফিরে যাব অযোধ্যায়। আর কেঁদো না লক্ষ্মণ।'

লক্ষ্মণ শুধু শুষ্ক হাসি ছড়িয়ে দিলেন ঠোঁটের কোণে। কিছু বললেন না। বলতে পারলেন না।

নিষাদরা সুন্দর করে সাজানো বিশাল এক নৌকা নিয়ে এল। তাতে সীতাকে নিয়ে উঠলেন লক্ষ্মণ।

সুমন্ত্র রথ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন ভাগীরথীর এ পারে।

নদী পার হয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন লক্ষ্মণ। সীতা অবাক হয়ে লক্ষ্মণের কান্নার কারণ জানতে চাইলেন।

লক্ষ্মণ খুলে বললেন সব। সীতা জ্ঞান হারালেন।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে সীতা বললেন, 'লক্ষ্মণ! অপবাদের ভয়ে ভীত তোমার দাদাকে বোলো, আমি অপাপবিদ্ধা! জানি না, পূর্বজন্মে কোনও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ এনে দিয়েছিলাম কি না!

'মুনিরা যখন জানতে চাইবেন, রাম কেন আমায় পরিত্যাগ করেছেন? আমি তাঁদের কী বলব? পেটে যদি রামের সন্তান না থাকত, তা হলে আজই, এই জাহ্নবীর জলেই, আমি প্রাণ বিসর্জন দিতাম।

'যাক লক্ষ্মণ! তুমি ফিরে যাও। আমার যা হওয়ার হবে। রঘুনাথকে বোলো, তাঁর সীতা তাঁরই ছিল। তাঁরই আছে। এবং তাঁরই থাকবে।

'আমার শরীর থাক, বা যাক, সে নিয়ে তিনি যেন চিন্তা না করেন। সীতাকে গ্রহণ করায়, তাঁর যে অপবাদ হয়েছিল, সীতাকে বিসর্জন দিয়ে আশা করি, সে অপবাদ তিনি ঝেড়ে ফেলতে পেরেছেন।

'লক্ষ্মণ! আমার যে গর্ভলক্ষ্মণ দেখা দিয়েছে, তা তুমি নিজের চোখে দেখে যাও। নইলে, হয়তো আমার গর্ভের সন্তানের পিতৃত্ব নিয়েও তাঁর মধ্যে সংশয় দেখা দিতে পারে।'

লক্ষ্মণ হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'ছিঃ! দেবী! আমি যে কোনওদিন আপনার মুখ পর্যন্ত দেখিনি। শুধু আপনার শ্রীচরণ দুটি ছাড়া আর কিছুই যে আমি কোনওদিনও দেখিনি। আর তা ছাড়া, দাদার অনুপস্থিতিতে আপনার দিকে আমি তাকাব কী করে?'

লক্ষ্মণ আর সীতার সামনে দাঁড়াতে পারছিলেন না। এক দৌড়ে নৌকার কাছে এসে দেখলেন, সীতা নদীর তীরে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছেন। লক্ষ্মণের চোখ আবার ঝাপসা হয়ে গেল। নৌকার দাঁড়ের ছলাত্ ছলাত্ শব্দের তলায় সীতার বুকফাটা আর্তনাদ এক সময় চাপা পড়ে গেল।

বাল্মীকি আশ্রয় দিলেন সীতাকে

সীতাকে কাঁদতে দেখে, ঋষিকুমাররা ছুটে গিয়ে বাল্মীকিকে ধরে আনল।

বাল্মীকি খুব মিষ্টি করে সীতাকে বললেন, 'মা সীতা! তপোবলে আমি সবই জানতে পেরেছি মা। তুমি আমার আশ্রমেই তাপসীদের সঙ্গে থাকো। তাঁরা তোমাকে মেয়ের মতোই স্নেহ করবেন।'

সীতা যেন অথৈ সমুদ্রে আঁকড়ে ধরবার মতো দৃঢ় এক অবলম্বন পেলেন। মহর্ষিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম করে বললেন, 'তাই হবে মহর্ষি!'

দুর্বাসার ভবিষ্যদ্বাণী

লক্ষ্মণ কাঁদতে কাঁদতে রথে ফিরে এলেন। সুমন্ত্র লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "দশরথ একবার দুর্বাসার কাছে তাঁর বংশের ভবিষ্যৎ জানতে চেয়েছিলেন। দুর্বাসা তখন বলেছিলেন, 'রামের কপালে অনেক দুঃখ আছে। রাম সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সকলকেই একে একে ত্যাগ করবেন।'

"দুর্বাসা দশরথকে এও বলেছিলেন, যে, ভৃগুর শাপেই ভগবানকে রাম রূপে জন্মাতে হবে। দেবতাদের ভয়ে দৈত্যরা ভৃগুর স্ত্রীর কাছে আশ্রয় নিলে, বিষ্ণু ভৃগুর স্ত্রীর মাথা কেটে ফেলেন। ভৃগু তখন বিষ্ণুকে শাপ দেন, 'রাগে বুদ্ধিহারা হয়ে তুমি এই অন্যায় কাজ করেছ! এর জন্য তোমাকে মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে। আর তখন তোমাকে বহু বছর ধরে স্ত্রীর বিরহযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে!'

(বেচারা! বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীকে হারিয়েছিলেন তো! তাই এই অভিশাপ!)

"দুর্বাসা বলেছিলেন, 'রাম এগারো হাজার বছর রাজত্ব করবেন। সীতার গর্ভে রামের দুই ছেলে হবে।'"

সুমন্ত্র বললেন, 'লক্ষ্মণ! এও জেনে রাখো, সীতার দুই ছেলেকেই রাম রাজা করবেন। তবে অযোধ্যার নয়।'

ফিরে এলেন লক্ষ্মণ

কেশিনী নদীর তীরে এক রাত কাটিয়ে, অযোধ্যায় ফিরলেন লক্ষ্মণ। রামকে বললেন, 'আপনার আদেশ পালন করে এলাম। দয়া করে শোক প্রকাশ করবেন না। কারণ, তা হলে আবার আপনার অপবাদ হবে।'

অনুতপ্ত রাম চারদিন কাজকর্ম দেখাশোনা করতে পারেননি। লক্ষ্মণকে বললেন, এই দুঃসময়ে তোমার মতো ভাইকে পাশে পাচ্ছি, এ আমার অশেষ ভাগ্য!'

রাম তখন লক্ষ্মণকে রাজকার্য ঠিকমতো পালন না করায় কোন রাজার কী দুর্গতি হয়েছিল, সে বিষয়ে অনেক কাহিনী শোনালেন। শোনালেন নৃগ, নিমি, উর্বশী, পুরুরবা, বশিষ্ঠ আর যযাতির কাহিনী। বললেন, 'লক্ষ্মণ! আমি সব দর্শনপ্রার্থীর সঙ্গেই কথা বলব। আমায় যেন অভিশাপ না বইতে হয়।'

(অপবাদ আর অভিশাপ—এই দুটোকেই রাম খুব ভয় পেতেন।)

বিচারপ্রার্থী কুকুর

লক্ষ্মণ এসে জানালেন, 'আজ কোনও বিচারপ্রার্থী নেই।'

রাম খুশি হয়ে বললেন, 'তার মানে, প্রজাদের একজনেরও মনে কোনও ক্ষোভ নেই। কারও বিরুদ্ধে কারও কোনও অভিযোগ নেই। সকলেই সুখে আছে। তবু তুমি আর একবার দেখে এসো লক্ষ্মণ।'

লক্ষ্মণ এবার দ্বারে এক বিচারপ্রার্থী কুকুরকে পেয়ে তাকে রামের কাছে নিয়ে এলেন। কুকুর বলল, 'হে রাম! সর্বার্থসিদ্ধ নামে এক ব্রাহ্মণ অকারণে আমার মাথায় আঘাত করে আমার কী অবস্থা করেছেন দেখুন!'

ডাকা হল সর্বার্থসিদ্ধকে। সর্বার্থসিদ্ধ বললেন, 'মহারাজ! আমি ভিক্ষে করছিলাম। এ কুকুর আমার পথ আটকে রেখেছিল। যত বলি, সরে যা, সরে না কিছুতেই। তখন বাধ্য হয়েই, আমি একে ঠেঙাই। আমি অন্যায় করেছি। দয়া করে আমাকে কিছু শাস্তি দিন। যদি এখানেই শাস্তি ভোগ করে যাই, তা হলে আর আমাকে নরকে যেতে হবে না।'

রামের সভায় ঋষিরা বললেন, 'শাস্ত্র মানলে ব্রাহ্মণকে শাস্তি দেওয়া যাবে না।'

কুকুর তখন বলল, "মহারাজ! আমার ওপর সুবিচার হবে, যদি এই ব্রাহ্মণকে আপনি 'কালঞ্জরের কুলপতি' করে দেন।"

(কালঞ্জর = (১) কালিঞ্জর নগর, (২) সন্ন্যাসীদের গোষ্ঠী। কুলপতি = যিনি দশ হাজার মুনিঋষির ভরণ-পোষণ-অধ্যাপনার দায়িত্ব নেন।)

রাম বললেন, 'তথাস্তু'।

সর্বার্থসিদ্ধ খুশি মনে হাতির পিঠে চেপে চলে গেলেন।

রামের সচিবরা, অবাক হয়ে, সর্বার্থসিদ্ধকে শাস্তির বদলে পুরস্কার দেবার ব্যাখ্যা

জানতে চাইলেন।

রাম বললেন, 'ওই কুকুর সব জানে।'

কুকুর বলল, "মহারাজ! আমিই আগে ওই 'কালঞ্জরের কুলপতি' ছিলাম। কুলপতির ক্ষমতা ভোগ করে আমার মধ্যে অহংকার দানা বাঁধে। তার ফলে যা হওয়ার, তাই। পতন।

"এই অধার্মিক ব্রাহ্মণ কুলপতি হবেন। তাঁর স্খলন হবেই। তার ফলেই, তার উনপঞ্চাশ পুরুষকে যেতে হবে নরকে। যদি কারও সর্বনাশ চান, তবে তাঁকে ওই 'কালঞ্জরের কুলপতি' বানিয়ে দিন।" বলে কুকুর চলে গেল বারাণসীতে।

বিচারপ্রার্থী শকুন আর পেঁচা

এক পেঁচা আর এক শকুন বিচারপ্রার্থী হয়ে এল রামের কাছে।

পেঁচার বাড়িতে শকুন গায়ের জোরে ঢুকে পড়ে বলছে, 'এ বাড়ি আমার।'

তাই বিচার প্রার্থনা।

শকুন রামকে বলল, 'মহারাজ! আমি নিজের হাতে এ বাড়ি তৈরি করেছি। আর এখন এ পেঁচা বলে কিনা এটা ওর বাড়ি!'

পেঁচা বলল, 'মহারাজ! এই শকুন গায়ের জোরে আমার বাড়ির দখল নিতে চাইছে। আপনি দয়া করে এর বিহিত করুন।'

রাম মন্ত্রীদেরকে জানালেন ব্যাপারটা। তারপর শকুনকে বললেন, 'ওহে শকুন! তুমি ক'বছর আগে এ বাড়ি তৈরি করেছ?'

শকুন বলল, 'আজ্ঞে, পৃথিবীতে যখন মানুষ বাস করতে শুরু করল, তখনই এ বাড়ি আমি বানাই মহারাজ।'

পেঁচা বলল, 'মহারাজ! ভগবান যখন পৃথিবীতে গাছ সৃষ্টি করলেন, আমার এ বাড়ি তখনকার।'

রাম মন্ত্রীদের রায় চাইলেন।

মন্ত্রীরা বললেন, 'আমাদের ধারণা, পেঁচাই বাড়ির মালিক। শকুন নয়। তবে এ ব্যাপারে আপনি যা বলবেন, তা-ই নিশ্চয়ই সঠিক হবে।' রাম বললেন, 'পুরাণ মতে, প্রথমে সব জলে জলময় ছিল। বিষ্ণু লক্ষ্মীর সঙ্গে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে পেটের ভেতর পুরে সমুদ্রে শুয়েছিলেন।

'বিষ্ণুর নাভি থেকে সৃষ্টি হল ব্রহ্মার। ব্রহ্মা তারপর পৃথিবী, বায়ু, পর্বত, গাছপালা এবং সমস্ত জীবজগৎ সৃষ্টি করলে বিষ্ণুর কানের ময়লা থেকে মধু আর কৈটভ নামে দুই দৈত্য জন্মাল। জন্মেই, তারা ব্রহ্মাকে আক্রমণ করল।

'বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে বধ করলেন দুই দানবকে। তাদের চর্বিতে ভেসে গেল পৃথিবী। ('মেদ' থেকে জাত, তাই পৃথিবীর আর এক নাম মেদিনী'।) মেদিনীকে শুদ্ধ করতে বিষ্ণু তাকে গাছে ভরিয়ে দিলেন।

'কাজেই, বাড়িটা যে পেঁচার, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শকুনকে তার কাজের জন্য শাস্তি পেতে হবে।'

এমন সময় দৈববাণী হল, " রাম। রাজা ব্রহ্মদত্তই, শাপগ্রস্ত হয়ে, এই শকুন

হয়েছেন। এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণকে ইনি খাবার দিয়েছিলেন। তাতে ভুল করে এক টুকরো মাংস থেকে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদত্তকে শকুন হওয়ার শাপ দেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁর অনিচ্ছাকৃত পাপের জন্য মার্জনা চাইলে, ব্রাহ্মণ বলেন, 'রামের স্পর্শে তুমি শাপমুক্ত হবে।' এঁকে তুমি শাপমুক্ত করো রাম!"

রামের হাতের ছোঁয়া লাগতেই, শকুন আবার রাজা ব্রহ্মদত্তের রূপ ফিরে পেলেন।

লবণাসুর বধের তোড়জোড়

চ্যবনের নেতৃত্বে যমুনাতীরে, বেশ কিছু সাধু একদিন রামকে এসে জানালেন, যে, লবণাসুরের অত্যাচারে তাঁরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। সে রোজই শয়ে শয়ে সাধুকে খেয়ে ফেলছে।

লবণাসুরের পরিচয় দিয়ে চ্যবন বললেন, "লোলা দৈত্যের বড় ছেলে মধু। মধুর স্ত্রী কুম্ভীনসী। এই মধু আর কুম্ভীনসীরই ছেলে হল লবণ।

"মধুর সৎ চরিত্র এবং ভক্তিতে খুশি হয়ে, মহাদেব তাঁকে এক শূল দিয়ে বলেছিলেন, 'মধু! দেবতা আর ব্রাহ্মণের বিরোধিতা না করলে, এ শূল তোমারই থাকবে। একে যার ওপর ছুড়বে, তাকে ভস্ম করে এ আবার তোমার হাতেই ফিরে আসবে।'

"মধু বংশানুক্রমে সে-শূলের মালিক হতে চাইলে মহাদেব বললেন, 'তা হবে না। তবে তোমার এক ছেলে এ শূল পাবে।' সেই ছেলেই এই লবণ।"

রাম ঋষিদের লবণ বধের প্রতিশ্রুতি দিলেন। লবণ বধের দায়িত্ব চেয়ে নিলেন শত্রুঘ্ন। রাম শত্রুঘ্নকে লবণের রাজ্যের ভাবী রাজার পদে অভিষিক্ত করলেন।

শত্রুঘ্নকে এক 'দিব্য শর' দিয়ে রাম বললেন, 'মধু-কৈটভকে মারার জন্য এই শর ভগবান বিষ্ণু সৃষ্টি করেছিলেন। আমি অযথা লোকক্ষয় এড়াবার জন্য রাবণের ওপর এটা প্রয়োগ করিনি।'

'শোনো শত্রুঘ্ন! লবণ যখন খাবারের সন্ধানে বাইরে বেরোয়, তখন শিবের দেওয়া শূল তার ঘরেই থাকে। কাজেই, ঠিক ওই সময়েই তাকে আক্রমণ করতে হবে। এটা মাথায় রেখো। শূল ওর হাতে থাকলে কিন্তু এ শর কাজ করবে না।'

মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে শত্রুঘ্ন

রামের কথা মতো আগে তাঁর সৈন্যদের সাধুদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন শত্রুঘ্ন।

এখন গ্রীষ্মকাল। বর্ষাকালই লবণ বধের প্রশস্ত সময়। গ্রীষ্ম শেষ হলেই, সেনারা জাহ্নবী নদী পার হয়ে যাবে।

সেনা পাঠাবার এক মাস পর, শত্রুঘ্ন নিজে যাত্রা করলেন লবণের রাজ্যের দিকে। দাদার কথামতো—একাই। ধনুর্বাণ হাতে। পথে দু'রাত কাটিয়ে এসে আশ্রয় নিলেন মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে।

বাল্মীকি পরম সমাদরে গ্রহণ করলেন শত্রুঘ্নকে। শত্রুঘ্নকে শোনালেন রঘুবংশের

পূর্বপুরুষ সৌদাসের অভিশপ্ত হয়ে 'কল্মাষপাদ' হওয়া, এবং আবার শাপমুক্ত হয়ে সৌদাস হওয়ার কথা।

কুশ-লবের জন্ম

সেই রাতেই, সীতা দুই যমজ সন্তান প্রসব করলেন। বাল্মীকি মুনি কিছু কুশ গাছ নিয়ে ধাই-মাদের হাতে দিয়ে বললেন, 'যে আগে জন্মেছে, তার গা পরিষ্কার করাবে কুশের আগা দিয়ে। তার নামও হবে 'কুশ'। আর যে পরে জন্মেছে, তার গা পরিষ্কার করাবে কুশের গোড়া দিয়ে। তার নাম হবে 'লব'।

শত্রুঘ্ন শুনলেন সবই। বউদি এবং দুই সদ্যোজাত ভাইপোকে দেখে, খুব খুশিও হলেন। কিন্তু, দাদার অনুমতি না থাকায়, তিনি বউদি সীতার সঙ্গে দেখা করার কথা কারও কাছে প্রকাশ করলেন না।

পরদিন। ভোরেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন। সাত রাত পর এসে পৌঁছলেন মহর্ষি চ্যবনের আশ্রমে।

(আশ্চর্য সংযম তো শত্রুঘ্নর! এত বড় খবরটা এত দীর্ঘকাল চেপে রেখেছিলেন কী করে? টুপি খুলতেই হয় এই অবিশ্বাস্য বাক্-সংযমের কাছে।)

লবণ বধ

একদিন। লবণ সকালে খাবারের সন্ধানে বেরিয়েছেন। শত্রুঘ্ন তাঁর ফেরার অপেক্ষায় এক জায়গায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রইলেন। ফেরার পথে তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান জানালেন শত্রুঘ্ন। দু'জনে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা হল।

শত্রুঘ্নের আক্রমণে নাজেহাল লবণ এক গাছ ছুড়ে মারলেন শত্রুঘ্নর মাথায়। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন শত্রুঘ্ন। 'হায়! হায়!' করে উঠলেন দেবতারা।

অহংকারী লবণ শত্রুঘ্নকে মৃত মনে করে, ঘরে গিয়ে শূল নিয়ে আসার চেষ্টাও করলেন না। নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরছিলেন লবণ। চেতনা ফিরে পেয়েই, আর ভুল করলেন না শত্রুঘ্ন। ছুড়ে মারলেন অব্যর্থ বিষ্ণুশর।

লবণকে বধ করে বিষ্ণুশর আবার ফিরে এল তাঁর হাতে। আর শিবশূল লবণের ঘর থেকে বেরিয়ে ফিরে গেল শিবের কাছে।

(এই শিবশূল এবং বিষ্ণুশর কি দূর-নিয়ন্ত্রিত, মানে যাকে বলে, রিমোট কন্ট্রোল গোছের কোনও অস্ত্র ছিল? এদের চলাফেরা ঠিক সেইরকমই নয়?)

অযোধ্যা ঘুরে গেলেন শত্রুঘ্ন

লবণের রাজ্যে বারো বছর রাজত্ব করার পর, রামকে দেখতে শত্রুঘ্ন চললেন অযোধ্যায়। পথে, বাল্মীকির আশ্রমে অপূর্ব রামায়ণ গান শুনে মুগ্ধ হলেন।

সাত দিন অযোধ্যায় কাটিয়ে আবার ফিরে আসতে হল নিজের রাজ্যে। কারণ, রাম বলে দিয়েছেন, রাজকার্যে ফাঁকি দেওয়া চলবে না।

এই রামায়ণ গানও কিন্তু শত্রুঘ্নকে শুনিয়েছেন বালক লব-কুশই।

(ধন্য সংযম বটে শত্রুঘ্নর! অযোধ্যায় ফিরে মুখে একেবারে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন! একটুও ট্যাঁ ফো করেননি!)

শম্বুক বধ

একদিন। এক ব্রাহ্মণ তাঁর মৃত ছেলেকে কোলে করে রামের কাছে এসে বললেন, 'মহারাজ! আপনার পাপেই আমার ছেলে অকালে প্রাণ হারাল! পাশাপাশি কোনও রাজ্যে কেউ এমন অকালে মারা যায় না। হয় আপনি নিজে কোনও পাপ কাজ করছেন, নয় আপনার রাজ্যে অন্য কেউ কোনও পাপ করছে। যার কোনও প্রতিকার আপনি করছেন না।'

রাম বৃদ্ধের কথায় বিচলিত হয়ে খুঁজতে বেরলেন, কে কোথায় কী পাপ কাজ করছে। খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় দেখলেন, শম্বুক নামে একজন শূদ্র-তপস্বী সশরীর স্বর্গে যাওয়ার জন্যে হেঁটমুণ্ড-উর্ধ্বপদ হয়ে কঠোর তপস্যা করছেন।

ত্রেতাযুগে শূদ্রের তপস্যার অধিকার ছিল না।

রাম তৎক্ষণাৎ শম্বুকের মাথা কাটলেন। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করে রামকে বর দিতে চাইলেন। রাম বললেন, 'তবে সেই ব্রাহ্মণকুমারের জীবন ফিরিয়ে দিন!'

দেবতারা বললেন, 'শম্বুকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তো সে জীবন ফিরে পেয়েছে!'

(কিছু করার নেই। সমাজের অদ্ভুত বিধান মতোই রামকে তখন এই নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। শম্বুক বধ না করলে ব্রাহ্মণরা তাঁকে আদর্শভ্রষ্ট আখ্যা দিতেন। সেই আখ্যার ভয়েই তো নিজের বনবাস এবং সীতা-নির্বাসন! যাই হোক, আজকের যুগে দাঁড়িয়ে আমরা তৎকালীন সমাজপতিদের দেওয়া এই বিধানকে মান্য করতে পারছি না।)

দেবতারা রামকে নিয়ে গেলেন অগস্ত্যের আশ্রমে। শূদ্র-তপস্বী শম্বুককে মারার জন্য অগস্ত্য খুশি হয়ে রামকে অনেক দিব্য অলঙ্কার দিলেন।

(এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, শম্বুক বধের সিদ্ধান্ত রামের নিজের নয়। সমাজপতিদের। রাম সেই সমাজের একনিষ্ঠ আজ্ঞাবহ সেবক হিসেবেই কাজ করে গেছেন। চিরকালই।)

রাম অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ সব অলঙ্কার আপনি কোথায় পেলেন মুনিবর?'

অগস্ত্য শোনালেন সে কাহিনী।

শ্বেত-কাহিনী

অগস্ত্য বললেন, 'রাম! একবার এক নির্জন, পশুপাখিহীন বনের মধ্যে তপস্যা করতে গিয়ে, এক মনোরম সরোবর দেখতে পেলাম আমি। সেই সরোবরে এক তাজা শবদেহ ভাসছিল। হঠাৎ, সেখানে অপ্সরা-পরিবৃত হয়ে এক স্বর্গীয় বিমান এসে নামল। সেই বিমান থেকে নামলেন এক দিব্য-পুরুষ। সেই অসামান্য সুন্দর পুরুষ

বিস্ময়করভাবে সেই শবদেহের মাংস খেলেন! কাঁচাই! ভাবতে পারো? আমার তো গা রি রি করে উঠল।

"সরোবরের জলে মুখ ধুয়ে তিনি আবার বিমানে উঠতে যাবেন, তখন তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম আমি। তিনি বললেন, 'আমি বিদর্ভরাজ সুদেবের ছেলে শ্বেত। ছোট ভাই সুরথকে রাজ্যভার দিয়ে, তিন হাজার বছর তপস্যা করে, আমি ব্রহ্মালোকে যেতে পেরেছি। কিন্তু, দান ধ্যান না করায়, আমার খিদে-তৃষ্ণা এখনও মেটেনি। তাই নিজের দেহের মাংস খেয়েই, খিদে মেটাই। ব্রহ্মা বলেছিলেন, যে, অগস্ত্যের দেখা পেলে তুমি এই জঘন্য খ্যাদ্যাভ্যাস থেকে মুক্তি পাবে।'"

রামকে এই রোমহর্ষক কাহিনী শুনিয়ে, অগস্ত্য বললেন, "এই কথা বলে শ্বেত আমাকে এইসব অলঙ্কার দিয়ে তাঁর মুক্তি প্রার্থনা করলেন। এবং আমার আশীর্বাদে তিনি মুক্ত হয়ে স্বর্গে গেলেন।"

(দান-মাহাত্ম্যের চমৎকার নীতিগল্প। কাহিনী বটে! অলঙ্কারটা দক্ষিণা। অন্য কিছু নয়। শেষ দান। ওটা স্রেফ নিয়মরক্ষে করা। ওটাও সমাজপতিদের বিধান!)

দণ্ডকারণ্য কাহিনী

অগস্ত্যের কাছে রাম জানতে চাইলেন, শ্বেত যে-বনে তপস্যা করেছিলেন, তা কেন নির্জন ছিল? সেখানে কেনই বা পশুপাখিও ছিল না?

অগস্ত্য বললেন, "দণ্ডবিধানের অধিকারী রাজা মনু সত্যযুগে তাঁর ছেলে ইক্ষ্বাকুকে পৃথিবীতে রাজ্যস্থাপন, প্রজাপালন এবং ন্যায্য মতো দণ্ডদানের অধিকার দিলেন। ইক্ষ্বাকুর একশো ছেলের মধ্যে ছোট ছেলের কোনও গুণ ছিল না। তাঁর কপালে দণ্ডভোগ আছেই— নিশ্চিত জেনে, ইক্ষ্বাকু তাঁর নাম দিলেন 'দণ্ড'।

"বিন্ধ্য আর শৈবাল পর্বতের মধ্যবর্তী মধুমন্ত নগরের রাজার পদ পেলেন দণ্ড।

"শুক্রাচার্য তাঁর গুরু হিসেবে মধুমন্তে গেলেন।

"একদিন শুক্রাচার্যের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁর বড় মেয়ে অরজাকে, অরজার নিষেধ অগ্রাহ্য করে, ধর্ষণ করলেন দণ্ড। শুক্রাচার্যের শাপে, সাত দিনের মধ্যেই দণ্ডের রাজ্য ইন্দ্রের সৃষ্টি করা ধুলোর বৃষ্টিতে ধ্বংস হয়ে গেল।

"এই জন্যই এখানে কোনও পশুপাখি ছিল না। দণ্ডের নামে এ অরণ্যের নাম হল 'দণ্ডকারণ্য'। সাধুরা থাকেন বলে, এ বনকে 'জনস্থান'ও বলে।

বৃত্রবধ কাহিনী

অগস্ত্যের আশ্রমে এক রাত কাটিয়ে পুষ্পকে চড়ে অযোধ্যায় ফিরে এলেন রাম। রাজসূয় যজ্ঞ করতে চাইলেন।

ভরত বললেন, 'এমনিতেই তো সব রাজারা আপনার বশে আছেন। অযথা লোকক্ষয় করে লাভ কী?'

রাম বললেন, 'ঠিক কথা।'

লক্ষ্মণ বললেন, 'অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ইন্দ্র বৃত্রবধের দরুন ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে

মুক্ত হয়েছিলেন। আপনি বরং অশ্বমেধ যজ্ঞই করুন। ত্বষ্টা মুনির ছেলে বৃত্রের তপস্যায় ভয় পেয়ে, ইন্দ্র তাঁর মাথায় বজ্র ছুড়ে মেরেছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত করতে বিষ্ণুর পরামর্শ মতো ইন্দ্র তখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন।

'এ দিকে, ইন্দ্রের ঘাড় থেকে নেমে ব্রহ্মহত্যার পাপ, দেবতাদের ইচ্ছে মতো নিজেকে চারভাগে ভাগ করল।

'প্রথম অংশ বর্ষার চার মাসের জন্য বাস করতে লাগল পূর্ণগর্ভা নদীতে। কামচারিণী, দর্পনাশিনী হয়ে।

'দ্বিতীয় অংশ মাটিতে ঊষরতা হয়ে থাকল।

'তৃতীয় অংশ যুবতী মেয়েদের মধ্যে তিন রাতের জন্য তাদের যৌবনের দর্পঘাতিনী রূপে, বাস করতে লাগল।

'চতুর্থ অংশ নির্দোষ ব্রাহ্মণদের যারা মিথ্যে অপবাদ দেয়, সেই সব মিথ্যে দোষদর্শীদের দেহে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগল।'

ইল/ইলা—এক মাস পুরুষ, এক মাস নারী

রাম বললেন, 'লক্ষ্মণ! অশ্বমেধ যজ্ঞের শক্তি সম্বন্ধে আমারও এক কাহিনী জানা আছে। 'বাহ্লীক দেশের রাজা ছিলেন প্রজাপতি কর্দমের ছেলে ইল। মৃগয়া করতে গিয়ে, তিনি ভুল করে এক বিচিত্র বাগানে ঢুকে পড়লেন। সে বাগানে ঢোকামাত্রই, তিনি এবং তাঁর সেনারা সকলেই স্ত্রী হয়ে গেলেন।

'সে বাগান ছিল মহাদেবের। পার্বতীকে খুশি করার জন্য মহাদেব সে বাগানে এই নিয়ম করেছিলেন। নিজেও সেই নিয়মে স্ত্রী হয়েই ছিলেন।

'মহাদেবের পায়ে পড়লেন ইল। মহাদেব পুরুষত্ব ফিরিয়ে দিতে চাইলেন না। তখন পার্বতীর বরে ইল একমাস পুরুষ এক মাস নারী, এইভাবে জীবন কাটাবার অনুমতি পেলেন।

'যখন পুরুষ, তখন ইল। যখন নারী, তখন ইলা।

'ইলার প্রেমে পড়লেন বুধ। তাঁদের এক ছেলে হল। পুরূরবা।

'শেষে, মহর্ষি মরুতের পৌরোহিত্যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে মহাদেবকে খুশি করে তাঁর বরে আবার স্থায়ীভাবে পুরুষত্ব ফিরে পেলেন ইল।'

অশ্বমেধ যজ্ঞ শুরু করলেন রাম

বশিষ্ঠ, বামদেব জাবালি আর কশ্যপের পৌরোহিত্যে, গোমতী নদীর তীরে নৈমিষক্ষেত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞ শুরু করলেন রাম। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে যজ্ঞ চলতে লাগল।

যজ্ঞের কাজের লোক-লস্কর, পাচক, নর্তক, রাজবাড়ির অন্তঃপুরের মহিষী, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি সবাইকে নিয়ে আগেই চলে গেলেন ভরত। সীতার বদলে গেল সোনা দিয়ে তৈরি সীতার মূর্তি। স্বর্ণ-সীতা। যজ্ঞের উপকরণ গেল ভূরি ভূরি।

নেমন্তন্ন পেয়ে ছুটে এসে কাজে লেগে গেলেন সদলবল সুগ্রীব আর বিভীষণ।

মুনিরা বললেন, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম বা বরুণের যজ্ঞেও, এমন দানধ্যানের বহর তাঁরা দেখেননি।

সকলেই রামকে 'সাধু সাধু' বলতে লাগলেন। রামের নামে জয়ধ্বনি দিলেন।

গানের মাধ্যমে রামায়ণ শোনালেন লব-কুশ

অশ্বমেধ যজ্ঞে নেমন্তন্ন পেয়ে, এসেছিলেন সপার্ষদ মহর্ষি বাল্মীকি। তাঁর নির্দেশে লব-কুশ অযোধ্যার পথে পথে গেয়ে বেড়াতে লাগলেন রামায়ণ গান।

তাঁদের প্রাণঢালা গান শুনে মনপ্রাণ ভরে গেল সবার। অযোধ্যাবাসী জানেন না এদের পরিচয়। গান শুনে মুগ্ধ সবাই। সবারই মনে একই প্রশ্ন। কে এই দুই দেবশিশু? কী এদের পরিচয়?

রামের কানেও গেল সে গান। রাম দু'ভাইকে ডেকে পাঠালেন যজ্ঞ-সভায়। চাইলেন তাঁদের পরিচয়। দু'ভাই বাল্মীকির শিখিয়ে দেওয়া কথা মতো বললেন, 'আমরা বাল্মীকির শিষ্য।'

রামের বুকটা ছ্যাঁক করে উঠল!

'তবে এরা কি সীতার গর্ভজাত আমারই সন্তান? হা ঈশ্বর! ভাগ্যের কী প্রহসন!'

রামের যজ্ঞসভাতে গান শুনিয়ে সবাইকে মাতিয়ে দিলেন দু'ভাই। জয় করে নিলেন সবার মন।

সবাই বললেন, 'জটা খুললেই, এঁদের থেকে রামকে আলাদা করা কঠিন হবে। হুবহু এক চেহারা।'

রামের নির্দেশে দু'ভাইকে দেওয়া হল আঠারো হাজার সোনার মোহর। দু' ভাই তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, 'আমরা ফলমূল খাই। তপস্যা করি। মোহর দিয়ে আমরা কী করব?'

এও বাল্মীকিরই শিখিয়ে দেওয়া কথা।

সীতার পাতাল প্রবেশ

লবকুশকে দেখে, আর তাদের গান শুনে, মন ভরে গেল রামের। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল, 'এরা আমারই ছেলে।'

বাল্মীকিকে খবর পাঠালেন রাম। সীতার আপত্তি না থাকলে, তিনি যেন সীতাকে নিয়ে আসেন যজ্ঞসভায়। সীতা যদি সত্যিই শুদ্ধাচারিণী এবং নিষ্পাপ হন, তবে যজ্ঞসভায় এসে তিনি যেন শপথ নিয়ে সে কথা ঘোষণা করেন।

বাল্মীকির পেছন পেছন, খুব ধীর পায়ে, আস্তে আস্তে, সভায় এসে ঢুকলেন সীতা! যেন মূর্তিমতী করুণা! পবিত্রতা স্বরূপিনী! গৈরিকবসনধারিণী! তপোক্লিষ্টা! যেন দেবলোকের কোনও তপস্বিনী!

তাঁর রূপের ছটায় সভায় যেন চাঁদ ঢুকে পড়েছে বলে মনে হল। কী স্নিগ্ধা! কী শুচি-সুন্দর চেহারা তাঁর! অপাপবিদ্ধা! যেন স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি! শোকে দগ্ধা! বিচলিতা! কিন্তু রামদর্শনে তৃপ্তা!

আহা!

সভায় সুচ-পতনের নৈঃশব্দ্য।

বাল্মীকি বললেন, 'রাম! এই সেই অপাপবিদ্ধা, শুদ্ধা, পবিত্রা, পতিগতপ্রাণা সীতা—যাঁকে অপবাদের ভয়ে তুমি পরিত্যাগ করেছিলে। আর ওই যে লব-কুশকে দেখছ? ওরা সীতার গর্ভজাত তোমারই দুই যমজ ছেলে!'

রাম হাত জোড় করে ছল ছল চোখে বললেন, 'আমি সবই বিশ্বাস করছি মহর্ষি। সীতা যে অপাপবিদ্ধা, লব-কুশ যে আমারই ঔরসজাত ছেলে—সবই আমি স্বীকার করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আর আশীর্বাদ করুন, সীতার প্রতি আমার ভালবাসা যেন আরও গভীর হয়।

'লঙ্কায় দেবতাদের সামনে সীতা নিষ্পাপ বলে শপথ নেওয়ায়, ওঁকে ঘরে এনেছিলাম। পরম সমাদরে। লোকের অপবাদের ভয়ে, সম্পূর্ণ নির্দোষ জেনেও, আবার সীতাকে আমি ত্যাগ করেছি। আশীর্বাদ করুন, সীতার প্রতি আমার ভালবাসা চিরন্তন হোক!'

সীতা হাত জোড় করে মাটির দিকে চেয়ে বললেন, 'মা ধরিত্রী! আমি যদি শুধু রামকেই আমার গতির্ভর্তাসখাহরি জেনে কায়মনোবাক্যে শুধু রামেরই পূজা করে থাকি, যদি রাম ছাড়া আর অন্য কোনও পুরুষের কথা এক মুহূর্তের জন্যও আমার মনে ঠাঁই না দিয়ে থাকি, আর যদি যা বলেছি, তা সত্য বলে থাকি, তবে মা! দয়া করে এবার তোমার এই জনমদুখিনী মেয়েকে তুমি তোমার কোলে ফিরিয়ে নাও!'

সীতার কথা শেষ হতেই, তাঁর সামনের জমি দু-ভাগ হয়ে গেল। পাতাল থেকে উঠে এল এক দিব্য-সিংহাসন। তাতে হাসি মুখে বসে মা ধরিত্রী স্বয়ং। মা তাঁর প্রিয় মেয়েকে দু'হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিলেন।

সিংহাসন আস্তে আস্তে আবার নেমে গেল পাতালে। মায়ের মেয়ে ফিরে গেলেন মায়ের কোলে।

জনমদুখিনী সীতা, অপমানে অপমানে জর্জরিতা সীতা, ফিরে পেলেন তাঁর জন্মদাত্রী মায়ের নিবিড় স্নেহ-ভালবাসার আলিঙ্গন। সে আলিঙ্গন বড় সুখের। বড় আদরের। বড় শান্তির। আবার, বড় কষ্টেরও।

রামের শোক

শোকে ভেঙে পড়লেন রাম। ক্রোধে বসুন্ধরাকে বিদীর্ণ করার হুমকি দিলেন। দেবতারা শান্ত করলেন রামকে। রামের নির্দেশে উত্তরকাণ্ড লিখলেন বাল্মীকি।

(পণ্ডিতদের মতে, এই উত্তরকাণ্ডের পুরোটাই প্রক্ষিপ্ত। পরবর্তী কালে, এক বা একাধিক প্রতিভাধর কবির সংযোজন। তবে, এই সংযোজন যে বাল্মিকীর মূল রচনার সুরকে ধরে রেখেছে, কোথাও যে উল্লেখযোগ্য ছন্দপতন ঘটেনি, এ ব্যাপারে প্রায় সকলেই একমত।)

মাতৃহারা হলেন রাম

সীতাকে হারিয়ে, দশ হাজার বছর অনেক যজ্ঞ করলেন রাম। সব সময় সোনার সীতা পাশে থাকত তাঁর। ছায়া-সীতা। এর মধ্যেই, আসল সীতাকে দেখতেন রাম।

এক সময় কৌশল্যা চলে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে। তারপর সুমিত্রা। এবং একদিন কৈকেয়ীও চলে গেলেন।

গন্ধর্ব নগর জয়

ভরতের মামা যুধামন্যুর কাছ থেকে আসা মহর্ষি গার্গ্যার উপদেশ মতো ভরতের দুই ছেলে 'তক্ষ' আর 'পুষ্কল' ভরতের নেতৃত্বে গেলেন গন্ধর্বনগর জয় করতে। সাত রাত ধরে যুদ্ধ চলল। যুদ্ধ শেষে ভরত সেখানে দুটো নগরীর পত্তন করলেন। 'তক্ষশীলা' আর 'পুষ্কলাবতী'। তক্ষশীলায় তক্ষকে, আর পুষ্কলাবতীতে পুষ্কলকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন ভরত। পাঁচ বছর পর ভরত ফিরে গেলেন অযোধ্যায়।

কারুপথ দেশে 'অঙ্গদীয়া' আর মল্লভূমিতে 'চন্দ্রকান্তা' নামে দুই নগরীর পত্তন করলেন রাম। ওই দুই নগরীর রাজপদে অভিষিক্ত করলেন লক্ষ্মণের দুই ছেলে 'অঙ্গদ' আর 'চন্দ্রকেতু'কে।

লক্ষ্মণকে বর্জন করলেন রাম

একদিন। ব্রহ্মার দূত কাল এসে রামকে বললেন, 'হে রাম! কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে। তবে দেখবেন, আমাদের কথার সময় যেন তৃতীয় কোনও ব্যক্তি এখানে না আসে।'

রাম লক্ষ্মণকে বললেন, 'দ্বাররক্ষককে সরিয়ে তুমি নিজে দরজায় পাহারায় থাকো। সাবধান! যে আমাদের কথা বলার সময় এখানে আসবে, তাকেই কিন্তু মৃত্যু বরণ করতে হবে। কাল-এর শর্ত মতো তাকে বধ করতে হবে।'

লক্ষ্মণ গেলেন দুয়ার আগলাতে। দূত ব্রহ্মার হয়ে রামকে দেবলোকে ফিরে যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিলেন।

এমন সময়, মহাক্রোধী মুনি (শাপ-স্পেশালিস্ট) দুর্বাসা এলেন রামের সঙ্গে দেখা করতে। বললেন, 'এক্ষুণি রামকে খবর দাও। নইলে সবাইকে শাপ দেব।'

সবাইকে বাঁচাতে লক্ষ্মণ নিজের জীবন ত্যাগ করার সংকল্প নিয়ে রামকে খবর দিলেন। রাম ব্রহ্মার দূত কালকে বিদায় দিয়ে দুর্বাসার কাছে এলেন।

দুর্বাসা বললেন, 'আমি এক হাজার বছরের উপবাস আজ ভাঙব। খাবার আনাও।' রামের আনানো খাবার খেয়ে, রামকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন দুর্বাসা। কুলপুরোহিতদের সঙ্গে পরামর্শ করে, প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে, লক্ষ্মণকে বধ না করে, চোখের জলে ত্যাগ করলেন রাম। কাঁদতে কাঁদতে লক্ষ্মণ এলেন সরযূর তীরে। যোগস্থ হয়ে শ্বাস বন্ধ করলেন। ইন্দ্র তাঁকে সশরীর স্বর্গে নিয়ে এলেন।

রামের মহানির্বাণ

লক্ষ্মণকে হারিয়ে শোকে ভেঙে পড়লেন রাম। ভরতকে রাজত্ব দিয়ে নিজে প্রাণ বিসর্জন দিতে চাইলেন। শত্রুঘ্নকে আনতে লোক ছুটল। কুশকে দক্ষিণ আর লবকে উত্তর-কোশলের রাজপদে অভিষিক্ত করা হল। কুশের রাজধানী হল কুশাবতী। আর লবের শ্রাবস্তীপুরী।

শত্রুঘ্ন তাঁর ছেলে সুবাহুকে মথুরা-র আর শত্রুঘাতীকে বৈদিশপুরী-র রাজা করে দিয়ে রামের সঙ্গে আত্মোৎসর্গের জন্য ছুটে এলেন অযোধ্যায়।

রাত ভোর হতেই, বশিষ্ঠের পৌরোহিত্যে শুরু হল মহাপ্রস্থানের আয়োজন। রামের পেছন পেছন চললেন, ভরত, শত্রুঘ্ন, তাঁদের স্ত্রীরা, অযোধ্যার যত প্রজা, বানরকুল, পশু পাখি ইত্যাদি। চার বেদ, গায়ত্রী, মন্ত্র, ওঁকার, যত অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি সকলেই, মানুষের রূপ ধরে চলতে লাগলেন রামের সঙ্গে।

শোভাযাত্রা সরযূর তীরে আসতেই, দেখা গেল, স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মাসহ সমস্ত দেব-দেবীরা একশো কোটি বিমান নিয়ে আকাশে অপেক্ষা করছেন।

রাম নিজে বিষ্ণু-তেজে প্রবেশ করে বিষ্ণু-দেহ ধারণ করলেন। ব্রহ্মাকে নির্দেশ দিলেন, তাঁর (রামের) অনুগামীদের জন্য উপযুক্ত লোকের ব্যবস্থা করতে। সকলেই সরযূ নদীতে দেহ ত্যাগ করে, নতুন দিব্য-দেহ নিয়ে, ব্রহ্মার দিব্য-বিমানে চড়ে স্বর্গে নিজের নিজের উপযুক্ত লোকে চলে গেলেন।

শেষ হল রামায়ণের মূল কথা।

রামায়ণ মাহাত্ম্য

উত্তরকাণ্ড সমেত এই সাতকাণ্ড রামায়ণ বাল্মীকির লেখা। স্বয়ং ভগবান ব্রহ্মা এই মহাকাব্যের সমাদর করেছেন। ত্রিলোকবিহারী বিষ্ণু নরলীলা সাঙ্গ করে আবার ফিরে গেছেন দেবলোকে। দেবতারাও প্রতিদিন রামায়ণ গান শোনেন।

শ্রাদ্ধের সময় আয়ুষ্কর, সৌভাগ্যজনক, পাপনাশকারী, বেদের তুল্য এই রামায়ণ গান করে শোনাবেন ঋত্বিকরা।

এই পবিত্র মহাকাব্য পাঠ করলে, অপুত্রকের পুত্র হয়। নির্ধনের ধন হয়। কেউ যদি এই পবিত্র মহাকাব্যের মাত্র এক চরণও পাঠ করেন, তা হলেও তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হবেন।

যিনি রামায়ণ পাঠ করে শোনাবেন, তাঁকে কাপড়, গরু এবং সোনা দান করা উচিত। পাঠক তুষ্ট হলে, সমস্ত দেবতারাও সন্তুষ্ট হন।

যে মহাকাব্য পাঠে আয়ু বাড়ে, সেই পবিত্র মহাকাব্য যিনি পড়েন, ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনির সঙ্গে তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে—দুই লোকেই—সুখে শান্তিতে থাকবেন।

ভোরবেলা, দুপুরে, বিকেলে বা সন্ধেবেলা রামায়ণ পড়লে, মনের সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। সোনার অযোধ্যা এরপর অনেক কাল জনশূন্য অবস্থাতেই ছিল। পরে রাজা ঋষভ সেখানে আবার নতুন করে লোকালয়ের পত্তন করেন।

ব্রহ্মাও, উত্তরকাণ্ড সমেত এই সাতকাণ্ড রামায়ণকে প্রচেতার ছেলে বাল্মীকির রচনা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

(উত্তরকাণ্ডকে প্রক্ষিপ্ত নয় বলে প্রমাণ করতে 'রামায়ণ মাহাত্ম্য'সহ উত্তরকাণ্ডের বিভিন্ন অংশে যে ভাবে ঢাক পেটানো হয়েছে, তাতে উত্তরকাণ্ড যে প্রক্ষিপ্ত, তা-ই আরও বেশি প্রমাণিত হচ্ছে।)

রামায়ণ—রাম-কথা। রামের জীবনী।
কিছুই জানি না। তবু ধরেছি লেখনী।
মনে সাধ—মেলে দিই কাহিনীর ডানা।
পাঠকের পাতে দিই রামায়ণ-কণা।
যত কথা লিখেছেন বাল্মীকি মুনি,
সংক্ষেপে বলা তাকে কঠিন, তা জানি।
তবুও সাহস করে নানা বই দেখে,
খেটেখুটে কোনও মতে দিলাম তো লিখে।
কেউ যদি খুশি হন, বড় পাই মান।
রামায়ণ—রাম-কথা। অমৃত সমান।

রামায়ণের জানা-অজানা

রামায়ণের বহু কৌতূহল-উদ্দীপক তথ্য, মূল রামায়ণ পড়ার সময়, মনে বেশ একটা আনন্দের রেশ রেখে যায়। অথচ, কিছুদিন পরেই, বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যায়, হারিয়ে যায়, সেই সব মহার্ঘ্য তথ্য।

সেইরকম কিছু তথ্যকে এক নজরে দেখে নিতে, বা দরকার মতো হাতের মুঠোয় পেতেই, নিবেদন করা হল এই জানা-অজানার দর্পণ।

এই বিশেষ অধ্যায়টি পাঠককে বিন্দুমাত্র তৃপ্ত করলে, এই পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

১। রামায়ণ বিশ্বের প্রথম কাব্য। এবং প্রথম মহাকাব্য। সম্ভবত যিশুর জন্মের এক হাজার বছরেরও আগে রচিত হয়েছিল রামায়ণ।

২। দেবর্ষি নারদের কাছে সংক্ষেপে রামকথা শুনেছিলেন মহর্ষি বাল্মীকি। ব্রহ্মার নির্দেশে যোগবলে বাকি কথা জেনে নিয়ে, বাল্মীকি যে রামচরিতকথা লিখলেন সুললিত ছন্দে, তা-ই 'রামায়ণ'।

৩। রামায়ণের শ্লোক-সংখ্যা চব্বিশ হাজার।

৪। সপ্তকাণ্ড রামায়ণের শেষ কাণ্ড, অর্থাৎ উত্তরকাণ্ড, বাল্মীকির লেখা নয় বলেই পণ্ডিতদের ধারণা। সম্ভবত, তা পরবর্তী কালে বাল্মীকির তুল্য প্রতিভাধর কবিদের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।

৫। দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াকে বলি দিয়েছিলেন কৌশল্যা। তারপর, সেই ঘোড়ার শবের পাশে শুয়ে এক রাত কাটিয়েছিলেন তিনি।

৬। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা ইত্যাদি রাজপরিবারের সকলেই সেকালের প্রথা মতো মাংস খেতেন। মদও খেতেন। তবে, অসংযমী ছিলেন না। সেকালের ক্ষত্রিয় সমাজে মদ-মাংস সকলেই খেতেন। এটা কোনও দোষের ব্যাপার ছিল না। এবং কেউ দোষও ধরতেন না।

৭। হনুমান বিশুদ্ধ সংস্কৃতে কথা বলতে পারতেন। সেই কারণেই, তাঁর বার্তাবহ হিসেবে হনুমানকেই নির্বাচিত করেছেন সুগ্রীব। রামের সঙ্গে প্রথম আলাপের সময়।

৮। অযোধ্যায় শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত নাট্যমঞ্চ ছিল। কী আশ্চর্য!

৯। পুষ্পক রথের যে বর্ণনা পাওয়া গেছে, এ যুগের বিমানের সঙ্গে তার সাদৃশ্য বিস্ময়কর।

বিমানে বেশ কয়েকটা ঘর ছিল। যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা ছিল একেবারে এ কালের মতো। সম্ভবত, রুপোর পাত দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল পুষ্পকের শরীর। জানালার পাশের আসন ছিল আকর্ষণীয়।

১০। পুষ্পক রথের (বিমানের) জ্বালানি ছিল পারদ। পারদকে তাপ দিয়ে বাষ্পে

পরিণত করা হত। সেই গরম পারদ-বাষ্প দিয়ে চালানো হত পুষ্পক। সোমরস (মদ) এবং খনিজ জৈব তেলও (পেট্রল?) জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হত।

১১। কৌশল্যা, কৈকেয়ী আর সুমিত্রা ছাড়াও, আরও সাড়ে তিনশো স্ত্রী ছিলেন দশরথের।

১২। মদ্যপান খুবই চলত। মেয়েরাও পান করতেন। বালীর স্ত্রী 'তারা' আকণ্ঠ মদ্যপান করতেন। রাজা হওয়ার পর, প্রমোদ কাননে সীতাকে কোলে বসিয়ে রাম নিজের হাতে করে পবিত্র 'মেরেয়' মদ, পান করিয়েছেন।

১৩। এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী তো ছিলই। এক স্ত্রীর একাধিক স্বামীও ছিল। প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার এক কন্যা তারার দুই স্বামী ছিলেন। বালী আর সুগ্রীব।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ মতে রাবণের মৃত্যুর পর, প্রচলিত সামাজিক রীতি মেনে, মন্দোদরীকে বিয়ে করেন বিভীষণ। বাল্মীকি অবশ্য এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

১৪। ভেষজ চিকিৎসা ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নতমানের ছিল। দশরথের ব্যক্তিগত চিকিৎসক মোটা মাইনে পেতেন। বানরবৈদ্য সুষেণ তো নামকরা চিকিৎসক ছিলেন।

১৫। ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা যথেষ্ট উন্নত ছিল। বানর-ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বকর্মার ছেলে নল, মাত্র পাঁচ দিনে, রামেশ্বর থেকে লঙ্কা পর্যন্ত একশো যোজন (৮০০ মাইল) লম্বা আর দশ যোজন (৮০ মাইল) চওড়া সেতু তৈরি করেন।

১৬। বালী আর সুগ্রীবের মা এবং বাবা ছিলেন একই ব্যক্তি। ঋক্ষরজা। নারী অবস্থায় দুই ছেলের জন্ম দিয়ে আবার পুরুষ হয়ে যান ঋক্ষরজা। (চরিত্রপঞ্জিতে 'ঋক্ষরজা' দেখুন)

১৭। হৈহয়রাজ সহস্রবাহু কার্তবীর্যার্জুনের সঙ্গে রাবণের লড়াই হয়েছিল। এবং রাবণকে বেধড়ক পিটিয়ে, পরে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন অর্জুন (কার্তবীর্যার্জুনের এক নাম ছিল অর্জুন)।

১৮। লক্ষ্মণ কখনও সীতার মুখ দেখেননি। শুধু পা দেখেছেন। দেওর বটে!

১৯। কৃত্তিবাস, তুলসীদাস ইত্যাদিরা বাল্মীকির মূল রামায়ণ থেকে অনেক সরে গিয়ে, নিজের নিজের মনের মতো করে রামকথা লিখেছেন।

(আমরা সম্পূর্ণভাবে বাল্মীকির রামায়ণকেই অনুসরণ করেছি।)

২০। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রধান ভাষাতেই রামায়ণ অনূদিত হয়েছে। এমন কী, মুসলমান, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী অনেক দেশেও রামায়ণ অত্যন্ত জনপ্রিয়।

২১। ভগবতী পার্বতীর বর ছিল, রাক্ষসীরা গর্ভধারণের সঙ্গে সঙ্গেই সন্তান প্রসব করবেন। আর শিশুও, জন্মেই যৌবন লাভ করবে। মার সমবয়সী হবে।

২২। রাক্ষসমাত্রই যে বিকটাকার ছিলেন, তা মোটেই নয়। রাক্ষসদের মধ্যে ডাকসাইটে সুন্দর-সুন্দরীও অনেকে ছিলেন। মন্দোদরী তো অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। সীতার খোঁজে লঙ্কায় গিয়ে, হনুমান প্রথমে ঘুমন্ত মন্দোদরীকেই সীতা বলে ভুল করেছিলেন।

২৩। রাবণ রোজ শিবপুজো করতেন। ইন্দ্রজিৎ রোজ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রতিষ্ঠিতা মা ভদ্রকালীর পুজো করতেন।

২৪। রামের রাজসভায় অনেক বিদূষক (ভাঁড়) ছিলেন। যেমন, বিজয়, মধুমত্ত, ভদ্র, দন্তবক্র, সুমাগধ ইত্যাদি। এঁরাই সীতা সম্পর্কে প্রজাদের অপবাদের কথা রামের

কানে তুলে রামের মনকে বিষিয়ে দিয়েছিলেন।

২৫। রাবণ বধের পর মন্দোদরীর ভাগ্যে কী ঘটেছিল, মহর্ষি বাল্মীকি তা জানাননি। কিন্তু, মহাকবি কৃত্তিবাস জানিয়েছেন, তখনকার প্রচলিত রাজতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে, মন্দোদরীকে বিয়ে করেছিলেন বিভীষণ।

২৬। রাম যখন সীতাকে বিয়ে করেন, তখন রামের বয়স বারো পেরিয়ে তেরো চলছে। সীতার ছয়।

২৭। ভরত রামের থেকে মাত্র এক দিনের ছোট ছিলেন। ভরতের থেকে মাত্র এক দিনের ছোট ছিলেন লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন।

২৮। দশরথের আদেশে বনবাসে সীতার ব্যবহারের জন্য সীতার সঙ্গে চোদ্দো বছরের জামাকাপড় দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। লক্ষ্মণ সে সব বয়ে বেড়িয়েছেন। সে সব নেওয়া হয়েছিল খুব সম্ভবত চামড়ার পেটিকায় (স্যুটকেসে)।

২৯। পণ্ডিতদের মতকে মর্যাদা দিয়ে উত্তরাকাণ্ডকে প্রক্ষিপ্ত বলে ধরে নিলে দেখা যায়, সীতার অগ্নিপরীক্ষা একবারই হয়েছিল। লঙ্কায়। সীতার নির্বাসন বা লব-কুশের কাহিনী বাল্মীকি লেখেননি। সে কাহিনী পরে কেউ জুড়ে দিয়েছেন।

৩০। রামের পরবর্তী চব্বিশতম পুরুষ অগ্নিবর্ণের মৃত্যুর পর, তাঁর স্ত্রী অযোধ্যার সিংহাসনে বসেন। তিনিই বিশ্বের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান।

৩১। রাম বিয়ে করেছেন ১৩ বছর বয়সে। বনে গেছেন ২৫ বছর বয়সে। ১৪ বছর বনবাসের পর ফিরে এসে রাজা হয়েছেন ৩৯ বছর বয়সে। রাজত্ব করেছেন ৩০ বছর ১ মাস ২০ দিন। সে হিসেবে, নরলীলা সাঙ্গ করার সময় রামের বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর ১ মাস ২০ দিন।

৩২। সরযূর জলে নরদেহ ত্যাগ করে বিষ্ণু-দেহে ফিরে যাওয়ার সময়, রামের সঙ্গে ভরত-শত্রুঘ্ন ছাড়াও, সুগ্রীবসহ বহু বানর, বহু রামভক্ত অযোধ্যাবাসী মানুষ, বহু রাক্ষস এবং অসংখ্য অন্যান্য প্রাণী সহমরণে যান।

ব্রহ্মা সমস্ত দেবদেবীদের সঙ্গে নিয়ে একশো কোটি দিব্য বিমান নিয়ে উপস্থিত ছিলেন রামকে স্বাগত জানাতে। দেবতাদের অবিরত পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে রাম 'রাম-দেহ' ছেড়ে ' বিষ্ণু-দেহে' প্রবেশ করলেন।

৩৩। কে কত বছর বেঁচেছিলেন?

আয়ুর এই হিসেব দেওয়া হয়েছে এখনকার বছরের মাপে। তখনকার 'এক বছর' আর এখনকার 'এক বছর' নিশ্চিতভাবে সমান নয়। তখনকার হিসেবে রাম এগারো হাজার বছর রাজত্ব করেছেন। এখনকার বছরের মাপে এই বিশাল রাজত্বকাল মেনে নেওয়া যায় না। তখনকার এক বছর=এখনকার এক দিন ধরলে, একটা গ্রহণযোগ্য সময়কাল (প্রায় ৩০ বছর) পাওয়া যায়।

ব্যক্তি	কত দিন বেঁচেছিলেন
ভরত	৬৯ বছর ১ মাস ২০ দিন
ভরত	৬৯ বছর ১ মাস ১৯ দিন
লক্ষ্মণ*	৬৯ বছর ১ মাস (প্রায়)
শত্রুঘ্ন	৬৯ বছর ১ মাস ১৮ দিন
সীতা	৪৫ বছর (প্রায়)

হনুমান	অমর
বিভীষণ	অমর
সুমন্ত্র	কমপক্ষে ১৩০ বছর।

*লক্ষ্মণ রামের কিছুদিন আগেই, সরযূর জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন।

৩৪। দশরথের মন্ত্রী এবং দূতরা—

(ক) দশরথের আট জন মন্ত্রী বা অমাত্য ছিলেন। তাঁরা হলেন—(১) ধৃষ্টি, (২) জয়ন্ত, (৩) বিজয়, (৪) সুরাষ্ট্র, (৫) রাষ্ট্রবর্ধন, (৬) অকোপ, (৭) ধর্মপাল এবং (৮) সুমন্ত্র।

(খ) দশরথের চার জন অতিবিশ্বস্ত দূত ছিলেন। দশরথের মৃত্যুর পর, ভরত-শত্রুঘ্নকে মামার বাড়ি থেকে ফিরিয়ে আনতে এঁরাই গিয়েছিলেন কেকয়রাজ্যে। এঁরা হলেন—(১) সিদ্ধার্থ, (২) বিজয়, (৩) জয়ন্ত এবং (৪) অশোকনন্দন।

৩৫। দশরথের পুরোহিতরা

দশরথের প্রধান পুরোহিত ছিলেন দু'জন। বশিষ্ঠ এবং বামদেব। এঁদের মধ্যে আবার বশিষ্ঠই ছিলেন দশরথের সুখ-দুঃখের পরম নির্ভর এবং বুদ্ধি-পরামর্শদাতা।

এ ছাড়াও, আরও ছ'জন ঋত্বিক ছিলেন, তাঁরা মহারাজকে নানা বিষয়ে সদুপদেশ এবং পরামর্শ দিতেন। এঁরা হলেন—(১) সুযজ্ঞ, (২) জাবালি, (৩) কাশ্যপ, (৪) গৌতম, (৫) মার্কণ্ডেয় এবং (৬) কাত্যায়ন।

৩৬। যজ্ঞের পায়েস কে কতটা পেয়েছিলেন?

প্রথম মত

রানি	মোট পায়েসের কত অংশ পেয়েছেন?
কৌশল্যা	১/২ অংশ
কৈকেয়ী	১/৮ অংশ
সুমিত্রা	৩/৮ অংশ

এই মতে, দশরথ প্রথমে মোট পায়েসের ১/২ অংশ দিয়েছেন প্রধানা মহিষী কৌশল্যাকে।

এরপর, বাকি ১/২ অংশের অর্ধেক, অর্থাৎ, মোট পায়েসের ১/৪ অংশ দিয়েছেন সুমিত্রাকে।

এরপর, অবশিষ্ট ১/৪ অংশের অর্ধেক, অর্থাৎ মোট পায়েসের ১/৮ অংশ দিয়েছেন কৈকেয়ীকে।

সবার শেষে, অবশিষ্ট ১/৮ অংশ আবার দিয়েছেন সুমিত্রাকে।

অর্থাৎ, সুমিত্রা মোট পেলেন ১/৪+১/৮=৩/৮ অংশ।

দ্বিতীয় মত

রানি	মোট পায়েস কত অংশ পেয়েছেন?
কৌশল্যা	৩/৮ অংশ

কৈকেয়ী	৩/৮ অংশ
সুমিত্রা	২/৮ অংশ (=১/৪ অংশ)

এ মতে, প্রথমে সুমিত্রা কিছুই পাননি। প্রথমে কৌশল্যা আর কৈকেয়ী দুজনেই পেয়েছেন ১/২ অংশ করে।

পরে, দুই রানি নিজের নিজের অংশের ১/৪ অংশ করে দিয়েছেন সুমিত্রাকে।

এর ফলে, কার্যত, কৌশল্যা পেলেন মোট পায়েসের ১/২—(১/২×১/৪)=(১/২—১/৮)=৪-১/৮=৩/৮ অংশ।

কৈকেয়ীও তাই পেয়েছেন। ৩/৮ অংশ।

সুমিত্রা পেয়েছেন=(১/২×১/৪+১/২×১/৪)=(১/৮+১/৮)=২/৮=১/৪ অংশ।

৩৭। রাবণের সৈন্যসংখ্যা ছিল দশ হাজার কোটি! (লঙ্কার লোকসংখ্যা তা হলে তখন কত ছিল? ১৯৯৬-তে সারা পৃথিবীর লোক সংখ্যাই যে ৫০০ কোটির কিছু বেশি!)

৩৮। রাবণের মন্দোদরী ছাড়াও, অসংখ্য স্ত্রী আর তাঁদের গর্ভজাত অসংখ্য সন্তান ছিল। দু-চার জন ছাড়া আর কারওই নাম জানা যায় না।

৩৯। বনে যাওয়ার সময় রাম গর্ভধারিণী-মা কৌশল্যা, দুই প্রধানা সৎ মা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা এবং সাড়ে তিনশো অপ্রধানা সৎ মার কাছে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিয়েছেন।

৪০। রাম-রাবণের যুদ্ধ চলেছিল প্রায় সতেরো-আঠারো দিন ধরে।

রাবণ মারা গেছেন পৌষের অমাবস্যায়। যুদ্ধ হয়েছিল শীতকালে। চান্দ্র পৌষ এবং সৌর মাঘে। সম্ভবত, পৌষের প্রথম সপ্তাহে (ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে) যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। শেষ হয়েছে, পৌষের চতুর্থ সপ্তাহে (জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে)।

৪১। রাবণ বধের সময় রামের বয়স ছিল ৩৮ বছর ১০ মাস। আর সীতার বয়স প্রায় ৩২ বছর।

৪২। সীতা প্রায় ১১ মাস লঙ্কায় বন্দিনী অবস্থায় কাটিয়েছেন।

৪৩। ভরতের প্রতিজ্ঞা ছিল, চোদ্দো বছরের বনবাসের শেষে রাম ফিরে না এলে, তিনি আগুনে আত্মাহুতি দেবেন।

৪৪। কৈকেয়ী বর না চাইলেও, সত্য রক্ষার্থে, দশরথকে ভরতকেই সিংহাসনে বসাতেই হত।

কৈকেয়ীকে বিয়ে করার সময় দশরথ কৈকেয়ীর বাবা অশ্বপতিকে কথা দিয়েছিলেন, যে, কৈকেয়ীর ছেলেকেই রাজা করা হবে।

(মহাভারতে, শান্তনুকে সত্যবতীর বাবা দাসরাজের দেওয়া শর্ত পূরণের সঙ্গে এর অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখতে পাচ্ছি।)

৪৫। সীতার বিয়ে হয়েছে ৬ বছর বয়সে। বনে যাওয়ার আগে স্বামীর ঘর করেছেন ১২ বছর। বনে গিয়েছেন ১৮ বছর বয়সে। বনে ছিলেন ১৪ বছর। তার মধ্যে, প্রায় ১১ মাস ছিলেন লঙ্কায়। বন থেকে ফিরেছেন ৩২ বছর বয়সে। এর পর ১ বছর স্বামীর সঙ্গে অযোধ্যায় কাটিয়েছেন। ৩৩ বছর বয়সে গর্ভবতী অবস্থায় নির্বাসনে গেছেন। মহর্ষি বাল্মীকি মুনির আশ্রমে। নির্বাসনে ছিলেন ১২ বছর। পাতালে প্রবেশ করেন

৪৫ বছর বয়সে।

৪৬। রাম-রাজত্বে প্রজারা পরম সুখে ছিলেন। অকালমৃত্যু ছিল না। রাম নিজে প্রজাদের অভাব-অভিযোগ শুনতেন। এমন কী, কুকুর, শকুনি বা পেঁচার মতো ইতর শ্রেণীর প্রাণীও নির্ভয়ে রামের দরবারে গিয়ে রামকে সরাসরি তাদের অভাব-অভিযোগ জানাতে পারত। প্রজাদের সন্তুষ্ট রাখতেই, রাম প্রাণসমা, প্রিয়তমা সীতাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন।

৪৭। কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রার দেহত্যাগ হয়েছে সীতার পাতাল-প্রবেশের অনেক পরে।

৪৮। হরধনু রাখা ছিল বিশাল এক লোহার সিন্দুকে। পাঁচ হাজার শক্তিশালী লোক আট চাকার এক গাড়িতে চাপিয়ে সেই সিন্দুক নিয়ে আসেন স্বয়ম্বর সভায়।

৪৯। বনবাসের শেষে রাজা হয়ে রাম লক্ষ্মণকেই যুবরাজ করতে চেয়েছিলেন। লক্ষ্মণ রাজি হননি। তখন রাম ভরতকে যুবরাজ করেন।

৫০। রাজ্যলাভের পর, রাম এগারো হাজার বছর রাজত্ব করেছিলেন বলে বলা হয়েছে। বাস্তব দৃষ্টিতে বিচার করলে মনে হয়, এগারো হাজার দিনকেই এগারো হাজার বছর বলা হয়েছে। এগারো হাজার দিন, অর্থাৎ প্রায় তিরিশ বছর, বিশ্বাসযোগ্য সময়।

বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে যেতে এলে, দশরথ তাঁকে নিজের বয়স বলেছেন ষাট হাজার বছর। আজকের পাঠকের কাছে এই সুদীর্ঘ আয়ু একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

৫১। বনবাসে যাওয়ার সময় সীতা গঙ্গার কাছে মানত করেছিলেন, রাম সুস্থ শরীরে চোদ্দো বছরের বনবাস কাটিয়ে অযোধ্যায় ফিরলে, সীতা গঙ্গাকে এক হাজার ঘট সুরা এবং মাংসমিশ্রিত অন্ন (বিরিয়ানি?) দিয়ে পুজো দেবেন।

৫২। রামের জন্ম হয়েছে, চৈত্রের শুক্লা নবমী তিথিতে। সৌর বৈশাখ মাসে। পুনর্বসু নক্ষত্রে।

৫৩। ভরতের জন্ম হয়েছে, চৈত্র মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে। পুষ্যা নক্ষত্রে।

৫৪। লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্নের জন্ম হয়েছে, চৈত্র মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে। অশ্লেষা নক্ষত্রে।

৫৫। রামদের চার ভাইয়ের নামকরণ করেন বশিষ্ঠ।

৫৬। রাম বেশ বড়সড় মাপের জুলপি রাখতেন। তাই তাঁর এক নাম 'কাকপক্ষধর' (কাকপক্ষ=জুলপি)।

৫৭। রামের সময়ে, অযোধ্যায় প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার নাম ছিল 'নিষ্ক'।

৫৮। রামের সময়ে ছোলা এবং মুগডাল খাওয়া এবং দান করার রেওয়াজ ছিল।

৫৯। ভরত রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য বনে যাওয়ার পথ তৈরি করতে 'সূত্রকর্মজ্ঞ' (জরিপ বিশেষজ্ঞ বা সার্ভেয়ার) নিয়োগ করেছিলেন।

৬০। চিত্রকূট থেকে রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনার শেষ চেষ্টা হিসেবে, নিজের দাবি আদায়ের জন্য ভরত রামের পর্ণকুটিরের সামনে 'ধরনা' দিয়েছেন। বিশ্বের ইতিহাসে দাবি আদায়ের জন্য সেই প্রথম 'ধরনা'।

গঙ্গা: জানা-অজানা

১। কপিল মুনি কেন সগরের ছেলেদের ভস্ম করলেন?

সগর রাজার স্ত্রী কেশিনী লাউয়ের মতো এক পিণ্ড প্রসব করলেন। সেই পিণ্ড ঘি-ভর্তি গরম পাত্রে রাখা হল। কালক্রমে তা থেকে ষাট হাজার দুঃসাহসী, বলবান, অত্যাচারী ছেলের জন্ম হল।

সগর একশো অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। এক শততম যজ্ঞের ঠিক আগে, ইন্দ্র ভয় পেয়ে যজ্ঞের ঘোড়াটাকে কপিলমুনির আশ্রমে লুকিয়ে রাখলেন।

সগরের অসংযমী ছেলেরা খুঁজতে খুঁজতে কপিলমুনির আশ্রমে এসে হাজির। তাঁরা মুনিকে চোর ভেবে, মুনির ওপর অত্যাচার শুরু করলেন। মুনি তাঁদের ভস্ম করে দিলেন।

সগরের নাতি অংশুমান অনেক পরে, কপিলমুনিকে তুষ্ট করে, যজ্ঞের ঘোড়া ফিরিয়ে নিয়ে যান, এবং যজ্ঞ শেষ করেন।

২। মহাদেব কেন গঙ্গাকে জটায় ধারণ করলেন?

অংশুমানের নাতি ভগীরথ ব্রহ্মার বরে গঙ্গাকে আনতে যান। কিন্তু, গঙ্গার বেগে পৃথিবী যে রসাতলে চলে যাবে! সে বেগ ধারণ করবেন কে?

সে বেগ ধারণ করতে পারেন একমাত্র মহাদেব। মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করলেন ভগীরথ।

গঙ্গা মহাদেবকে সুদ্ধু ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন পাতালে। মহাদেব শাস্তি দিলেন গঙ্গাকে। হাজার বছর গঙ্গাকে তাঁর জটায় আটকে রাখলেন। ভগীরথ আবার মহাদেবকে তুষ্ট করে গঙ্গাকে ছাড়ালেন।

৩। গঙ্গার নাম 'জাহ্নবী' হল কেন?

রাজর্ষি জহ্নুর যজ্ঞের উপকরণ ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন গঙ্গা। রাগে জহ্নু তাঁকে খেয়ে ফেললেন। ভগীরথ তাঁকেও তুষ্ট করে গঙ্গাকে মুক্ত করলেন।

কেউ বলেন, জহ্নু কান দিয়ে গঙ্গাকে বার করে দিয়েছিলেন। কেউ বলেন, জানু দিয়ে। সে যাই হোক, 'জহ্নু'র নাম অনুসারেই গঙ্গার নাম হল 'জাহ্নবী'।

৪। মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে স্নান করতে হয় কেন?

গঙ্গার স্পর্শে সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে প্রাণ ফিরে পেল। এই ঘটনার স্মরণে, প্রতি মকর সংক্রান্তি তিথিতে এখনও গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির আশ্রমে লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ, বিশ্বাসী ভক্তের সমাগম হয়।

এই মকর সংক্রান্তিতেই, মুক্ত হয়েছিলেন সগরের 'মহাপাপী' ষাট হাজার ছেলে। সেই মুক্তিকামনাতেই, এখনও প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে সাগর-সঙ্গমে স্নান করেন লক্ষ লক্ষ মানুষ।

৫। গঙ্গার এক নাম 'ভাগীরথী' হল কেন?

ভগীরথ গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে মর্তে এনেছিলেন। তাই গঙ্গার এক নাম 'ভাগীরথী'।

আরও তথ্যের জন্য 'ভগীরথ' দেখুন।

সমুদ্র-মন্থন

দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থনের কাহিনী নিয়ে আমাদের মনে কৌতূহলের সীমা নেই। সমুদ্রকে মন্থন করলে রত্নাকর উদ্গীরণ করবেন অমৃত। আর সেই অমৃত পান করে অমর হবেন। এই উদ্দেশ্য মাথায় নিয়েই দেবতা এবং অসুররা জোট বেঁধে সমুদ্রকে মন্থন করেছিলেন।

দুর্ভাগ্য অসুরদের। তাঁদের পরিশ্রম পণ্ডশ্রমই হয়েছিল। দেবতাদের কৌশলে, অমৃতের ভাগ তাঁরা পাননি। অমৃত পান করে অমর হয়েছেন দেবতারা।

সমুদ্রমন্থনের বহুশ্রুত কাহিনী ব্যাসদেব এক ভাবে বলেছেন মহাভারতে। রামায়ণে বাল্মীকির কলম থেকে এ কাহিনী বেরিয়ে এসেছে কিছুটা অন্য চেহারায়। দুই কাহিনীরই সংক্ষিপ্ত ভাষ্য আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে দিলাম পাঠকের পাতে।

রামায়ণে যেমন আছে

রামায়ণের বালকাণ্ডে পাচ্ছি সমুদ্র-মন্থনের বর্ণনা।

রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলায় চলেছেন বিশ্বামিত্র। পথে পড়ল অপূর্ব সুন্দর বিশালা নগরী। বিশালা সম্বন্ধে রামের কৌতূহল মেটাতে গিয়েই, সমুদ্র মন্থনের কাহিনী শোনাতে হল বিশ্বামিত্রকে।

বিশ্বামিত্র বললেন, 'আমি এ কাহিনী শুনেছি ইন্দ্রের কাছে। ভারী চমৎকার সে কাহিনী! শোনো তা হলে।' বলে বিশ্বামিত্র যে কাহিনী শোনালেন, তা মোটামুটি এইরকম—

"সত্যযুগের কোনও এক সময়ে, দেবতা এবং অসুর, দু' পক্ষই অমৃত পানের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কারণ, অমৃত পান করলে তাঁরা

(এক) অমর হতে পারবেন।

(দুই) জরাকে জয় করতে পারবেন।

(তিন) সুস্থ সবল দেহের অধিকারী হতে পারবেন।

"অমৃত কোথায় আছে?

"অমৃত আছে সমুদ্রের গর্ভে।

"কী ভাবে পাওয়া যাবে সেই অমৃত?

"মন্থন করতে হবে সমুদ্রকে। দুধকে মন্থন করলে যেমন দুধ থেকে মাখন বেরিয়ে আসে, তেমনই, সমুদ্রকেও মন্থন করলে, তার গর্ভ থেকে উঠে আসবে দেবাসুরের প্রার্থিত পানীয় 'অমৃত'।

"কাজেই, দেবতা এবং অসুররা মিলে শুরু করলেন সমুদ্র-মন্থন।

"কিন্তু, মন্থন করতে গেলে একটা 'মন্থন-দণ্ড' তো চাই, যাকে ডালের কাঁটার মতো ঘোরানো হবে। আর চাই একটা দড়ি। মন্থনদণ্ডের ওপর পাক লাগিয়ে, দড়ির দুই মাথা পর্যায়ক্রমে যে দুপাশ থেকে টেনে ঘোরানো হবে মন্থন দণ্ড।

"কিন্তু, অত বড় মন্থনদণ্ড কোথায় পাওয়া যাবে? ধরো মন্দর পর্বতকে। সে যদি মন্থনদণ্ডের কাজটা করে দিতে রাজি হয়।

“রাজি হলেন মন্দর পর্বত। রাজি হলেন মন্থন দণ্ড হতে।

“আর অত বড় দড়ি? দড়ি চাই যে একটা! নইলে মন্থন হবে কেমন করে? মস্ত দড়ি চাই। নাগরাজ বাসুকি বললেন, ‘আমি হব মন্থনের দড়ি।’

“এক হাজার বছর ধরে মন্থন চলল। মন্থনের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, বমি করতে শুরু করলেন বাসুকি। আর সেই বমির সঙ্গে উঠে এল সাঙ্ঘাতিক বিষ। ‘হলাহল’। যন্ত্রণায় মন্দরের পাথর কামড়ে ধরলেন বাসুকি।

“হলাহল ছড়িয়ে পড়তে লাগল সর্বত্র। প্রমাদ গুণলেন দেবতারা। মহাদেবের শরণ নিলেন তাঁরা। ভগবান বিষ্ণুও এলেন মহাদেবের কাছে।

“বিষ্ণু হাসতে হাসতে মহাদেবকে বললেন, ‘প্রভু! আপনি দেবাদিদেব! আপনি এই হলাহল গ্রহণ করে জগৎটাকে বাঁচান!’

“দেবতাদের অনুরোধে, হলাহল পান করলেন মহাদেব। বিষের ক্রিয়ায় মহাদেবের গলা নীল হয়ে গেল। মহাদেব হলেন ‘নীলকণ্ঠ’। নিশ্চিন্ত হলেন দেবতারা। তাঁরা আবার শুরু করলেন সমুদ্র-মন্থন।

“এ দিকে, মন্থনের জের সামলাতে না পেরে, মন্দর পর্বত ক্রমশ নামতে নামতে চলে গেলেন পাতালে। দেবতা আর গন্ধর্বরা ছুটলেন বিষ্ণুর কাছে। বললেন, ‘উপায় করুন প্রভু!’

“বিষ্ণু কূর্মরূপ ধারণ করলেন। চলে গেলেন পাতালে। পিঠের ওপর তুলে নিলেন মন্দরকে। আবার শুরু হল সাগর-মন্থন।

“আরও এক হাজার বছর ধরে চলল মন্থন। এবার দণ্ড আর আর কমণ্ডলু হাতে উঠে এলেন ‘ধন্বন্তরি’।

“ধন্বন্তরির পরেই, উঠে এলেন ষাট কোটি অসামান্যা সুন্দরী। ‘অপ্সরা’। তাঁদের সঙ্গে অসংখ্য পরিচারিকা।

“ক্ষীর-সমুদ্রের ‘অপ্’, অর্থাৎ জলের সার থেকে উঠে এসেছেন বলে, এঁদের নাম হল ‘অপ্সরা’। দেবাসুরের কেউই এঁদের গ্রহণ না করায়, এঁরা সাধারণ স্ত্রীলোকের পর্যায়েই রয়ে গেলেন।

“এরপর উঠে এলেন বরুণের মেয়ে। ‘বারুণী’। অর্থাৎ, সুরা বা মদ।

“বারুণী উঠেই বলতে লাগলেন, ‘আমাকে কে নেবেন? আমাকে কে নেবেন?’

“দেবতারা নিলেন সুরাকে। তাই তাঁরা হলেন ‘সুর’। আর দিতির ছেলেরা, অর্থাৎ দৈত্যরা, তাঁকে নিলেন না। তাই তাঁরা হলেন ‘অসুর’।

“সুরাকে পেয়ে এবং পান করে, দেবতারা বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠলেন।

“এর পর, সমুদ্র থেকে একে একে উঠে এল, ‘উচ্চৈঃশ্রবাঃ’ নামের ঘোড়া। আর ‘কৌস্তুভ’ নামের এক মণি।

“সবার শেষে, উঠে এল দেবাসুরের বহু আকাঙ্ক্ষিত ‘অমৃত’।

“অমৃতের অধিকার নিয়ে দেবাসুরের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই লেগে গেল। অসুররা সংখ্যায় কমে যাচ্ছেন দেখে, রাক্ষসদেরও নিলেন তাঁদের সঙ্গে।

“দেবতা, অসুর আর রাক্ষসরা যুদ্ধে ব্যস্ত। বিষ্ণু সেই ফাঁকে এক অসামান্যা সুন্দরী নারীর রূপ ধরে সরিয়ে ফেললেন অমৃত। রাক্ষস বা অসুরদের প্রায় কারও নজরেই সেটা এল না। যে দু-একজন বিষ্ণুর পেছু নিয়েছিলেন, বিষ্ণু তাঁদের পিষে মেরে

ফেললেন। দেবতাদের হাতে মারা গেলেন অসংখ্য অসুর।
যুদ্ধে জয়ী হয়ে, ইন্দ্র ত্রিলোকের রাজা হয়ে শাসন করতে লাগলেন।"

মহাভারতে যেমন আছে

মহাভারতের বর্ণনা অন্য রকম। সেখানে আদিপর্বে আমরা দেখতে পাচ্ছি, শৌনক সৌতির কাছে সমুদ্র-মন্থনের কাহিনী শুনতে চাইছেন। সৌতি বলছেন—

"একবার সুমেরু পর্বতের চূড়ায় বসে দেবতারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, কী ভাবে অমৃত পাওয়া যায়।

" বিষ্ণু বললেন ব্রহ্মাকে, 'দেবতা আর অসুররা মিলে একসঙ্গে সমুদ্র-মন্থন করুক। তা হলেই অমৃত উঠে আসবে।

"ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর আদেশ মাথা পেতে নিয়ে, নাগরাজ অনন্ত (বাসুকি) মন্দর পর্বতকে উপড়ে ফেললেন।

"অনন্ত আর মন্দরকে নিয়ে দেবতারা এলেন সমুদ্রের কাছে। বললেন, 'আমরা আপনাকে মন্থন করতে চাই।'

"সমুদ্র বললেন, 'দেখো বাপু! আমায় মন্থন করো, আপত্তি নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, এই মন্থনের জন্য আমার যে ভোগান্তির এক শেষ হবে, এটা তো মানো? কাজেই অমৃতের ভাগ যেন আমিও পাই।'

"সমুদ্রেই বাস করতেন কূর্মরাজ। দেবতাদের অনুরোধে, তিনি পিঠের ওপর তুলে নিলেন মন্দরকে। ইন্দ্র তাঁর বজ্র দিয়ে মন্দরের তলাটা বেশ মসৃণ করে দিলেন। যাতে কূর্মরাজের না লাগে।

"শুরু হল সমুদ্র-মন্থন।

" মন্থন-দণ্ড হলেন মন্দর। নাগরাজ বাসুকি হলেন মন্থন-রজ্জু।

"বাসুকিকে মন্দরের গায়ে জড়িয়ে তাঁর মুখের দিকটা ধরলেন অসুররা। আর লেজের দিকটা দেবতারা। মন্থন চলতে লাগল। পূর্ণোদ্যমে।

"বাসুকির মুখ থেকে ধোঁয়া আর আগুনের হল্কার সঙ্গে যে বায়ু বেরোতে লাগল, তা থেকে মেঘের সৃষ্টি হল। সেই মেঘ থেকে বৃষ্টির জল নেমে এসে দেবাসুরের দেহের ক্লান্তি অনেকটাই দূর করে দিল।

"মন্থনের ফলে সমুদ্রের গর্ভ থেকে মেঘের ডাকের মতো শব্দ ভেসে আসতে লাগল। অসংখ্য জলের প্রাণী পিষে গেল মন্দরের চাপে। তীরের গাছপালা একের পর এক উপড়ে পড়তে লাগল। গাছের ডালে ডালে আশ্রয় নেওয়া পাখিগুলো চাপা পড়ল গাছের তলায়।

"গাছে গাছে ঘষা লেগে দাবানলের সৃষ্টি হল। সেই দাবানলে, বনেব যত জন্তু, সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। ইন্দ্র মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরিয়ে সেই ভয়ানক আগুন নেবালেন।

"বড় বড় গাছের নির্যাস আর মহৌষধির রস এসে পড়তে লাগল সাগরে। অমৃততুল্য সেই সব নির্যাসের সঙ্গে সোনার রস (স্বর্ণ-সিন্দুর) মিশিয়ে খেয়ে অমরত্ব লাভ করলেন দেবতারা।

"নানা রসের মিশ্রণে সমুদ্রের জল পরিণত হল ক্ষীরে। সেই ক্ষীর বা দুধ থেকে

তৈরি হল ঘি।

"'কিন্তু অমৃত কোথায়?' হতাশ হলেন দেবতারা।

"ব্রহ্মা বসেছিলেন পদ্মাসনে। তাঁর কাছে এলেন হতোদ্যম দেবতারা। বললেন, 'ভগবান! কোন কালে আমরা মন্থন শুরু করেছি! সবাই একেবারেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি, ভগবান বিষ্ণু তথা নারায়ণকে বাদ দিয়ে এ কাজ হওয়ার নয়।'

"ব্রহ্মা নারায়ণকে বললেন, 'হে নারায়ণ! আপনি যদি এদের শক্তি না দেন, তা হলে এরা কী করে সফল হবে? আপনি ছাড়া যে এদের গতি নেই!'

"নারায়ণ স্মিত হেসে বললেন, 'দেবাসুর মিলে আবার সমুদ্র-মন্থন শুরু করুক। আমি সকলকে শক্তি দিচ্ছি।'

"নারায়ণ, অর্থাৎ, ভগবান বিষ্ণুর মুখের কথা শেষ হওয়া মাত্র, দেহে অসীম বল পেলেন দেবদানব সবাই। আবার নতুন উদ্যমে শুরু হল সাগর-মন্থন।

"এবার কাজ হল। প্রথমেই সাগর থেকে উঠে এলেন সৌম্যকান্তি 'চন্দ্র'। তারপরে ঘি থেকে উঠে এলেন সাদা পদ্মের ওপর বসা মা 'লক্ষ্মী' আর 'সুরা' দেবী।

"ঘি থেকেই উঠে এল 'উচ্চৈঃশ্রবাঃ' নামের এক দুধ-সাদা ঘোড়া।

"চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল 'কৌস্তুভ' মণি, ঘি থেকে উঠতেই, সোজা চলে গেল বিষ্ণুর বুকে।

"লক্ষ্মী, সুরা দেবী, চন্দ্র আর উচ্চৈঃশ্রবাঃ'—এঁদের সকলকেই নিলেন দেবতারা।

"অমৃতে ভরা সাদা কমণ্ডলু হাতে এবার উঠে এলেন ধন্বন্তরি।

'এ অমৃত আমার! এ অমৃত আমার!' বলে প্রচণ্ড চেঁচামেচি লাগিয়ে দিলেন দৈত্যরা।

"এর পর উঠে এল 'ঐরাবত' নামে চার দাঁত-ওয়ালা এক অতিকায় হাতি। ইন্দ্র বললেন, 'এ হাতি আমার!'

"অতি-মন্থনের ফলে এবার উঠে এল 'কালকূট' নামের ভয়ঙ্কর এক বিষ। সে বিষ সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল। সেই বিষের গন্ধ নাকে যেতেই, জ্ঞান হারালেন ত্রিলোকের যত প্রাণী।

"ভয় পেলেন ব্রহ্মা। ছুটলেন শিব তথা মহেশ্বরের কাছে। ব্রহ্মার অনুরোধে, সেই গরল পান করে ত্রিলোককে কালকূটের হাত থেকে বাঁচালেন মহেশ্বর। কালকূটের জ্বালায় শিবের গলা নীল হয়ে গেল। তাই তাঁর আর এক নাম হল 'নীলকণ্ঠ'।

"হতাশ দানবরা অমৃত আর লক্ষ্মীকে পাওয়ার জন্য দেবতাদের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া লাগিয়ে দিলেন।

"ভগবান বিষ্ণু এক অসামান্যা সুন্দরী নারীর রূপ ধরে, অসুরদের সামনে এসে মোহিনী মায়ায় তাঁদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেললেন। রূপ-লাবণ্যময়ী এক নারীকে দেখে অমৃতের কথা ভুলে গেলেন অসুররা। মোহাবিষ্টের মতো তাঁরা অমৃত তুলে দিলেন সেই নারীর হাতে।

"বিষ্ণু দেবতা আর দানবদের সার দিয়ে বসিয়ে দিলেন। তারপর, অমৃতের কমণ্ডলু থেকে শুধু দেবতাদের মুখে অমৃত ঢালতে লাগলেন। দানবরা রূপসীর রূপে তখন হাবুডুবু খাচ্ছেন। পরে, চেতনা হতেই, তাঁরা আক্রমণ করলেন দেবতাদের। বিষ্ণু সেই

ফাঁকে অমৃত নিয়ে পালালেন।

"দেবতারা যখন বিষ্ণুর ঢেলে দেওয়া অমৃত পান করছিলেন, তখন তাঁদের ফাঁকি দিয়ে, 'রাহু' নামে এক দানব দেবতা সেজে বসে পড়েছিলেন দেবতাদের পংক্তিতে। এমন কী, বিষ্ণুও রাহুকে দেবতা বলেই ভুল করেছিলেন। অমৃত ঢেলে দিয়েছিলেন রাহুর মুখে।

"হঠাৎ, চন্দ্র আর সূর্য চিনতে পারলেন রাহুকে। বিষ্ণুকে বললেন তাঁরা ব্যাপারটা। অমৃত তখনও রাহুর গলায়। পেটে যায়নি। বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে রাহুর মাথা কেটে ফেললেন। রাহুর মাথাটা গর্জন করতে করতে উঠে গেল আকাশে। আর মুণ্ডহীন ধড়টা পৃথিবী কাঁপিয়ে পড়ল মাটিতে।

"সেই থেকেই চন্দ্র আর সূর্যের ওপর রাহুর রাগ।

(প্রতিশোধ নিতে, প্রায়ই চন্দ্র আর সূর্যকে খেয়ে ফেলেন রাহু। কিন্তু, গলা কাটা বলে চন্দ্র বা সূর্য কিছুক্ষণ পরেই আবার মুক্ত হয়ে যান রাহুর গ্রাস থেকে। চন্দ্র বা সূর্যের গ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমরা জানি। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনীতে সে ব্যাখ্যা টেনে এনে রসভঙ্গ করতে চাই না।)

"এ-দিকে দেবাসুরের যুদ্ধ চলছে। বিষ্ণু আর থাকতে পারলেন না। মোহিনী নারীর বেশ ত্যাগ করে স্বমূর্তি ধারণ করলেন। যোগ দিলেন যুদ্ধে। গো-হারা হেরে, পালালেন অসুররা।

"সমুদ্র-মন্থনের জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করেও, এক ফোঁটাও অমৃত পেলেন না অসুররা। পুরোটাই পেলেন দেবতারা। স্রেফ বিষ্ণুর ক্ষুরধার বুদ্ধি আর অমিত শক্তিতে।"

পুষ্পক এবং অন্যান্য পৌরাণিক বিমান

পুষ্পক রথ/বিমান এবং অন্যান্য পৌরাণিক রথ বা বিমান সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল চিরকালের। এবং সে কৌতূহল, সন্দেহাতীতভাবেই, অদম্য।

সত্যিই কি সেকালে 'বিমান' বলে আদৌ কিছু ছিল?

যদি থেকেও থাকে, সে বিমান দেখতে কেমন ছিল? চলত কেমন করে? সে বিমানের জ্বালানি কী ছিল?

সে বিমানের সঙ্গে একালের বিমানের কোনও সাদৃশ্য আছে কি? থাকলে কতটুকু?

রামায়ণে বর্ণিত লঙ্কা-অযোধ্যা বিমানপথের সঙ্গে এ কালের কলম্বো (শ্রীলঙ্কার রাজধানী)—এলাহাবাদ বিমানপথের সাদৃশ্য সত্যিই কি বিস্ময়কর?

রামায়ণ ছাড়া আর কোনও ভারতীয় পৌরাণিক গ্রন্থে 'বিমান'-এর উল্লেখ পাওয়া যায় কি?

এই জাতীয় বেশ কিছু কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বিনম্র প্রয়াসে, শ্রদ্ধার সঙ্গে নিবেদিত হল এই বিশেষ অধ্যায়।

সীতাকে ফিরে পেয়েছেন রাম। লঙ্কার যুদ্ধ শেষ। এবার অযোধ্যায় ফেরার পালা।

বিভীষণ নিয়ে এলেন পুষ্পক বিমান বা রথ।

এই পুষ্পক প্রয়োজনে তীর-বেগে আকাশপথে উড়ে চলতে পারে। তার হাঁসের মতো ডানা দু'খানা মেলে।

রাবণ তো সীতাকে হরণ করে পঞ্চবটী থেকে লঙ্কা পর্যন্ত এসেছেন আকাশপথে। এই পুষ্পকে চড়েই।

পুরো পথ কিন্তু নয়। কারণ, মাঝপথে পুষ্পককে ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়েছেন জটায়ু।

পুষ্পক এমনিতেই খুব সুন্দর বিমান। হবেই তো। কুবেরের বিমান বলে কথা। ঐশ্বর্যের অধিপতি কুবের। তাঁর রথ কি আর যেমন তেমন হতে পারে? না হওয়া উচিত?

মণি-মুক্তো-হিরে-জহরত দিয়ে সাজানো তার গা। গা-টা তো পুরোটাই তৈরি রুপোর মতো উজ্জ্বল কোনও ধাতু দিয়ে।

রাবণ পুষ্পককে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন সৎ-দাদা কুবেরের কাছ থেকে।

বিভীষণ সেই পুষ্পককে আরও সাজিয়ে এনেছেন। রামকে উপহার হিসেবে দিচ্ছেন লঙ্কার গর্ব পুষ্পক-বিমান। দিচ্ছেন কৃতজ্ঞতার প্রতীক হিসেবে। তাই পুষ্পককে আরও মণিময়, আরও রত্নখচিত করা হয়েছে বিভীষণের আদেশে।

পুষ্পককে কিন্তু আমরা দেখেছি, বাল্মীকি বলেছেন, সীতাহরণের সময়ই জটায়ু ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন। পরে, তার টুকরোগুলোকে অন্যরা দেখতে পেয়েছেন। সে কথাও আছে। তা হলে? তা হলে কোন পুষ্পক রামকে লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় নিয়ে এল? একই নামে কি একাধিক বিমান ছিল? নাকি জটায়ুর ভেঙে দেওয়া পুষ্পকের টুকরোগুলোকেই পরে লঙ্কায় এনে জোড়া লাগাবার ব্যবস্থা করেছিলেন রাবণ?

প্রশ্ন থেকেই যায়।

সীতাকে কোলে নিয়ে পুষ্পকে উঠলেন রাম। পেছন পেছন রামের ছায়া লক্ষ্মণ। বিমানের ওপর থেকেই রাম বললেন, 'বানরবীররা! তোমরা বন্ধু হিসেবে আমার জন্য যা করেছ, তার তুলনা নেই। এখন তোমরা যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো।

'সুগ্রীব! তুমি স্নেহপরায়ণ এবং মঙ্গলকামীর মতোই কাজ করেছ। এবার তোমার সব সেনাদের নিয়ে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে যাও।

'বিভীষণ! এই লঙ্কা রাজ্য তো তোমাকেই দিয়েছি ভাই। যাও, তুমি নির্ভয়ে লঙ্কায় রাজত্ব করো। এবারে তোমাদের প্রিয় রামকে তোমরা অনুমতি দাও! আমি ফিরে যাই আমার শ্রদ্ধেয় পিতৃদেবের রাজধানী অযোধ্যায়। কতদিন যে দেখিনি অযোধ্যাকে!' বলতে বলতে ছল ছল করে উঠল রামের দু' চোখ।

বিভীষণ, সুগ্রীব আর আরও সবাই মিলে হাতজোড় করে বললেন, 'দোহাই রাম!

দয়া করে আমাদেরকেও আপনার সঙ্গে নিন। আমরা অযোধ্যায় আপনার অভিষেক দেখতে চাই। অভিষেক দেখে আমাদের জীবনকে সার্থক করে, রত্নগর্ভা মা-কৌশল্যাকে প্রণাম করে, আমরা যে যার জায়গায় ফিরে যাব।'

খুব খুশি হলেন রাম। বললেন, 'তবে আর দেরি কেন? এসো, এসো। চটজলদি রথে উঠে পড়ো। তাড়াতাড়ি বিমান না ছাড়লে, অযোধ্যায় তাড়াতাড়ি পৌঁছব কেমন করে?'

রামের কথা শেষ হওয়ার আগেই, সুগ্রীব, বিভীষণ আর তাঁদের যত বানর, ভল্লুক আর রাক্ষস সঙ্গীরা হুড়মুড় করে পুষ্পকে উঠে পড়লেন। উঠেই, পুষ্পকের 'খুব চওড়া' আর 'আরামদায়ক' আসনগুলো দখল করে নিলেন সবাই।

এত লোকের জায়গা হয়ে গেল বিমানে!

না। শুধু এই ক'জনই নয়। আমরা দেখব, এর পর আরও অনেক যাত্রী উঠেছেন পুষ্পকে।

তা হলে? তা হলে পুষ্পক কি একালের এয়ারবাসের মতোই ঢাউস মাপের বিমান ছিল? খুব সম্ভবত তা-ই। নইলে এত মানুষ বানর-ভল্লুক-রাক্ষস উঠে বসলেন বা দাঁড়ালেনই বা কোথায়?

এরপর, সেই 'হংসবাহিত' পুষ্পক রথ 'মহানাদে' আকাশে উঠল। বাল্মীকি লিখছেন।

এখানে একটু কথা থাকে। মহানাদ তো হবেই। এখনকার বিমানও আকাশে ওঠার সময় কানে তালা-লাগানো শব্দ করেই ওঠে। চলার সময় গগনভেদী বিকট শব্দের তরঙ্গ দশদিকে ছড়াতে ছড়াতেই চলে। কাজেই, এই 'মহানাদ' নিয়ে কোনও সংশয় নেই। সুতরাং কোনও প্রশ্নও নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে ওই 'হংসবাহিত' শব্দটি নিয়ে। পুষ্পককে কি তা হলে হাঁসে টানত?

যদি তা-ই হয়, তা হলে কত হাঁস? হাজার হাজার? নইলে মহানাদ করবে কে?

হাঁসে-টানা বিমানে নিশ্চয়ই তা হলে কোনও ইঞ্জিন ছিল না? যদি থাকে, তা হলে তাকে হাঁসে টানবে কেন? তা হলে ওই মহানাদ সৃষ্টি করল কে? হাজার হাজার হাঁসের 'প্যাঁক-প্যাঁক' ডাক? হংসধ্বনি?

হাঁসরা কি সবাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল?

না। মানতে পারলাম না। আমাদের ধারণা, পুষ্পকের বহিরঙ্গের গড়ন ছিল হাঁসের মতো। অথবা, তাতে অসংখ্য হাঁসের ছবি আঁকা ছিল।

যাই হোক, বাল্মীকি বলেছেন, পুষ্পক বিমানের সারা গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট ঘণ্টা লাগানো ছিল। নর্তকীর পায়ের নূপুরের মতো। মিষ্টি শব্দের তরঙ্গ চারপাশে ছড়িয়ে দিতে দিতে এগিয়ে যেত পুষ্পক।

কিন্তু, সে তো নূপুরের নিক্কণ! শিঞ্জিনী-ধ্বনি! তা তো আর মহানাদ নয়? বরং, মহানাদের তলায় তার চাপা পড়ে যাওয়ারই কথা।

তা হলে?

মহানাদের উৎস কোথায়?

আমাদের দৃঢ় ধারণা, পুষ্পকও যন্ত্রচালিত বিমানই ছিল। অন্যান্য পৌরাণিক বিমানও ঠিক যেমনটি ছিল। যন্ত্রচালিত।

কেমন ছিল অন্যান্য পৌরাণিক বিমান? ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে যে বিমানের কথা বলা হয়েছে, সেই বিমান—

(১) নভোমার্গে গমনশীল। অর্থাৎ, আকাশে উড়তে পারে।

(২) অনশ্ব। অর্থাৎ, অশ্ব বা ঘোড়া ছাড়াই চলে।

(৩) ত্রিচক্র। অর্থাৎ, তিন চাকাওয়ালা।

(৪) ত্রিস্তরবিশিষ্ট। তিনতলা।

(৫) দেবশিল্পী 'ঋভু'রা এই রথ তৈরি করতেন। অর্থাৎ, বিমান তৈরির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার বা কারিগর ছিলেন। এটাই তাঁদের জীবিকা ছিল। এবং এই জীবিকা যিনি গ্রহণ করতেন, তাঁকেই 'ঋভু' বলা হত।

(৬) অত্যন্ত বৃহৎ। অর্থাৎ, বিমানের আকার ছিল বিশাল। হতে পারে, এখনকার এয়ারবাসের মতোই।

(৭) ত্রিকোণ। অর্থাৎ, এই সব বিমান ছিল পাহাড়ের চুড়োর মতো। তিন-কোনা। অনেকটা আধুনিক রকেটের ধাঁচের।

(৮) অন্যূন তিনজন সারথি পরিচালিত। অর্থাৎ, বিমানের প্রধান চালক এবং তাঁর সহকারীদের নিয়ে মোট অন্তত তিনজন চালক থাকতেনই।

(৯) সোনা, রুপো বা লোহা—এই তিনটে ধাতুর যে কোনও একটা দিয়ে এই বিমানের শরীর তৈরি করা হত। অথবা, অন্য কিছু দিয়ে তৈরি করলেও, তার ওপর এমন প্রলেপ দেওয়া হত, যার ফলে, দেখলে মনে হত, বিমানটি ওই তিন ধাতুর যে কোনও একটি দিয়েই তৈরি।

(১০) বিমানে প্রবেশের দরজা বেশ শক্তপোক্তভাবে আটকানো হত।

(১১) তিনটে পাত্রে তরল মধু বা অন্য কোনও তরল নির্যাস রাখা থাকত। নীচে চতুর্থ একটা পাত্রে থাকত সোমরস।

সম্ভবত, এই তরল মধু বা সোমরস, বা অন্য কোনও কিছুর নির্যাস, বা এদের সবকটিই, জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হত।

জ্বালানি হিসেবে পারদ-বাষ্প, প্রাণিজ তেল, খনিজ তেল (পেট্রোলিয়াম?) ইত্যাদিরও উল্লেখ আছে। অন্যত্র।

এমনকী, সৌরশক্তি-চালিত বিমানের কথাও বলা হয়েছে।

ইন্দ্রের একটি বিমান চলত মন্ত্রশক্তিতে। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে এর উল্লেখ আছে।

(১২) সাধারণভাবে বিমানে তিন চালক ছাড়াও চার-পাঁচজন যাত্রী চাপতেন।

(১৩) 'ভুজ্যু' ডুবে যাচ্ছিলেন সমুদ্রে। সেই অসহায় ভুজ্যুকে উদ্ধার করে বিশেষ ধরনের এক বিমান (হেলিকপ্টার?)। সম্ভবত, সেই বিমান ছিল উভচর।

আমাদের দৃঢ় ধারণা, পুষ্পকও ছিল এমনই এক যন্ত্রচালিত বিমান। যাতে আগুন জ্বালিয়ে, বড় বড় পাত্রে রাখা মধু, সোমরস, অন্যান্য নির্যাস, প্রাণিজ তেল, খনিজ তেল বা পারদকে গরম করে, প্রচণ্ড শক্তিশালী বাষ্প তৈরি করা হত। আর সেই বাষ্পের শক্তিতেই চলত পুষ্পক। তার মহানাদের উৎসও সেখানেই।

ফিরে আসুন রামায়ণে। উঠে পড়ুন রামের পুষ্পক রথে।

জানালার ধার-ঘেঁষা একটা আসন দখল করুন। এবার চলুন। দেখা যাক, রাম আর

তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে পুষ্পক কোন পথে ফিরে এসেছিল লঙ্কা থেকে অযোধ্যায়।

শুধু কানটা একটু খাড়া রাখুন। শুনুন সীতাকে রামের দেওয়া যাত্রাপথের ধারাবিবরণী।

রাম সীতাকে কোলে নিয়ে বসেছেন। জানালার ধারের একটি আসনে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীচের দৃশ্য।

স্বামীকে বহু দিন পর সদ্য ফিরে পাওয়ার উত্তেজনার সঙ্গে স্বামীর কোলে বসে বিমানে ওড়ার অভিজ্ঞতা যোগ হওয়ায়, সীতা যেন কিছুটা চঞ্চল।

রাবণের সঙ্গে লঙ্কায় যাওয়ার সময় বিমানযাত্রার মজা উপভোগ করার মতো না ছিল তাঁর কোনও সুযোগ, না ছিল মানসিকতা।

রাম প্রাণসমা প্রিয়াকে যাত্রাপথের ধারাবিবরণী দিতে দিতে চলেছেন।

রাম বলছেন, 'ওই দেখো সীতা! ত্রিকূটপর্বতের মাথায় লঙ্কাপুরী (শ্রীলঙ্কা)! ওই দেখো! রক্তমাংসের কাদায় ভরা যুদ্ধক্ষেত্র! ওই যে সেতুটা দেখছ?—ওটা নল তৈরি করেছে। ওই সেতু বেয়েই তো আমরা লঙ্কায় এসেছিলাম। উঃ! মনে থাকবে এই সেতু তৈরির কথা। আমার জন্য কী পরিশ্রমটাই না করেছিল ওরা!

'ওই দেখো সীতা! সাগর! ঢেউগুলো দেখেছ? কী বিরাট! না? ওই দেখো মৈনাক পর্বত! ওই যে দেখা যাচ্ছে সেতুবন্ধ (রামেশ্বর)! ওখানেই মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন। ওই দেখো সীতা কিষ্কিন্ধ্যা (বেলারি জেলা, বিজয়নগরের কাছে)!'

'কিষ্কিন্ধ্যা!'

গদগদ হলেন সীতা। বললেন, 'সুগ্রীবের স্ত্রী "তারা" আর সব বানরবীরদের স্ত্রীদের আমি আপনার অভিষেকে উপস্থিত দেখতে চাই প্রভু! দয়া করে বিমানটাকে একটু কিষ্কিন্ধ্যায় নামাতে বলুন না!'

সীতার ইচ্ছে। এ দিকে, রামেরও সীতা-প্রেম তখন উথলে উঠেছে। কাজেই, পুষ্পক নামল কিষ্কিন্ধ্যায়। বানরীরা বেশ ভাল করে সেজেগুজে, মেক-আপ নিয়ে পুষ্পকে উঠলেন। পুষ্পক আবার ছুটল অযোধ্যার দিকে।

রাম বললেন, 'ওই দেখো সীতা! ঋষ্যমূক পর্বত (পূর্বঘাট আর নীলগিরির মাঝামাঝি)! ওই যে পম্পা সরোবর! যার তীরে শবরীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল! ওই যে জনস্থান (ঔরঙ্গাবাদ)! আর ওই যে দেখো পঞ্চবটী!'

'পঞ্চবটী!' লাফিয়ে উঠলেন সীতা।

'হ্যাঁ', রাম বলে চললেন, 'ওই যে আমাদের পর্ণকুটির! দুরাত্মা রাবণ ওখান থেকেই তোমাকে হরণ করেছিল। ওই দেখো, গোদাবরী! ওই অগস্ত্যমুনির আশ্রম! ওই শরভঙ্গ মুনির আশ্রম। ওই যে অত্রিমুনির আশ্রম! ওখানেই তুমি তাপসী অনসূয়াকে দেখেছিলে!

'ওই দেখো সীতা! ওই যে চিত্রকূট (চিত্রকোট, রামগিরি, কামতাপাহাড়, বুন্দেলখণ্ড)! ওখানেই ভরত এসেছিল আমাকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। ওই যে যমুনা নদী! চিনতে পারছ সীতা যমুনাকে? ওই তো ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম (প্রয়াগ, এলাহাবাদ)! আপাতত আমরা এখানেই নামব। মুনিবরকে প্রণাম করে, তাঁর কাছে অযোধ্যার সব কুশল সংবাদ নিয়ে তারপর অযোধ্যায় ফিরব।

'ওই যে গঙ্গা দেখতে পাচ্ছো সীতা? মনে পড়ে? বনবাসে যাওয়ার সময় গঙ্গার

কাছে কী মানসিক করেছিলে তুমি? তুমি বলেছিলে, আমি যদি চোদ্দো বছর বনবাসের শেষে ফিরে এসে আবার রাজ্য ফিরে পাই, তাহলে তুমি গঙ্গার তীরে সমস্ত তীর্থে, সব দেবালয়ে পুজো দেবে। গঙ্গাকে এক সহস্র ঘট সুরা (মদ) আর মাংস-মিশ্রিত পলান্ন (বিরিয়ানি?) দিয়ে পুজো দেবে। মনে আছে তো সে কথা?

'ওই যে দেখো শৃঙ্গবেরপুর! নিষাদরাজ গুহের রাজধানী।

'সীতা!' আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন রাম। বললেন, 'দেখো, দেখো সীতা! তুমি আবার তোমার প্রাণের অযোধ্যায় ফিরে এসেছ বৈদেহী! ওই যে দেখো, দূরে অযোধ্যা! দেখতে পাচ্ছ? দেখছ কী সীতা! প্রণাম করো! প্রণাম করো! দুহাত জোড় করে তোমার পুণ্যাত্মা শ্বশুরের ভিটেকে প্রণাম করো।'

রামের আদেশে পুষ্পক নামল ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে। এখান থেকে অযোধ্যা মাত্রই তিন যোজন (প্রায় ২৪ মাইল) দূরে। ভরদ্বাজ বললেন, 'আজকের রাতটা এখানেই থেকে যাও রাম। আজ পঞ্চমী। তোমার বনবাসের চোদ্দো বছর পূর্ণ হল। কাল ভোরে অযোধ্যার পথে রওয়ানা দিয়ো।'

রাজি হলেন রাম। খুশি মনেই। হনুমানকে পাঠালেন অযোধ্যায়। অযোধ্যার খবর নিতে। আর ভরতের মনের খবর নিতে। তাঁর ফিরে আসার খবরে ভরতের কী প্রতিক্রিয়া হয় তা জানতে। আঁচ করতে।

হনুমান ভরতকে রামের ফিরে আসার খবর দিতেই ভরত তো একেবারে যাকে বলে আহ্লাদে আটখানা। বুকে জড়িয়ে ধরলেন হনুমানকে।

হনুমান বললেন, 'কাল শুভ পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ। কাল সকালেই রাম আসছেন অযোধ্যায়।'

ভরতের আদেশে শত্রুঘ্ন রামের জন্য বিপুল সংবর্ধনার আয়োজন করে ফেললেন। তৎক্ষণাৎ। শত্রুঘ্নের আদেশে ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুমন্ত্র ইত্যাদি অযোধ্যার মন্ত্রীরা বিশাল বাহিনী নিয়ে চললেন রামকে স্বাগত জানাতে। কৌশল্যা আর সুমিত্রাকে সামনে রেখে চললেন কৈকেয়ী সহ দশরথের ৩৫১ জন বিধবা স্ত্রী। চললেন ব্রাহ্মণ, ছত্রধারী, মাল্যধারী আর স্তুতিগায়করা। ভরত সবার আগে। তাঁর মাথায় রামের পাদুকা। শঙ্খ আর ভেরীর শব্দে চারদিক নিনাদিত হল।

দেখা দিল রামের বিমান। 'ওই রাম!' বলে চেঁচিয়ে উঠল আমজনতা। বিমান থেকে নেমেই, ভরতকে জড়িয়ে ধরলেন রাম! এরপর সেই একান্ত বাঞ্ছিত দৃশ্য— আবেগ! অশ্রুপাত! ভরত রামের পায়ে রামের 'সেই পাদুকা' পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আজ আমি দায়মুক্ত হলাম!'

কৌশল্যাসহ সব মায়েদের প্রণাম করলেন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা। ভরত রামকে ধনাগার (ট্রেজারি) আর সেনা পরিদর্শন করিয়ে (গার্ড অব অনার?) নিয়ে এলেন তাঁর নন্দিগ্রামের আশ্রমে। যেখানে তিনিও এই চোদ্দো বছর ফল-মূল খেয়ে, চীর পরে, মাথায় জটা নিয়ে সন্ন্যাসীর মতোই জীবনধারণ করেছেন।

ভরতের আশ্রমে এসে পুষ্পককে ছেড়ে দিলেন রাম। বললেন, 'আমি আজ্ঞা দিচ্ছি। তুমি ফিরে গিয়ে তোমার প্রকৃত প্রভু কুবেরকেই সেবা করো।'

পুষ্পক ফিরে গেল উত্তরে। হিমালয়ে। কুবেরের প্রাসাদের দিকে।

কুবেরের আদেশে পুষ্পক অবশ্য আবার ফিরে এসেছিল রামের কাছেই। রাম

বলেছিলেন, 'এখন যাও। যখন ডাকব, এসো।'

এই হল মোটামুটি লঙ্কা থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত পুষ্পকের ওড়ার কাহিনী। যে-কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন বাল্মীকি স্বয়ং। বাল্মীকির বর্ণিত এই উড়ানপথের সঙ্গে এ কালের ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের কলম্বো-এলাহাবাদ উড়ানপথের সাদৃশ্য বিস্ময়কর। যদিও, এই উড়ান এখন পরিত্যক্ত। রাম আর রামায়ণকে রাজনীতির পাঁকে টেনে না এনে, আমরা বরং একটু গবেষণা করেই দেখি না, পৌরাণিক এ সব কাহিনী থেকে সমকাল এবং আগামীকালের কিছু নেওয়ার আছে কি না। তাতে সবারই মঙ্গল হবে।

লঙ্কা থেকে অযোধ্যা: পুষ্পকের উড়ানপথ: কালিদাসের বর্ণনায়

সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে সম্ভবত সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বিমানযাত্রার বর্ণনা শুনিয়েছেন কালিদাস। শুনিয়েছেন তাঁর 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে। ত্রয়োদশ সর্গে। সেই বাল্মীকির মতোই। রামের লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় ফেরার বর্ণনা। কিন্তু কালিদাসের রচনায় পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা (ডিটেইলিং) যেন আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য।

কালিদাস লিখছেন, রাম লঙ্কা থেকে সীতা, সুগ্রীব, বিভীষণ আর হনুমানকে নিয়ে আকাশপথে যাত্রা করলেন অযোধ্যার উদ্দেশে। আকাশ থেকে পুষ্পক বিমানের জানালা দিয়ে তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন উত্তাল সমুদ্রকে। তার বুকে ডুবে যাওয়া পর্বতকে। সামুদ্রিক প্রাণীদেরও দেখতে পেলেন। বিমান যতই ওপরে উঠছে, আর দূরে চলে যাচ্ছে, দূরের সমুদ্রের তটরেখা ততই গোল চাকার পরিধির মতোই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে, তটভূমি আর তার কাছের বনভূমি যেন হঠাৎ এক লাফে সমুদ্রের বুকে জেগে উঠেছে।

বিন্দু বিন্দু জলের কণায় ভরা মেঘের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় বিদ্যুতের ঝলকানি দেখছেন তাঁরা। সে বিদ্যুৎ অবশ্য বিমানের কোনও ক্ষতি না করেই, যেন তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

বিমান যখন দক্ষিণাপথ পার হচ্ছে, তখন বিমানের ছায়া এসে পড়ল শরভঙ্গ আশ্রমের ওপর। সেখানে যে সব মুনিরা তপস্যা করছিলেন, তাঁরা হঠাৎ এমন ছায়া এসে পড়ায় চমকে উঠেছেন। তাঁদের, আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার, যে তপস্যা, তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। মুনিরা বিরক্ত।

পুষ্পক এগিয়ে চলেছে অযোধ্যার দিকে। একে একে মাল্যবান (পূর্বঘাট) পর্বত, পম্পা সরোবর, গোদাবরী, জনস্থান, অগস্ত্য মুনির আশ্রম, ত্রিকূট পর্বত, গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম (প্রয়াগ, এলাহাবাদ) পার হয়ে উত্তরকোশলে মহামুনি এবং অযোধ্যার রাজ-পুরোহিত বশিষ্ঠের আশ্রমে এসে নামল পুষ্পক। বাল্মীকির বিমান নেমেছিল ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে। কালিদাসের বিমান নামল বশিষ্ঠের আশ্রমে।

সে যাই হোক, বিমান থেকে স্ফটিকের মতো উজ্জ্বল সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন রাম। তাঁকে পথ দেখালেন বিভীষণ। নামতে সাহায্য করলেন সুগ্রীব।

বশিষ্ঠকে প্রণাম করে রাম এলেন ভরতের আশ্রমে। ভরতকেও তুলে নিলেন

বিমানে। আমজনতা অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগল পুষ্পককে। তার চলাকে। আধ ক্রোশ (প্রায় এক মাইল) দূরেই অযোধ্যা। সেখানে এসে বিমান থেকে নেমে পড়লেন সবাই।

এই হল কালিদাসের বর্ণনায় রামের লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় ফেরার কাহিনী। চমৎকার! অবিশ্বাস্য! ভাবায়। ভাবতে বাধ্য করে। অবশ্যই, যিনি ভাবতে চান, তাঁকে। অন্যকে নয়।

পৌরাণিক বিমান: কিছু প্রশ্ন: সাধ্যমতো উত্তর

১। সত্যিই কি সেকালে 'বিমান' বলে আদৌ কিছু ছিল?

রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী কি নিছকই মহাকবিদের কল্পনা, না কি এর পেছনে কিছু সত্যঘটনাও লুকিয়ে আছে, এ-প্রশ্নের সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর আজও পাওয়া যায়নি। অদূর ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে বলে মনেও হয় না।

কবির কল্পনাই যদি হয়, তবে সে কল্পনার পাখির ডানায় পালক গুঁজতে হলেও, কবিকে বাস্তবের মাটিতে মাঝে-মধ্যে পা রাখতেই হয়। নইলে, বিভিন্ন সময়ে রচিত একাধিক গ্রন্থে একই ধরনের বর্ণনার পুনরাবৃত্তিকে সব সময় ব্যাখ্যা করা যায় না। 'বিমান'-এর উল্লেখ এবং আকাশযান হিসেবে তার ব্যবহারের বর্ণনা শুধু রামায়ণেই নয়, মহাভারতে এবং বেদেও আছে। আছে অনেক পরে রচিত কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে। এবং অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে আছে কালিদাসের 'রঘুবংশ' মহাকাব্যের ত্রয়োদশ সর্গে।

এই সব বিমানের সঙ্গে একালের বিমানের সাদৃশ্য এতই বিস্ময়কর, যে, পৌরাণিক যুগে 'বিমান' ব্যবহারের সম্ভাবনাকে আমরা একেবারে নস্যাৎ করে দিতে পারি না। বরং মেনে নিতে চাই।

২। সে কালের বিমান দেখতে কেমন ছিল?

পুষ্পক বিমানের যা বর্ণনা পাওয়া গেছে, তা থেকে বলা যায়, পাহাড়ের চুড়োর মতো তিন-কোনা ছিল সে বিমান। খুবই উঁচু ছিল পুষ্পক। রুপো অথবা রুপোর মতোই অত্যন্ত উজ্জ্বল কোনও ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল এর শরীর।

এর গায়ে হাঁসের ছবি আঁকা বা খোদাই করা ছিল। এর গায়ে নানারকম মণি-মাণিক্যের অলঙ্কার লাগিয়ে এর সৌন্দর্য বাড়ানো হয়েছিল। অনেক ছোট ছোট ঘণ্টা ঝোলানো ছিল পুষ্পকের গায়ে। যাতে পুষ্পক ওড়ার সময় তার ঘন্টার টুং টাং মিষ্টি শব্দে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে।

বিমানের ভেতরে বিভিন্ন তলায় ছোট ছোট অনেক ঘর ছিল। প্রতি ঘরে যাত্রীদের বসার জন্য অত্যন্ত রুচিসম্মত এবং বিলাসবহুল যথেষ্ট সংখ্যক আসন ছিল। বাইরের শোভা দেখার জন্য ছিল ছোট ছোট বেশ কিছু জানালা।

লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় ফেরার সময় এমনই এক জানালার পাশের আসনে সীতাকে কোলে নিয়ে বসেছিলেন রাম। জানালা দিয়ে সীতাকে বাইরের দৃশ্য দেখাতে দেখাতে আর প্রতিটি দৃশ্যবস্তু বা দর্শনীয় স্থানের ধারাবিবরণী দিতে দিতে লঙ্কা থেকে

অযোধ্যায় ফিরেছেন রাম।

৩। বিমান চলত কেমন করে?

জ্বালানী তরলের পাত্রের তলায় আগুন জ্বেলে তৈরি করা হত গরম বাষ্প। সেই বাষ্পের প্রচণ্ড চাপকে কাজে লাগিয়ে (নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রকে প্রয়োগ করে) বিমান চালানো হত। বিমানের ইঞ্জিন থেকে যে পথে বাষ্প নির্গত হত, বিমান ছুটত তার বিপরীত দিকে।

গতি কমাবার জন্য ব্যবহার করা হত অন্য একটি ইঞ্জিন। যার থেকে নির্গত বাষ্প ছুটত মূল ইঞ্জিন থেকে নির্গত বাষ্পের অভিমুখের বিপরীত দিকে। অর্থাৎ বিমানের গতির অভিমুখে। প্রতিক্রিয়ার বল বিমানের গতি কমিয়ে দিত।

চালক, তাঁর আসনে বসেই, চারপাশ দেখতে পেতেন। এবং ইঞ্জিনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। যত দূর মনে হয়, পুষ্পকে একাধিক মূল-ইঞ্জিন ছিল। ছিলেন একাধিক চালক। একাধিক সহকারি-চালক তো থাকতেনই।

প্রচণ্ড শব্দে আকাশে উঠত পুষ্পক। পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত সব বিমানই প্রচণ্ড শব্দে আকাশে উঠত। এমন শব্দ হত, যে, তা শুনে মত্ত হাতিও যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাত।

তবে রামায়ণে 'হংসবাহিত' পুষ্পকের উল্লেখও দেখতে পাচ্ছি। হাঁসে একটা অত বড় বিমান টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এবং তাকে নির্ধারিত জায়গায় নামাচ্ছে—এ বিশ্বাস করা শক্ত।

সম্ভবত, পুষ্পকের গায়ে অনেক হাঁসের ছবি ছিল। অথবা পুষ্পকের গড়নই হয়তো ছিল হাঁসের মতো।

বিমান চলাচলের জন্য কোনও 'দৌড়পথ' বা ' রানওয়ে' ব্যবহার করা হত কি না, জানি না। তবে, সম্ভবত, অন্যান্য পৌরাণিক বিমানের মতোই পুষ্পকেরও চাকা ছিল। এবং এ বিমানকে প্রয়োজন মতো জলে, স্থলে বা অন্তরীক্ষে চালানো যেত।

৪। পুষ্পকের জ্বালানি কী ছিল?

সম্ভবত, মধু, উদ্ভিজ্জ তেল, পারদ, এবং খনিজ তেল (পেট্রোলিয়াম?)।

৫। সেকালের বিমানের সঙ্গে একালের বিমানের কোনও সাদৃশ্য আছে কি? থাকলে তা কতটুকু?

বাইরের গঠনের দিক থেকে পুষ্পকের সঙ্গে একালের বিমানের সাদৃশ্য খুবই কম। বরং, একালের রকেটের সঙ্গে তার বাইরের চেহারার মিল অনেক বেশি।

তবে, ভেতরকার বসার ব্যবস্থার দিক থেকে সেকালের সঙ্গে একালের বিমানের বেশ মিল আছে। মিল আছে ইঞ্জিনের বাষ্প-উদ্‌গীরণের চাপকে কাজে লাগিয়ে বিমানকে গতি দেওয়ার মূলনীতিতেও।

৬। লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় রাম যে-পথে এসেছিলেন সেই পথের সঙ্গে এখনকার কলম্বো (শ্রীলঙ্কার রাজধানী)—এলাহাবাদ বিমানপথের সাদৃশ্য কি সত্যিই বিস্ময়কর?

হ্যাঁ। সত্যিই বিস্ময়কর!

লঙ্কা-রামেশ্বর-কিষ্কিন্ধ্যা (বেলারি জেলা, বিজয়নগরের কাছে)—ঋষ্যমূকপর্বত (পূর্বঘাট এবং নীলগিরি পর্বতের মধ্যবর্তী পর্বত)—জনস্থান (ঔরঙ্গাবাদ)—পঞ্চবটী

(নাসিক)—গোদাবরী—অগস্ত্যাশ্রম—শরভঙ্গ মুনির আশ্রম—অত্রি মুনির আশ্রম—চিত্রকূট (রামগিরি, চিত্রকোট, কামতা পাহাড়, বুন্দেলখণ্ড)—যমুনা—ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম (প্রয়াগ, এলাহাবাদ)—গঙ্গা—শৃঙ্গবেরপুর—অযোধ্যা—এই ছিল রামের লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় ফেরার পথ। মোটামুটি এই পথেই উড়েছিল পুষ্পক।

এ কালের কলম্বো-এলাহাবাদ উড়ানপথ কী রকম?

সে পথ হল, কলম্বো-মাদ্রাজ-বোম্বাই-নাগপুর-এলাহাবাদ। সে কালের প্রেক্ষাপটে এই উড়ানপথকে মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে লঙ্কা (কলম্বো)—রামেশ্বর (মাদুরা, তামিলনাড়ু)—পঞ্চবটী (নাসিক, মহারাষ্ট্র)—প্রয়াগ (এলাহাবাদ) উড়ানপথ। এই সাদৃশ্য সত্যিই বিস্ময়কর নয় কি?

বাল্মীকি মুনি, এবং পরবর্তিকালে কালিদাস, রামের লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের উড়ানপথের যে মানচিত্র নির্দেশ করেছেন, তা প্রায় অভিন্ন। দূরত্বের বিচারে, এই পথের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১৮০০ মাইল। অর্থাৎ, প্রায় ২৯০০ কিলোমিটার।

বনবাসের চোদ্দো বছর পূর্ণ হলে, চৈত্র মাসের শুক্লা-পঞ্চমী তিথিতে, ভোরবেলা, সূর্যোদয়ের পরেই, রাম-সীতাকে নিয়ে পুষ্পক অযোধ্যার উদ্দেশে যাত্রা করেছে।

মাঝে একবার কিষ্কিন্ধ্যায় (বেলারি জেলা, বিজয়নগরের কাছে) নেমেছিল পুষ্পক। সীতার ইচ্ছে মতো। সীতা চেয়েছিলেন, বানরবীরদের স্ত্রীদেরও সঙ্গে নিতে। যাতে, তাঁরাও অযোধ্যায় রামের রাজসিংহাসনে অভিষেকের উৎসবে যোগ দিতে পারেন।

এর পরই, বিমান নামে ভরদ্বাজ আশ্রমে (প্রয়াগ, এলাহাবাদ)।

বিমান যখন ভরদ্বাজ আশ্রমের ওপরে, তখন আকাশ থেকেই অযোধ্যাকে দেখতে পেয়ে সীতাকে অযোধ্যার উদ্দেশে প্রণাম জানাতে বলেছেন রাম। এটা খুবই বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা।

বেলা প্রায় দুটো নাগাদ পুষ্পক ভরদ্বাজ আশ্রমে পৌঁছেছে।

অর্থাৎ, লঙ্কা থেকে প্রয়াগে আসতে বিমান সময় নিয়েছে, প্রায় আট ঘন্টা। ভোর ছ'টায় যাত্রা শুরু। শেষ বেলা দুটোয়। মোট আট ঘণ্টার যাত্রা।

কিষ্কিন্ধ্যায় বানরীরা যে-রকম সাজগোজ করেছিলেন, তাতে মনে হয়, পুষ্পক অন্তত এক ঘন্টার মতো সেখানে দাঁড়িয়েছিল।

অর্থাৎ, লঙ্কা থেকে প্রয়াগ আসতে আকাশে উড়েছে প্রায় সাত ঘন্টার মতো। তখন লঙ্কা থেকে প্রয়াগের আকাশপথে দূরত্ব ছিল প্রায় ১৭০০ মাইল। অর্থাৎ, প্রায় ২৭৩৫ কিলোমিটার। কাজেই, পুষ্পকের গড় গতিবেগ ছিল ঘন্টায় প্রায় ২৪৩ মাইল, বা ঘন্টায় প্রায় ৩৯১ কিলোমিটার।

সে রাত, ভরদ্বাজ মুনির অনুরোধে, ভরদ্বাজ আশ্রমেই কাটান রাম।

পরদিন, অর্থাৎ, চৈত্র শুক্লা-ষষ্ঠীর দিন, সকালে ভরদ্বাজ আশ্রম থেকে পুষ্পকে চড়ে রাম আসেন তাঁর প্রাণের বন্ধু নিষাদরাজ গুহের রাজ্য শৃঙ্গবেরপুরে। সেখান থেকে, অযোধ্যার কাছেই, ভরতের অস্থায়ী রাজধানী নন্দিগ্রামে।

নন্দিগ্রামে এসে পুষ্পককে ছুটি দিয়ে দেন রাম।

বিভীষণ তাঁকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন এই পুষ্পক বিমান। কিন্তু রাম তা রাখতে চাননি। কারণ, তিনি জানতেন, এ বিমানের প্রকৃত মালিক কুবের। যাঁর কাছ

থেকে একসময় রাবণ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন এ বিমান। নীতিনিষ্ঠ রাম তাই পুষ্পককে কুবেরের কাছে ফিরে যেতে আদেশ দেন। পুষ্পকের বৈমানিকরা সে আদেশ নতমস্তকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেন।

পুষ্পকের গঠন, মূল কার্যনীতি এবং তার উড়ানপথের বর্ণনা থেকে তার অস্তিত্ব আমাদের কাছে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে, সন্দেহ নেই। এ বর্ণনাকে যদি নিছকই কবির কল্পনা বলে চালাতে হয়, তাহলে তো বলতেই হয়, জুল ভার্ন, আর্থার সি ক্লার্করা ব্যাস-বাল্মীকির কাছে নেহাতই শিশু। দূরদৃষ্টির ফিতেয়।

৭। রামায়ণ ছাড়া আর কোনও ভারতীয় পৌরাণিক গ্রন্থে 'বিমান'-এর উল্লেখ পাওয়া যায় কি?

হ্যাঁ। 'বিমান' সম্বন্ধে বিস্ময়কর এবং কৌতূহলোদ্দীপক প্রচুর কাহিনী এবং তথ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বেদে এবং মহাভারতে। পরবর্তী কালে কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে এবং 'রঘুবংশ' মহাকাব্যেও 'বিমান'-এর ব্যবহারের বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

ঋগ্বেদে 'বিমান'-কে 'রথ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যজুর্বেদ, তৈত্তিরীয়সংহিতা এবং শতপথব্রাহ্মণে বিমানকে 'বিমান' নামেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলে, বিমানকে আকাশে উড়তে, এবং ঘোড়া ছাড়াই চলতে সক্ষম তিন-চাকাওয়ালা তিন-তলা 'রথ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

অসহায় 'ভুজ্যু' যখন দূরের গভীর সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিলেন, তখন এই জাতীয় রথের (হেলিকপ্টার?) সাহায্যেই তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছিল। ভাবা যায়? কল্পনার দৌড়ের কথাই ভাবুন না।

মহাভারতের বনপর্বে পাচ্ছি, কৃষ্ণের সঙ্গে দৈত্যরাজ 'শাল্বে'র বিমানযুদ্ধের বিস্ময়কর বর্ণনা।

শাল্ব ছিলেন শিশুপালের বন্ধু। কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করায় প্রচণ্ড রেগে গেলেন শাল্ব। বললেন, 'এ পৃথিবীকে আমি যাদবহীন করব।' দ্বারকা আক্রমণ করলেন শাল্ব।

শাল্বর ছিল 'সৌভ' বা 'সৌভপুর' নামে এক যুদ্ধ-বিমান। সেই বিমান থেকে যাদবদের ওপর পাথর, বর্শা, তীর, ইত্যাদি ছুড়তে লাগলেন শাল্ব। কৃষ্ণ প্রথমে ছেলে প্রদ্যুম্নকে পাঠিয়েছিলেন যুদ্ধে। প্রদ্যুম্ন, শাম্ব ইত্যাদি কৃষ্ণপুত্রেরা সুবিধে করতে না পারায় কৃষ্ণ নিজেই গেলেন যুদ্ধে।

শাল্বের ছোড়া অস্ত্রের ঘায়ে জ্ঞান হারালেন কৃষ্ণ। জ্ঞান ফিরে পেয়ে, 'সৌভ' বিমান লক্ষ করে ছুড়ে মারলেন এক মহা-শক্তিশালী বিমান-বিধ্বংসী আগ্নেয়াস্ত্র।

শাল্ব বিমান নিয়ে নেমে পড়লেন সমুদ্রে।

এ থেকে মনে হয় 'সৌভ' উভচর বিমান ছিল।

আবার আকাশে উঠে এসে, যাদবদের ওপর আরও জোরদার আঘাত হানলেন শাল্ব।

এবার কৃষ্ণ ছুড়লেন তাঁর জগদ্বিখ্যাত 'সুদর্শন' চক্র। সুদর্শন 'সৌভ'-কে ধ্বংস করে আবার ফিরে এল কৃষ্ণের হাতে।

এ ক্ষেত্রে, সুদর্শনের ভূমিকা যেন ভূ-নিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক বিমান-বিধ্বংসী রকেট-বোমার মতো।

বিমান দু' টুকরো হলেও, শাল্ব মরলেন না। (সম্ভবত, ছত্রী সেনার মতো প্যারাসুটে করে নামছিলেন শাল্ব।) কৃষ্ণ আবার পাঠালেন সুদর্শনকে। এবার সুদর্শন শাল্বকে মেরে আগুনে পুড়িয়ে ফিরে এল তার প্রভুর কাছে।

রাজা 'উশীনর' 'মাধবী'কে বিয়ে করার পর এক 'বাতায়ন-বিমানে' চড়ে আকাশপথে প্রমোদভ্রমণ করেন। বাইরের দৃশ্য দেখার জন্য বিমানে একাধিক জানালা বা 'বাতায়ন' ছিল বলেই, মহাভারতে একে 'বাতায়ন-বিমান' বলা হয়েছে।

মহাভারতে 'হিরণ্যপুর' নামে এক 'মহাকাশনগরী'রও বিস্ময়কর বর্ণনা আছে। 'পুলোমা' আর 'কালকা' নামে দুই দৈত্যনারীর তপস্যায় খুশি হয়ে, উপহার হিসেবে ব্রহ্মা তাঁদের হাতে তুলে দেন এই 'হিরণ্যপুর' নগরী।

দৈত্যরা এই আকাশ-নগরী থেকে যথেচ্ছ আক্রমণ চালিয়ে দেবতাদের বিব্রত করত। ইন্দ্রের আদেশে অর্জুন প্রচণ্ড লড়াই করে এই অর্ধগোলাকার 'মহাকাশ-নগর'কে ধ্বংস করে ফেলেন।

রামের সঙ্গে সহমরণে যাবেন বলে যাঁরা সরযূর গোপ্রতার তীর্থে জড়ো হয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই ব্রহ্মার কথা মতো সরযূতে স্নানের পর, জ্যোতির্ময় দিব্য দেহ ধারণ করে ব্রহ্মার আনা বিমানে উঠে, ব্রহ্মলোকের কাছাকাছি 'সন্তানক' লোকে যান।

রামেরা চার ভাই বিষ্ণুদেহে মিশে যান। সুগ্রীব যান সূর্যমণ্ডলে। অন্যান্য বানর আর ভল্লুকরা তাঁদের স্রষ্টা দেবতার দেহে মিশে যান।

এ ছাড়াও, অশোকের শিলালিপিতে এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও 'বিমান'-এর উল্লেখ আছে।

কালিদাস তাঁর 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে ইন্দ্রের এক বিশেষ বিমানের কথা বলেছেন, যা মন্ত্রশক্তিতে চলত। 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে কালিদাস রামের লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় পুষ্পকবিমানে চেপে প্রত্যাবর্তনের এক পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন। তা আমরা দেখেছি।

কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে 'সৌভিক' নামে এক যন্ত্রবিদ্‌দের কথা শুনিয়েছেন। এই সৌভিকরা ছিলেন পুরুষানুক্রমে বিমান চালক। কৌটিল্য জল-স্থলের যুদ্ধের সঙ্গে আকাশযুদ্ধেরও বর্ণনা দিয়েছেন। অন্যান্য যুদ্ধের চেয়ে আকাশযুদ্ধ যে যোদ্ধার পক্ষে অনেক বেশি সুবিধাজনক, সে কথাও বলেছেন কৌটিল্য। কারণ হিসেবে কৌটিল্য বলেছেন, আকাশযোদ্ধা দিনে বা রাতে, যে কোনও সময়ই, যুদ্ধ করতে পারেন। এটাই অন্যদের তুলনায় তাঁর মস্ত সুবিধে।

১৯৪০ সালে দিল্লির সর্বধর্মপ্রতিনিধি-সভা 'বৈমানিকশাস্ত্র' নামে একটা বই প্রকাশ করেন। 'বিমানচালনাবিদ্যা'র ওপর লেখা। সংস্কৃত ভাষায়।

১৯৭৫ সালে মহীশূরের জোসিয়ার ইন্‌স্টিটিউট এই 'বৈমানিকশাস্ত্রে'র ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। বেশ ছবি-টবি দিয়ে।

'বৈমানিকশাস্ত্র' বইটিতে চার রকমের পৌরাণিক বিমানের যান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের কথা, আর কী ভাবে ওই সব বিমান তৈরি করতে হবে, তার কথা, ছবি-টবিসহ বেশ ভালভাবে বুঝিয়ে বলা হয়েছে।

এই চার রকম বিমান হল—

১) সুন্দর বিমান, ২) রুক্ম বিমান, ৩) ত্রিপুর বিমান আর ৪) শকুন বিমান।

'বৈমানিকশাস্ত্র' বিমানের মোট ৩৬টা অঙ্গের কথা বলেছে। এর মধ্যে অন্তত পাঁচ-ছটা অঙ্গ একেবারে হাল আমলের বিমানেও নেই।

জ্বালানি হিসেবে তরল পারদ বা কোনও প্রাণিজ বা খনিজ বা উদ্ভিজ্জ তেলের কথা বলা হয়েছে।

শকুন বিমানে তরল জ্বালানির পাত্রের মাপ বলা হয়েছে, প্রায় ৯.৫ ফুট × ৪ ফুট। অন্যান্য বিমানের জ্বালানি হিসেবে সৌরশক্তির কথা বলা হয়েছে।

গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজে একাদশ শতকের ভোজরাজের সঙ্কলিত 'সমরাঙ্গন সূত্রধার' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায়। এর ৩৩-তম অধ্যায়ে এক নভশ্চর বিমান তৈরির পদ্ধতির কথা সবিস্তার বলা আছে।

এই বিমানের চেহারা ছিল পাখির মতো। বিশাল। হালকা কাঠ দিয়ে তৈরি। চালকের আসন সামনে। ইঞ্জিন পেছনে। ইঞ্জিন বলতে, তরল পারদে ভরা চারটে পাত্র। প্রত্যেক পাত্রের তলায় আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা।

পারদ-বাষ্পের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিমান চলত। প্রচণ্ড শব্দ হত। এতই, যে, তা শুনে, মত্ত হাতিও ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে লেজ গুটিয়ে পালাত।

'সমরাঙ্গন-সূত্রধার' বলছেন, ব্রহ্মা আকাশপথে চলাফেরা করার জন্য পাঁচটা বিশেষ বিমান তৈরি করান। পাঁচটাই বিশাল। আর খুব সুন্দর।

এই পাঁচ বিমানের ধাঁচে পরে তেত্রিশজন দেবতার জন্য আরও তেত্রিশটি বিমান তৈরি করানো হয়। এই বিমানগুলো ছিল তিন-কোনা, চার-কোনা, আট-কোনা কিংবা পাখির মতো।

এই সব বিমানের অনুকরণে, পরবর্তিকালের ডাকসাইটে স্থপতিরা প্রাসাদ এবং দেবমন্দিরও তৈরি করেছেন। কারণ, ওই সব সুদর্শন বিমানের নকশা তাঁদেরকে মুগ্ধ করেছিল।

ভোজরাজের অন্য আর এক বই 'যুক্তিকল্পতরু'-তেও বিমানের কথা বলা আছে।

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে পালি ভাষায় লেখা 'পরমেত্থজোতিকা' বইতে একটা কাঠের বিমানের কথা আছে। আছে, সে বিমান কী ভাবে তৈরি করতে হবে, সে কথা।

আর আছে, অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং প্রায়-অবিশ্বাস্য এক ঘটনার কথা। ওই বিমান থেকে নাকি হিমালয়ের কোনও দুর্গম অঞ্চলে দুর্গতদের উদ্দেশে খাবার-দাবার ছুড়ে ফেলা হয়েছিল।

ভাবা যায়! ঠিক এ কালের হেলিকপ্টার থেকে দুর্গতদের উদ্দেশে খাবার ছুড়ে ফেলার মতো! একটু ভেবে দেখতে ইচ্ছে হয় না?

'সমরাঙ্গন সূত্রধার'-এর প্রাচীনতম যে পুঁথি পাওয়া গেছে, তা হল ১৬০০ শতকের। তাও মূল নয়। অনুলিপি। পাশ্চাত্যে রোজিয়ার (Rozier) এবং মার্কুইস এল অ্যানল্যান্ডস (Marquis L. Anlands) সর্বপ্রথম আকাশে ওড়ার যে প্রয়াস চালিয়েছিলেন, তার ২৫০ বছরেরও আগে লেখা হয়েছে 'সমরাঙ্গন সূত্রধার'-এর এই অনুলিপি। মূল গ্রন্থ তো একাদশ শতকেরও আগে লেখা।

আমাদের, ভারতবাসীদের, দুর্ভাগ্য, যে, আমাদের তৈরি কোনও পৌরাণিক বিমান বা তার ধ্বংসাবশেষ আমাদের ঐতিহ্যের হয়ে কথা বলার জন্য আজও আমাদের

চোখের সামনে এসে সশরীর ধরা দেয়নি।

আজ (১৯৯৫) থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে, মিশরের সাক্কারায় এক সমাধিক্ষেত্রে এক কাঠের বিমান পাওয়া গেছে। মিশর সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ এটিকে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের বিমান বলে দাবি করেছেন। খুব ইচ্ছে হয়, দেখে আসি একবার বিমানটাকে!

প্রাচীন ভারতের মানুষ যে বিমানের ব্যবহার জানতেন, এবং এ বিষয়ে তাঁরাই যে সারা পৃথিবীতে পথপ্রদর্শক ছিলেন, এ বিষয়ে একটি যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে আসতে, দেশের নানা প্রান্তে গবেষকরা কাজ করে চলেছেন। এ বিষয়ে বহু গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। হয়তো আরও হবে।

আমাদের বিশ্বাস, এইসব গবেষণার সিদ্ধান্ত অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতোই এ ক্ষেত্রেও, ভারতকে পথিকৃতের আসনে বসাবে। ভারতের রত্নখচিত মুকুটে গুঁজে দেবে আরও একটি স্বর্ণপালক।

এ কালের একজন লেখক যখন এক বিলাসবহুল জলযানের কথা লেখেন, তখন বোঝাই যায়, বিলাসবহুল না হলেও, 'জলযান' বলে যে কোনও বস্তু আছে, সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত।

তাঁর নায়িকা যখন নায়ককে বলে, 'দেখো! দেখো! পাখিটা কী সুন্দর! আর কী বিশাল!' তখন বোঝাই যায়, 'পাখি' বলে কোনও একটা প্রাণী আছে। যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে লেখক সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

'সুন্দর' আর 'বিশাল' শব্দ দুটোকে নিয়ে, তাঁর যথেচ্ছ কল্পনার রং মিশিয়ে, লেখক খেলা করতেই পারেন। সৃষ্টির মাধুর্যের প্রয়োজনে, 'সৌন্দর্য' আর 'বিশালত্ব' রবারের মতো নমনীয় হয়ে কমতে বাড়তেই পারে। সাহিত্য তাকে প্রশ্রয় দেবে। কিন্তু পাখির বাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলবেন না।

একই কথা পৌরাণিক বিমান সম্পর্কেও বলা যায় বোধ করি। কিছুই না দেখে, শুধুমাত্র কল্পনার খামখেয়ালি জগৎ থেকে, ব্যাস-বাল্মীকিরা এ রকম একটা বিস্ময়কর বর্ণনা দেন কী করে?

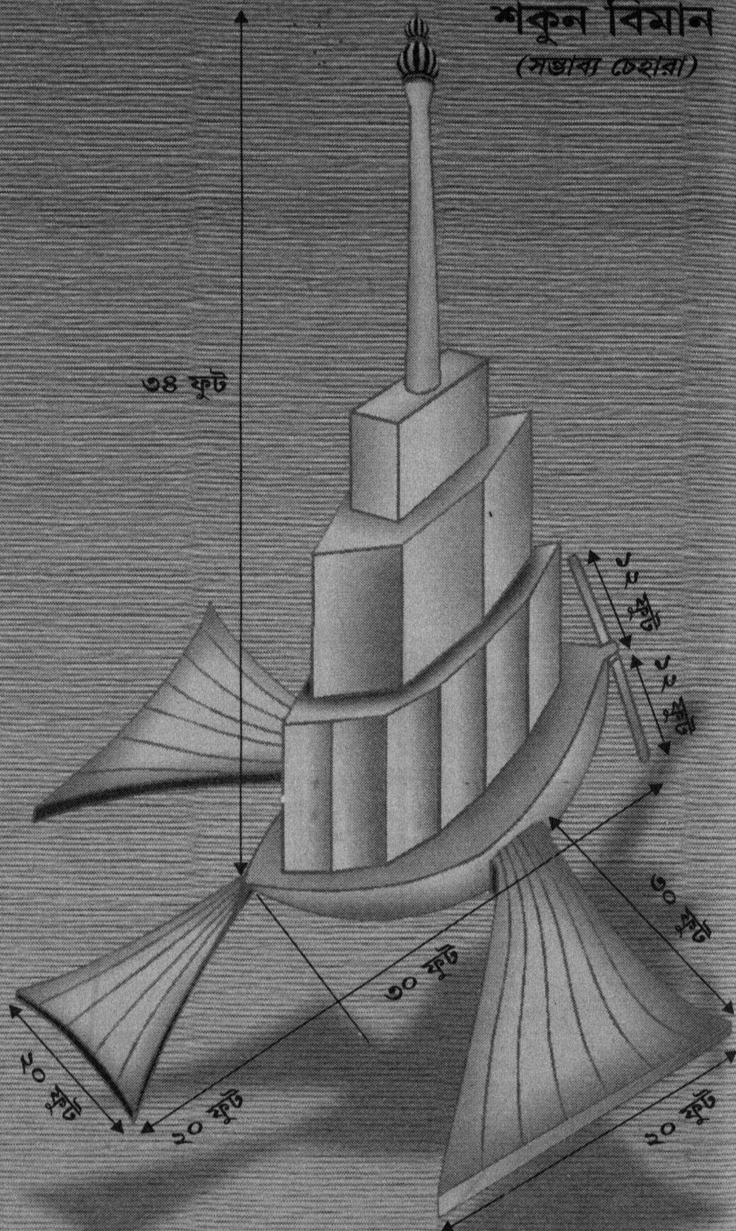
একজনের ভাবনাকেই অন্যরা অনুসরণ করেছেন, তাই বা মেনে নিই কী করে? যোগাযোগ ব্যবস্থা তখন কি এতই উন্নত মানের ছিল?

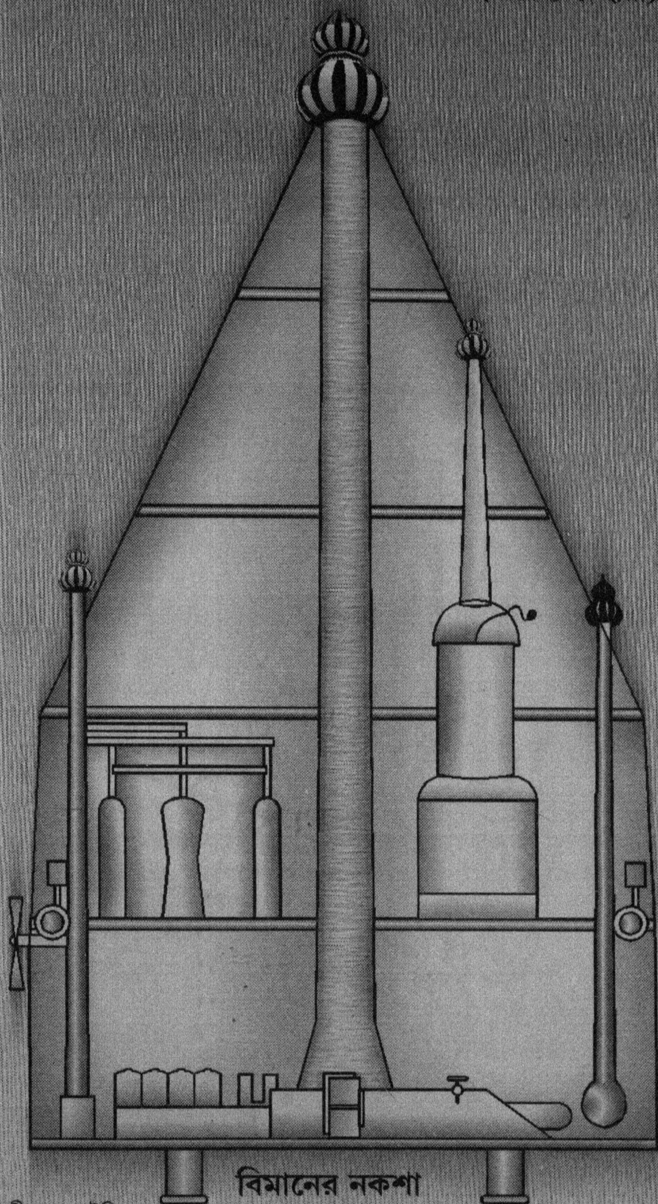
আমি পণ্ডিত নই। পণ্ডিতরা এ নিয়ে ভাবুন না।

এ কালের পৌরাণিক কাহিনীমাত্রকেই যাঁরা 'অলীক' আর 'অচ্ছুৎ' আখ্যা দেন, তাঁদের বাদ দিয়ে, অন্য সকলকে বলব, খোলা, সংস্কারমুক্ত, উদার মন নিয়ে, আসুন না, আমরা সবাই মিলে এই সব পৌরাণিক কাহিনীর খনিগুলোকে খুঁড়ি। পৌরাণিক উপাখ্যানের সাগরে যথার্থ অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে একবার ডুব দিই।

মণি-মুক্তো-হিরে-জহরত কিছু কিছু পেতেও তো পারি।

পেলেও তো পেতে পারি অরূপরতন!


শকুন বিমান
(সম্ভাব্য চেহারা)
৩৪ ফুট
৩০ ফুট
৩০ ফুট
২০ ফুট
২০ ফুট
২০ ফুট
বিমানের নকশা
চিত্রণ: নীলরতন মাইতি


সুন্দর বিমান
(সম্ভাব্য চেহারা)
বিমানের নকশা
চিত্রণ: নীলরতন মাইতি


লঙ্কা থেকে অযোধ্যা:
পুষ্পকের সম্ভাব্য
উড়ান-পথ
নন্দিগ্রাম
(অযোধ্যা,
ফয়জাবাদ)
শৃঙ্গবেরপুর
(এলাহাবাদের ১৮
মাইল উত্তর-পূর্ব
দিকে। গঙ্গার ধারে।)
যমুনা নদী
চিত্রকূট পর্বত
(রামগিরি, বুন্দেলখণ্ড)
গঙ্গা নদী
পঞ্চবটী (নাসিক)
ভরদ্বাজ আশ্রম
(প্রয়াগ, এলাহাবাদ)
শরভঙ্গ মুনির
আশ্রম
অগস্ত্যাশ্রম
(নাসিকের কাছে)
গোদাবরী নদী
জনস্থান
দণ্ডকারণ্য
তুঙ্গভদ্রা নদী
পম্পা সরোবর
কিষ্কিন্ধ্যা (বেলারি জেলা)
ঋষ্যমূক পর্বত
(পূর্বঘাট আর
নীলগিরির
মাঝামাঝি)
মাল্যবান পর্বত
সেতুবন্ধ
লঙ্কা থেকে অযোধ্যায়
ফেরার সময় রামের
উড়ান-পথ
রামেশ্বর
হিরণ্যনাভ পর্বত
পঞ্চবটী থেকে লঙ্কা:
সীতাকে হরণ করে নিয়ে
যাওয়ার সময় রাবণের পথ
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার
লঙ্কাপুরী (রাবণের রাজধানী)
চিত্রণ: নীলরতন মাইতি

রামায়ণ অভিধান

রামায়ণে বর্ণিত কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য চরিত্র/স্থান/নদী/পাহাড়/বন ইত্যাদি সম্বন্ধে যাতে এক নজরেই কিছু তথ্যের ওপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যায়, সেই একান্ত প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই, এই বিশেষ বর্ণানুক্রমিক চরিত্র/স্থান/নদী/পাহাড়/ বন ইত্যাদির পঞ্জির অবতারণা।

এ যুগ গতির যুগ। এ যুগের পাঠকের হাতে সময় কম। অথচ, জানার ইচ্ছে অদম্য। কৌতূহলী পাঠক তাঁর প্রয়োজনমাফিক তথ্যটুকু যাতে হাত বাড়ালেই পেতে পারেন, সে চেষ্টা করা হয়েছে। আন্তরিকভাবেই।

খুব সঙ্গত এবং বাস্তব কারণেই, সব চরিত্র/স্থান/নদী/পাহাড়/বন ইত্যাদিকে ঠাঁই করে দেওয়া গেল না আমাদের ছোট এই তরীতে।

এ অতৃপ্তি পাঠকের যতটা, লেখকের ততোধিক।

এর জন্য মার্জনা চাইলে, চাওয়াটা কি খুবই বেশি হয়ে যাবে?

অকম্পন: রাবণের মামা এবং সেনাপতি। সুমালী এবং কেতুমতীর ছেলে। কৈকসী বা নিকষার ভাই।

রামের হাতে দণ্ডকারণ্যে খর, দূষণ, ত্রিশিরা-সহ চোদ্দো হাজার রাক্ষস মারা গেলে অকম্পনই রাবণকে সীতাহরণের পরামর্শ দেন। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন, যে, সরাসরি যুদ্ধে রামকে হারানো যাবে না। যুদ্ধে হনুমানের ছোড়া গাছের আঘাতে এঁর মৃত্যু হয়।

আরও তথ্যের জন্য 'রাম', 'রাবণ' এবং 'হনুমান' দেখুন।

অক্ষ: রাবণ এবং মন্দোদরীর ছেলে।

অশোকবন তছনছ করার পর, রাবণের পাঠানো পাঁচ রাক্ষস-বীর সহ প্রায় আশি হাজার রাক্ষস হনুমানের হাতে মারা গেলে, রাবণ ছেলে অক্ষকে পাঠান হনুমানকে শায়েস্তা করতে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, অক্ষকেও প্রাণ দিতে হয় হনুমানের হাতে।

আরও তথ্যের জন্য 'রাবণ' এবং 'হনুমান' দেখুন।

অগস্ত্য: বৈদিক যুগের এক অত্যন্ত শক্তিশালী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

অগস্ত্য = অগ + স্তৈ (স্তম্ভিত করা)। পর্বতকে (বিন্ধ্য) যিনি স্তম্ভিত করেছেন।

মিত্র-বরুণের ছেলে (ঋক্‌বেদ মতে)। দৃঢ়স্যু-র বাবা। বিন্ধ্য পর্বতের গুরু। লোপামুদ্রার স্রষ্টা এবং স্বামী । বশিষ্ঠের ভাই।

ভাগবত মতে পুলস্ত্যের ছেলে।

মরীচি—কশ্যপ—সূর্য—অগস্ত্য।

কুম্ভে জন্ম। তাই এক নাম 'কুম্ভসম্ভব'। একই কারণে 'কুম্ভযোনি', 'কলসিসুত', 'ঘটোৎভব' ইত্যাদি নাম।

মিত্র-বরুণের ছেলে। তাই নাম 'মৈত্রাবরুণি'।

দেবতাদের অনুরোধে সমুদ্রকে পান করেছিলেন। তাই নাম 'পীতাব্ধি'।

দানব বাতাপিকে মেরেছিলেন। কৌশলে। তাই 'বাতাপিদ্বিট' নাম।

এঁর জন্মের মূলে উর্বশীর রূপ-যৌবন। তাই নাম 'উর্বশীয়'।

খুব তেজস্বী ছিলেন। তাই নাম 'আগ্নেয়'।

শিষ্য বিন্ধ্যকে মাথা নত করে থাকতে বাধ্য করেছিলেন। তাই 'বিন্ধ্যকূট'।

ছোটখাট চেহারার জন্য নাম 'মান'। অন্যান্য নাম—অগস্তি, আগ্নেয়, ঔর্বশীয়, অগ্নিমারুত।

আদিত্য যজ্ঞের সময় রূপযৌবনসম্পন্না উর্বশীকে দেখে মিত্র (সূর্য) এবং বরুণের বীর্যপাত হয়। সেই বীর্য এক কুম্ভে (কলসিতে) ধরে রাখা হয়। তা থেকেই জন্ম হয় বশিষ্ঠ আর অগস্ত্যের।

প্রথমে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, 'বিয়ে করব না'। পরে, পিতৃপুরুষদের অনুরোধে, তাঁদের উদ্ধারের জন্য, নিজেরই তপোবলে সৃষ্টি করা অসামান্যা রূপসী কন্যা লোপামুদ্রা-কে বিয়ে করেন। দৃঢ়স্যু বা ইধ্মবাহ বা দৃঢ়াস্য নামে তাঁদের এক ছেলে হয়। এই ছেলেই তাঁর পুর্বপুরুষদের উদ্ধার করেন।

সূর্য সুমেরু পর্বতকে প্রদক্ষিণ করেন। অথচ, বিন্ধ্য পর্বতকে করেন না। 'ঝগড়া লাগানোয় বিশেষজ্ঞ' নারদ এই মন্ত্রটি বিন্ধ্যর কানে দিলেন। বিন্ধ্য সূর্যকে বললেন, 'আমাকেও প্রদক্ষিণ করতে হবে।' সূর্য রাজি হলেন না। বিন্ধ্য মাথা উঁচু করে সূর্যের পথ আটকালেন। দেবতারা দেখলেন, মহা বিপদ। তাঁরা বিন্ধ্যের গুরু অগস্ত্যের শরণাপন্ন হলেন। অগস্ত্য গেলেন বিন্ধ্যের কাছে। বিন্ধ্য মাথা নত করে গুরুকে প্রণাম করলেন। অগস্ত্য বললেন, 'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত নতমস্তকেই থাকো।'

অগস্ত্য কিন্তু আর ফিরলেন না। সূর্যের পরিক্রমা নির্বিঘ্ন হল। ১-লা ভাদ্র যাত্রা করেছিলেন অগস্ত্য। তাই ১-লা ভাদ্রের যাত্রাকে 'অগস্ত্যযাত্রা' বলা হয়। পরবর্তী কালে, সব মাসেরই প্রথম দিনের যাত্রাকে 'অগস্ত্যযাত্রা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অসুররা সমুদ্রে লুকিয়ে থেকে দেবতাদের ওপর অত্যাচার চালাতেন। অগস্ত্য গোটা সমুদ্রকেই খেয়ে ফেলায়, অসুররা আর লুকিয়ে থাকতে পারলেন না। দেবতারা তাঁদের সহজেই বধ করলেন।

ব্রহ্মহত্যার পর ইন্দ্র যখন সমুদ্রে বাস করছিলেন, নহুষকে তখন স্বর্গের রাজা করা হয়। নহুষ ইন্দ্রের স্ত্রী শচী-কে পেতে চাইলে, বৃহস্পতির পরামর্শ মতো, শচী বললেন, 'নহুষ সপ্তর্ষির টানা রথে এলে, তবেই তাঁর গলায় মালা দেব।'

নহুষ সপ্তর্ষির টানা রথে যাওয়ার সময়, অগস্ত্যের গায়ে তাঁর পা লেগে যায়। অগস্ত্যের শাপে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি অজগর সাপ হয়ে পড়ে গেলেন। পরে যুধিষ্ঠিরের দর্শনে তাঁর শাপমুক্তি হয়।

রাম রাজা হওয়ার পর, কৌশিক, গার্গ্য, কণ্ব, ধৌম্য, অত্রি, কশ্যপ, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ ইত্যাদি মুনির সঙ্গে অগস্ত্যও এসেছেন রামকে অভিনন্দন জানাতে। রামকে বিস্মিত করে তাঁরা জানালেন, যে, রাবণ বা কুম্ভকর্ণবধের জন্য নয়, 'ইন্দ্রজিৎবধের জন্যই' তাঁরা রামকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

রাম এর কারণ জানতে চাইলে, অগস্ত্য রামকে শুনিয়েছেন একের পর এক অনেক

কাহিনী। কথা শেষ করে অগস্ত্য রামকে বললেন, 'হে রাম! তুমিই সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ! রাবণ তোমার হাতে মরতে চেয়েছিল। তাই সীতাকে হরণ করে তোমাকে উত্তেজিত করেছিল। যাতে তুমি তাকে বধ করে তার মনোবাসনা পূর্ণ করো।'

আরও তথ্যের জন্য 'রাম' দেখুন।

অগ্নিকেতু: রাবণের এক সেনাপতি। লঙ্কার যুদ্ধে রামের হাতে নিহত।

অগ্নিবর্ণ: রামের পরবর্তী চব্বিশতম বংশধর তথা উত্তরপুরুষ।

ব্যভিচারী অগ্নিবর্ণ ভোগসুখে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সহধর্মিণীকেই রাজ্য শাসনের ভার দেওয়া হয়। সম্ভবত, তিনিই (অগ্নিবর্ণের স্ত্রী) বিশ্বের প্রথম 'নারী-রাষ্ট্রপ্রধান' ছিলেন।

অঙ্গদ: তারার গর্ভজাত বালীর ছেলে।

বাবার মতোই বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং মহাবীর। রামভক্ত। কাকা সুগ্রীবকে মন থেকে শ্রদ্ধা করতে পারেননি অঙ্গদ।

অঙ্গদই সম্পাতির কাছে সীতার সুলুক-সন্ধান পান। অঙ্গদ নিজেই সমুদ্র পার হতে পারতেন। কিন্তু ফেরা সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। সে কারণে, জাম্ববান তাঁকে যেতে দেননি।

রামের দূত হিসেবে অঙ্গদ গেছেন রাবণের সভায়। রামের কথা কড়া ভাষায় শোনালেন তিনি রাবণকে। রাবণ অঙ্গদকে ধরার আদেশ দিলেন। চার বীর অঙ্গদকে ধরলে, তাদের নিয়েই অঙ্গদ আকাশে লাফ দিয়ে উঠলেন। ঝেড়ে ফেলে দিলেন চার বীর রাক্ষসকে । রাবণের প্রাসাদের চূড়া ভেঙে দিলেন।

যুদ্ধে অঙ্গদের হাতে হার স্বীকার করে একবার পালাতে হয়েছিল ইন্দ্রজিৎকে। বজ্রদংষ্ট্র, মহাপার্শ্ব, নরান্তক, কম্পন, প্রজঙ্ঘ, মহাপার্শ্ব (২) [ইনি রাবণের সৎ ভাই মহাপার্শ্ব (১) নন। রাবণের অমাত্য মহাপার্শ্ব (২)] ইত্যাদি মহা মহা বীররা মারা গেছেন অঙ্গদের হাতে।

সীতাউদ্ধারের পর, রামের সঙ্গে অঙ্গদও গিয়েছেন অযোধ্যায়। রাজ্যাভিষেকের পর রাম অঙ্গদকে কোলে বসিয়ে নিজের গা থেকে নানা মূল্যবান অলঙ্কার খুলে পরিয়ে দিয়েছেন তাঁকে।

রামের সঙ্গে সহমরণে যাওয়ার উদ্দেশ্যে অযোধ্যায় রওয়ানা হওয়ার সময় সুগ্রীব যুবরাজ অঙ্গদকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করে যান।

আরও তথ্যের জন্য 'রাম', 'বালী', 'সুগ্রীব', মহাপার্শ্ব (২) এবং 'রাবণ' দেখুন।

অঙ্গদ-চন্দ্রকেতু: লক্ষ্মণ এবং ঊর্মিলার দুই ছেলে। অঙ্গদ পরে হিমালয় অঞ্চলের 'কারুপথ' দেশের রাজা হন। তাঁর রাজধানীর নাম 'অঙ্গদীয়া'। আর চন্দ্রকেতু রাজা হন 'চন্দ্রকান্ত' দেশের। তাঁর রাজধানীর নাম 'চন্দ্রকান্তা'।

আরও তথ্যের জন্য 'রাম' দেখুন।

অজ: রামের ঠাকুরদা। দশরথের বাবা। রঘুর ছেলে। ইন্দুমতীর স্বামী।

ইন্দুমতী ছিলেন বিদর্ভ রাজের শাপভ্রষ্টা মেয়ে। তাঁর স্বয়ম্বর সভায় যাওয়ার পথে, এক হাতি আক্রমণ করে অজকে। হাতিকে আঘাত করা হলে তার শরীর থেকে এক রূপবান শাপভ্রষ্ট গন্ধর্ব বেরিয়ে আসে। তার নাম প্রিয়ম্বদ। সে 'সম্মোহন' নামে এক বাণ দেয় অজকে। এই 'সম্মোহন' বাণকে কাজে লাগিয়েই, ইন্দুমতীকে জিতে নেন অজ।

ইন্দুমতী দেহত্যাগ করলে, অজও ছেলে দশরথের হাতে রাজ্যভার দিয়ে স্বর্গারোহণ করেন।

অঞ্জনা: শাপগ্রস্তা অপ্সরা।

হনুমানের মা। কুঞ্জরের মেয়ে। বানররাজ কেশরীর স্ত্রী।

অপ্সরা 'পুঞ্জিকস্থলা' এক ঋষির শাপে বানরী অঞ্জনা হয়ে জন্মান।

একদিন। মানুষ সেজে অঞ্জনা পাহাড়ের চূড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে পবনদেব কামাসক্ত হলেন। অঞ্জনার সতীত্ব নষ্ট না করে, শুধু অঞ্জনাকে স্পর্শ করলেন পবনদেব। তাতেই, অঞ্জনার গর্ভে হনুমানের জন্ম হল।

আরও তথ্যের জন্য 'হনুমান' 'কুঞ্জর', 'কেশরী' এবং 'পুঞ্জিকস্থলা' দেখুন।

অতিকায়: রাবণের ছেলে। বিশাল চেহারার জন্য এই নাম।

ব্রহ্মার বরে দেবাসুরের অবধ্য ছিলেন। ইন্দ্রের বজ্র আর বরুণের পাশকে আটকে দিয়েছিলেন। রামের হাতে প্রাণ দেন।

'রাম' দেখুন।

অতিবলা: ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারক অত্যন্ত শক্তিশালী এক মন্ত্র। এই মন্ত্র জপলে রাক্ষসরা কোনও ক্ষতি করতে পারত না। খিদে পেত না। তৃষ্ণা হত না। 'তাড়কা-মারীচ-সুবাহু' প্রমুখ রাক্ষস-রাক্ষসীদের শায়েস্তা করতে বিশ্বামিত্র রামকে যখন তাঁর আশ্রমে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই রামকে অত্যন্ত শক্তিশালী 'বলা' আর অতিবলা'— এই দুই মন্ত্র শিখিয়ে দেন।

'রাম' এবং 'বিশ্বামিত্র' দেখুন।

অদৃশ্যন্তী: বশিষ্ঠের পুত্রবধূ। শক্ত্রির স্ত্রী। পরাশরের মা। মহাভারতের সত্যবতীর শাশুড়ি।

অনরণ্য: সূর্যবংশের এক রাজা।

সম্ভূতের ছেলে। রামের পূর্বপুরুষ।

রাবণ অযোধ্যা আক্রমণ করলে, ইনি রাবণের বশ্যতা স্বীকার না করে, রাবণের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে রাবণের উদ্দেশে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'আমার বংশেই জন্মাবেন রাম। আর রামের হাতেই হবে তোমার মরণ।'

অনসূয়া: এক অত্যন্ত সতী-সাধ্বী মহীয়সী নারী। অত্রি মুনির স্ত্রী। প্রজাপতি দক্ষ এবং প্রসূতির মেয়ে। শিবের স্ত্রী। সতীর দিদি। দত্তাত্রেয়, দুর্বাসা এবং চন্দ্রের মা।

কোনও 'অসূয়া' (ঈর্ষা) ছিল না। তাই 'অনসূয়া'।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর একবার অনসূয়ার সতীত্বের পরীক্ষা নিতে তাঁর অতিথি

হলেন। বললেন, 'তোমার ছেলের মতো করে আমাদের সেবা করো।'

অনসূয়া অত্রির পা-ধোয়া জল ছিটিয়ে দিলেন তিন দেবতার গায়ে। আর বললেন, 'বালো ভব!' অর্থাৎ শিশু হও। অনসূয়ার স্তন থেকে দুধের ধারা প্রবাহিত হল। তিন দেবতা তা পান করে খুবই খুশি । অনসূয়া তাঁদেরকে সত্যি সত্যিই ছেলে হিসেবে পেতে চাইলেন।

দেবতারা বললেন, 'তথাস্তু'।

সেই মতো ব্রহ্মার অংশে চন্দ্র বা সোম, বিষ্ণুর অংশে দত্তাত্রেয় আর মহেশ্বরের অংশে দুর্বাসার জন্ম হল।

বনবাসকালে লক্ষ্মণ আর সীতাকে নিয়ে রাম চিত্রকূটে অত্রির আশ্রমে এলে, অনসূয়া তাঁদের খুব আদর যত্ন করেন। সীতাকে অনেক দিব্য মালা, শাড়ি, গয়না, সুগন্ধি (সেন্ট) ইত্যাদি দিয়েছিলেন অনসূয়া।

'রাম' এবং 'সীতা' দেখুন।

অন্ধক: এক অন্ধ মুনি।

এঁর স্ত্রীও অন্ধ ছিলেন। এঁদের ছেলে তৃষ্ণার্ত মা-বাবার জন্য এক রাতে সরযূতে জল আনতে গিয়েছিল। আচমকা-ছুটে-আসা দশরথের তীরে বিদ্ধ হয়ে মারা যায়। দশরথ ভেবেছিলেন, বন্য হরিণ বুঝি জল খাচ্ছে। তাই শব্দভেদী বাণ ছুড়েছিলেন। অন্ধমুনির অভিশাপেই, পুত্রশোকে প্রাণ দিতে হয় দশরথকে।

'দশরথ' দেখুন।

অযোধ্যা: রামের রাজ্য উত্তর কোশলের রাজধানী।

সরযূ নদীর তীরে এক মনোরম সমৃদ্ধ নগর। মনু নিজের হাতে করে তৈরি করেছেন অযোধ্যাকে।

অযোধ্যা মাপে এত বিশাল ছিল, যে, একেই এক রাজ্য বলা হত। লম্বায় বারো যোজন (৯৬ মাইল)। আর চওড়ায় তিন যোজন (২৪ মাইল)। চওড়া রাজপথ এ প্রান্তের সঙ্গে ও প্রান্তকে জুড়ে দিয়েছে সর্বত্র। নগরীতে প্রবেশের অনেক উঁচু উঁচু তোরণ। বড় বড় বাড়ি। শুধু মাত্র মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত নাট্যমঞ্চও ছিল অযোধ্যায়।

অশ্মক: সূর্যবংশের এক রাজা। সৌদাস এবং দময়ন্তীর ছেলে।

সাত বছরেও গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়ায়, ধৈর্য হারিয়ে দময়ন্তী ধারালো 'অশ্ম' (পাথর) দিয়ে পেট চিরে গর্ভস্থ সন্তানকে ভূমিষ্ঠ করান। অশ্ম থেকেই 'অশ্মক' নাম।

অসমঞ্জ: রামের পূর্বপুরুষ। অযোধ্যার রাজা।

সগর এবং কৌশিনীর ছেলে। বিদর্ভরাজের দৌহিত্র। অংশুমানের বাবা। দিলীপের ঠাকুরদা। ভগীরথের প্রপিতামহ।

অসমঞ্জ অত্যন্ত অত্যাচারী এবং দুর্বিনীত ছিলেন। সৎ মা সুমতির গর্ভজাত ষাট হাজার ভাইকে রোজ সরযূর জলে ফেলে দেওয়াটা তাঁর ছোটবেলার এক প্রিয় খেলা ছিল। এঁর এই স্বভাবের জন্য সগর এঁকে নির্বাসনে পাঠান। সঙ্গে এঁর স্ত্রীকেও নির্বাসনে যেতে হয়।

রামকে বনবাসে পাঠাবার সময়, কৈকেয়ী এই ঘটনার উল্লেখ করে দশরথকে বলেন, 'আপনার বংশেই রাজপুত্রকে নির্বাসন দেওয়ার দৃষ্টান্ত আছে। তা হলে রামকে বনে পাঠাতে আপনি এত দ্বিধা করছেন কেন?'

সিদ্ধার্থ নামে দশরথের এক 'মহামাত্র' (অমাত্য) এর প্রতিবাদ করে বলেন, 'অসমঞ্জ নির্বাসনে যাওয়ার মতোই দুষ্কর্ম করেছিলেন। কিন্তু, নিষ্পাপ রাম কী অপরাধ করেছেন যে, তাঁকে বনে যেতে হবে?'

'রাম' এবং 'কৈকেয়ী' দেখুন।

অহল্যা: ব্রহ্মার সৃষ্টি করা নিখুঁত সুন্দরী এক নারী। ('হল' = খুঁত। 'অহল্যা = নিখুঁত সুন্দরী নারী)

অহল্যাকে অনিন্দ্যসুন্দরীরূপে গড়েছিলেন ব্রহ্মা। গৌতমের কাছে রেখেছিলেন তাঁকে। গৌতম অত্যন্ত সংযতভাবে অহল্যাকে মানুষ করে আবার যথাসময়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ব্রহ্মাকে। এতে খুশি হয়ে ব্রহ্মা গৌতমের হাতেই অহল্যাকে সমর্পণ করেন। ইন্দ্র এতে চটে যান। তাঁর দাবি—তিনি দেবরাজ। কাজেই অহল্যা তাঁরই প্রাপ্য।

একদিন। গৌতম নদীতে স্নানে গেলে, ইন্দ্র গৌতমের ছদ্মবেশে এসে অহল্যার সঙ্গে মিলিত হন। অহল্যা ইন্দ্রকে চিনতে পেরেও, কামদগ্ধা হয়ে, কোনও আপত্তি করেননি।

গৌতম যোগবলে সব জানতে পারেন। ইন্দ্রকে নপুংসক হওয়ার অভিশাপ দেন। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের অণ্ডকোষ খসে পড়ে। তখন মেষাণ্ড উৎপাটিত করে ইন্দ্রের দেহে বসিয়ে দেওয়া হয়।

গৌতমের অভিশাপে অহল্যা পাষাণী হয়ে শুধু হাওয়া খেয়ে কাটালেন এক হাজার বছর। পরে, রামের পাদস্পর্শে তিনি শাপমুক্তা হন। তখন গৌতম আবার তাঁকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।

'রাম' এবং 'গৌতম' দেখুন।

অহীরাবণ: রাক্ষস মহীরাবণের ছেলে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে এঁর কথা আছে। মহীরাবণবধের পর হনুমান মহীরাবণের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর পেটে পদাঘাত করলে, এক শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। সে-ই অহীরাবণ। ভূমিষ্ঠ হয়েই, হনুমানের সঙ্গে সাঙ্ঘাতিক লড়াই লাগিয়ে দেয় অহীরাবণ। সর্বাঙ্গে পুঁজ-রক্ত মাখা দিগম্বর সেই রাক্ষস-শিশুকে আছড়ে মেরে ফেলেন হনুমান।

এ কাহিনী বাল্মীকি শোনাননি। একান্তভাবেই কৃত্তিবাসের কল্পনা। তবে, সে কল্পনার পাখির পালক যুক্তিবাদী মানুষের অবিশ্বাসী মনের বাগানে খসে পড়বে না। কারণ, ওই যে! ভূমিষ্ঠ হয়েই হনুমানের মতো মহাবীরের সঙ্গে 'সাঙ্ঘাতিক লড়াই'। পৌরাণিক কাহিনী পড়তে হলে এই সব কল্পনাকে মেনে নিয়েই পড়তে হবে। নইলে, সে কাহিনীর রসটাই মাঠে মারা যাবে যে!

আত্রেয়ী: বিদুষী ঋষি-কন্যা। ইনি অত্রির স্ত্রী আত্রেয়ী (অন্য নাম 'অনসূয়া') নন।

বাল্মীকির প্রিয় শিষ্যা হিসেবে বাল্মীকির কাছে শিক্ষা লাভ করছিলেন। পরবর্তী

কালে লব-কুশের শিক্ষায় বাল্মীকি ব্যস্ত হয়ে পড়লে, ইনি অগস্ত্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

ইক্ষ্বাকু: রামের পূর্বপুরুষ। অযোধ্যার রাজা। ইক্ষ্বাকু বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বৈবস্বত মনুর ছেলে।

মনুর 'ক্ষুৎ', অর্থাৎ 'হাঁচি', থেকে এঁর জন্ম বলে, এঁর নাম 'ইক্ষ্বাকু'।

বিকুক্ষি, নিমি, দণ্ডক ইত্যাদি একশো ছেলে ছিল এঁর। বাবা মনুর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ছেলে বিকুক্ষিকে খরগোশের মাংস আনতে আদেশ করেন। খিদের জ্বালায়, শিকার করা খরগোশ নিজেই খেয়ে ফেলেন বিকুক্ষি। বিকুক্ষিকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেন ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকু মারা গেলে অবশ্য বিকুক্ষিই রাজা হন।

ইন্দুমতী: দশরথের মা। রামের ঠাকুরমা। অজ-র স্ত্রী। বিদর্ভরাজ ভোজ-এর মেয়ে।

পূর্বজন্মে ছিলেন অপ্সরা 'হরিণী'। ইন্দ্রের আদেশে, ঋষি তৃণবিন্দুর তপোভঙ্গ করতে গেলে, ঋষির অভিশাপে মানুষ হয়ে জন্মান। পরে একদিন নারদের বীণা থেকে পারিজাত মালা খসে এঁর গায়ে এসে পড়লে, ইনি শাপমুক্ত হয়ে আবার ইন্দ্রসভায় ফিরে যান।

ইন্দ্রজিৎ: মেঘনাদের অন্য নাম। 'মেঘনাদ' দেখুন।

ইল্বল: এক ভয়ঙ্কর অসুর।

বিপ্রচিত্তি এবং সিংহিকার ছেলে। বাতাপির দাদা। (হ্লাদ এবং ধমনীর ছেলে ইল্বল-বাতাপি নন এঁরা।)

বাতাপি এক ব্রাহ্মণের কাছে পুত্রলাভের বর চেয়েছিলেন। পাননি। রেগে গিয়ে বাতাপি ব্রাহ্মণ-হত্যা করতে থাকেন।

ইল্বল ব্রাহ্মণ সেজে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতেন। নকল শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে নেমন্তন্ন করে আসতেন ব্রাহ্মণদের। বাতাপি ভেড়া সাজতেন। ইল্বল সবার সামনে বাতাপিকে কেটে, সেই মাংস ব্রাহ্মণদের খাওয়াতেন।

খাওয়ার শেষে ইল্বল চিৎকার করে বাতাপিকে ডাকতেন, 'বাতাপি! বেরিয়ে এসো!'

ব্যস! অমনি বাতাপি ব্রাহ্মণদের পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতেন। তখন দু' ভাইয়ে মিলে পরমানন্দে সেই সব হতভাগ্য ব্রাহ্মণদের খেয়ে ফেলতেন।

দেবতারা এর বিহিত করতে একদিন অগস্ত্যকে সঙ্গে নিয়ে ইল্বলের অতিথি হলেন। বাতাপির সবটা মাংস অগস্ত্য একাই খেয়ে ফেললেন। ইল্বলের শত ডাকাডাকিতেও, বাতাপি আর অগস্ত্যের পেট থেকে বেরতে পারলেন না।

অগস্ত্য ইল্বলকে বললেন, 'বাতাপি আর ফিরবে না। তাকে আমি হজম করে একেবারে যমালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

রেগে গিয়ে ইল্বল আক্রমণ করতে গেলেন অগস্ত্যকে। অগস্ত্য তাঁকে ভস্ম করে দিলেন।

সুতীক্ষ্ণের আশ্রম থেকে অগস্ত্যের ভাইয়ের আশ্রমে যাওয়ার পথে, সীতা আর

লক্ষ্মণকে এই 'ইল্বল-বাতাপি' কাহিনী শোনান রাম।
'রাম' এবং 'অগস্ত্য' দেখুন।

ঊর্মিলা: লক্ষ্মণের স্ত্রী। জনকের নিজের মেয়ে।
এঁর গর্ভে লক্ষ্মণের অঙ্গদ আর চন্দ্রকেতু নামে দুই ছেলে হয়। রামায়ণে বড়ই উপেক্ষিতা চরিত্র।
'লক্ষ্মণ' দেখুন।

ঋক্ষবিল: এক বিশাল গুহা। এক যোজন (প্রায় ৮ মাইল) লম্বা এই গুহার শেষে ছিল ময় দানবের তৈরি এক আশ্চর্য প্রাসাদ। সে প্রাসাদ দেখাশোনা করতেন মেরুসাবর্ণীর মেয়ে তাপসী 'স্বয়ম্প্রভা'।
সীতার খোঁজে বেরিয়ে, ক্লান্ত, শ্রান্ত বানররা জল আর খাবারের খোঁজে ভুল করে এই গুহায় ঢুকে পড়ে। এই গুহায় ঢুকলে মৃত্যু ছিল নিশ্চিত। স্বয়ম্প্রভা বানরদের পেটপুরে খাইয়ে গুহার বাইরে বার করেছেন। বেঁচে গেছে বানররা।
'স্বয়ম্প্রভা' দেখুন।

ঋক্ষরজা: বালী এবং সুগ্রীবের মাও বটে, আবার বাবাও বটে।
ঋক্ষরজা পুরুষই ছিলেন। এক মায়া-সরোবরে অবগাহনের ফলে, সুন্দরী নারীরূপ পান। সেই রূপ দেখে ইন্দ্র এবং সূর্য কামার্ত হয়ে বালী এবং সুগ্রীবের জন্ম দেন। পরে ঋক্ষরজা আবার বানর-রূপ ফিরে পান। এই হিসেবে, ঋক্ষরজা একাধারে বালী এবং সুগ্রীবের মা এবং বাবা।
'বালী' এবং 'সুগ্রীব' দেখুন।

ঋক্ষরাজ: জাম্ববানের অন্য নাম। ঋক্ষ, অর্থাৎ ভল্লুকদের, রাজা।
'জাম্ববান' দেখুন।

ঋতুপর্ণ: সূর্যবংশীয় রাজা। অযুতাশ্বের ছেলে।
ভাল পাশা খেলা আর জ্যোতিষবিদ্যা জানতেন। রাজ্য হারিয়ে, নল 'বাহক' ছদ্মনামে এঁর সারথি হয়ে এঁর কাছে ছিলেন।
দময়ন্তী নলকে ফিরে পাওয়ার জন্য সাজানো স্বয়ম্বর সভার ব্যবস্থা করলে, ঋতুপর্ণকে সেই স্বয়ম্বর সভায় মাত্র একদিনের মধ্যে নিয়ে যান নল। মিথ্যে ধরা পড়ে। নল-দময়ন্তী আবার মিলিত হন। ঋতুপর্ণ এতে খুশিই হন।
স্বয়ম্বর সভায় যাওয়ার সময় নল ঋতুপর্ণকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়েছিলেন। আর ঋতুপর্ণ নলকে শিখিয়েছিলেন জ্যোতিষ আর পাশাখেলা। তার জোরেই, নল কলির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে পুষ্করের কাছ থেকে তাঁর রাজ্য ফিরে পান।

ঋষভ পর্বত: কৈলাসের কাছাকাছি এক পর্বতশৃঙ্গ। এই দুই পর্বতশৃঙ্গের মধ্যেই ছিল ঔষধি পর্বত। সেখান থেকেই হনুমান ঔষধি গাছ চিনতে না পেরে, গোটা গন্ধমাদন শৃঙ্গকেই তুলে নিয়ে এসেছেন লঙ্কার যুদ্ধ ক্ষেত্রে। এবং একবার নয়। দু' দু'বার।
'রাম', 'লক্ষ্মণ' এবং 'হনুমান' দেখুন।

ঋষ্যমূক পর্বত: 'ঋষ্য', অর্থাৎ হরিণ, যে-পর্বতে 'মূক', অথার্ৎ নীরব হয়ে, অর্থাৎ কিনা নির্ভয়ে, বিচরণ করতে পারে, সে পর্বতেরই নাম 'ঋষ্যমূক পর্বত'।

পম্পা সরোবর আর কাবেরী নদীর উৎস।

এখানে মতঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল। মতঙ্গের অভিশাপ ছিল, বালী এখানে এলেই মরবেন। তাই সুগ্রীব বালীর হাত থেকে বাঁচতে, প্রাণভয়ে এই পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রাম এখানেই সুগ্রীবের সঙ্গে দেখা করে সীতা-উদ্ধারে তাঁর সাহায্য চান।

রাবণ হরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময়, সীতা পুষ্পক থেকে পাঁচ বানরকে এখানে বসা অবস্থায় দেখেন। রামের কাছে খবর পৌঁছনোর আশায় ঋষ্যমূকের ওপর ফেলে দেন তাঁর সিল্কের শাড়ির টুকরো, ওড়না আর বেশ কিছু দামি গয়না।

'রাম', 'সীতা', 'বালী', 'সুগ্রীব' এবং 'মতঙ্গ' দেখুন।

ঋষ্যশৃঙ্গ: কশ্যপের নাতি। বিভাণ্ডক মুনির ছেলে। দশরথের জামাই। শান্তার স্বামী।

দীর্ঘদিন তপস্যার পর এক হ্রদে স্নান করছিলেন বিভাণ্ডক। হঠাৎ দেখতে পেলেন স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীকে। কামার্ত হলেন বিভাণ্ডক। জলেই রেতঃপাত হল তাঁর।

এক হরিণী সেই জল খেয়ে গর্ভিণী হল। আসলে সেই হরিণী ছিলেন শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা 'স্বর্ণমুখী'। তিনি প্রসব করলেন মাথায় শিংওয়ালা এক শিশুপুত্র। সেই শিশুই 'ঋষ্যশৃঙ্গ'।

ইনি অত্যন্ত পবিত্র জীবনযাপনের ফলে অত্যন্ত উচ্চমার্গের ব্রহ্মচর্যের অধিকারী হয়েছিলেন। নারী এবং ভোগসুখ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং উদাসীন ছিলেন।

রাজা দশরথের বিশেষ বন্ধু ছিলেন অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ। দুর্ব্যবহারের জন্য ব্রাহ্মণরা তাঁকে ত্যাগ করেন। ইন্দ্র বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় অঙ্গ দেশে। রাজা ক্ষমা চান মুনিদের কাছে।

মুনিরা বলেন, 'যজ্ঞ করতে হবে। আর সে যজ্ঞে আনতে হবে ঋষ্যশৃঙ্গকে।'

লোমপাদ দেশের বাছাই করা সুন্দরী বারাঙ্গনাদের পাঠালেন। ঋষ্যশৃঙ্গকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে আসতে। বারাঙ্গনারা আজন্ম ব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গকে ভুলিয়ে নিয়ে এলেন। বিভাণ্ডকের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে। ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশে পা দিতেই, শুরু হল প্রবল বর্ষণ। লোমপাদের পালিতা মেয়ে দশরথ-দুহিতা শান্তার সঙ্গে বিয়েও হয়ে গেল তাঁর।

পুত্রকামনায় দশরথ যখন অশ্বমেধযজ্ঞ করেছিলেন, তখন মন্ত্রী সুমন্ত্র আর কুলগুরু বশিষ্ঠের পরামর্শে দশরথ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ঋষ্যশৃঙ্গকে। সেই যজ্ঞের ফলেই, দশরথের তিন রানি গর্ভবতী হন।

'দশরথ', 'লোমপাদ' এবং 'শান্তা' দেখুন।

কপিল: সাংখ্য দর্শন প্রণেতা মুনি। এঁর বাবা প্রজাপতি কর্দম। মা দেবাহুতি। ঠাকুরদা ভগবান ব্রহ্মা।

নিরীশ্বরবাদী কপিল তপস্যার সুবিধের জন্য পাতালে আশ্রম তৈরি করিয়েছিলেন।

সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াকে ইন্দ্র লুকিয়ে রেখেছিলেন কপিলের আশ্রমে। সগরের ষাট হাজার ছেলে ঘোড়া খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়েন কপিলের আশ্রমে। কপিলই ঘোড়া লুকিয়ে রেখেছেন, এই ভেবে, কপিলকে আক্রমণ করেন

তাঁরা। কপিল তাঁদের ভস্ম করে দেন।

পরে, সগরের নাতি অংশুমান কপিলকে সন্তুষ্ট করে ঘোড়া ফিরিয়ে নিয়ে যান। যজ্ঞ শেষ হয়। আরও পরে, অংশুমানের নাতি ভগীরথ (দশরথের ঠাকুরদা রঘুর ভাই) গঙ্গাকে বহু কাণ্ড করে নিয়ে আসেন কপিলের আশ্রমে। গঙ্গার স্পর্শ পাওয়া মাত্র, আবার বেঁচে ওঠেন সগরের ষাট হাজার ছেলে।

'গঙ্গার মর্তে অবতরণ' দেখুন।

কবন্ধ: দণ্ডকারণ্যের এক কদাকার চেহারার রাক্ষস। অন্য নাম 'দনু'। দানব 'শ্রী'-র ছেলে।

এঁর মাথা বা গলা ছিল না। পেটের মধ্যে বিশাল এক মুখ ছিল। সেখানেই একটা চোখ ছিল। সে চোখ আগুনের মতো সবসময় জ্বলত। হাত দু'খানা ছিল এক যোজন (প্রায় ৮ মাইল) লম্বা। দু'হাতে পশুপাখি ধরে উদর পূরণ করতেন।

আগে কবন্ধ ছিলেন এক অত্যন্ত রূপবান রাক্ষস। 'স্থূলশিরা' নামে এক ঋষির ফলমূল চুরি করায়, ঋষির অভিশাপে এঁর এই কদাকার চেহারা হয়। শাপমুক্তির জন্য ঋষির কাছে প্রার্থনা জানালে, ঋষি বলেন, 'রাম যে দিন তোমার দু'হাত কেটে এই বনে তোমাকে আগুনে পোড়াবেন, সে দিন তোমার শাপমুক্তি হবে। তুমি আবার তোমার আগের রূপ ফিরে পাবে।'

তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে দীর্ঘায়ু হওয়ার বর লাভ করেন কবন্ধ। গর্বিত কবন্ধ ইন্দ্রকে আক্রমণ করেন। ইন্দ্র বজ্রাঘাতে তাঁর ঊরু আর মাথা তাঁর পেটে ঢুকিয়ে দেন। তখন কবন্ধের প্রার্থনায় ইন্দ্র তাঁকে এক যোজন লম্বা হাত আর পেটের মধ্যে ধারালো দাঁতওয়ালা এক মুখ দেন। আর বলেন, 'রাম-লক্ষ্মণ তোমার হাত কেটে দিলে তোমার স্বর্গলাভ হবে।'

সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে রাম-লক্ষ্মণ যখন মতঙ্গ মুনির আশ্রমে এসে পড়েন, তখন কবন্ধ তাঁদের আক্রমণ করেন। রাম-লক্ষ্মণ তাঁর দু'হাত কেটে দিলে, কবন্ধ তাঁর দেহটিকে আগুনে উৎসর্গ করতে অনুরোধ করেন দু'ভাইকে । আগুনে দেহ উৎসর্গ করার পরই, ঋষিবাক্য মতো, আগের সুন্দর চেহারা ফিরে পান কবন্ধ।

কৃতজ্ঞতাস্বরূপ, সীতাকে ফিরে পাওয়ার উপায় হিসেবে, ঋষ্যমূক পর্বতে গিয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে মিতালি করার পরামর্শ দেন রাম-লক্ষ্মণকে। আর ঋষ্যমূক পর্বতে কী ভাবে যেতে হবে, সে পথও বলে দেন।

'রাম' দেখুন।

কম্পন: রাবণের চর। যুদ্ধে অঙ্গদের হাতে মারা যান।

কলা: বিভীষণের মেয়ে।

কান্যকুব্জ (কনৌজ): রামায়ণের সমসাময়িককালের এক নগর। রাজা কুশনাভ আর ঘৃতাচীর একশো সুন্দরী মেয়ে বায়ুকে বিয়ে করতে রাজি না হলে, বায়ু (পবনদেব) এঁদের দেহ ভেঙে এঁদেরকে কুব্জা (কুঁজো) করে দেন। পরে কাম্পিল্যার রাজা ব্রহ্মদত্ত এঁদের হাত ধরতেই, এঁরা আবার তাঁদের আগেকার চেহারা ফিরে পান।

একশো কন্যা কুব্জা হয়েছিলেন। তাই 'কান্যকুব্জ' নাম।

কালনেমি: রাবণের মামা।

রাবণের ছোড়া শক্তি-শেলে অচৈতন্য লক্ষ্মণের জন্য হনুমান গন্ধমাদন পর্বতে ঔষধি আনতে গেলে, হনুমানকে মারার জন্য রাবণ কালনেমিকে সেখানে পাঠান। কুমির রূপিণী এক অভিশপ্তা অপ্সরা হনুমানের স্পর্শে মুক্তি পেয়ে হনুমানকে কালনেমির কথা বলে দেন। ছদ্মবেশী কালনেমিকে ছুড়ে ফেলেন হনুমান। কালনেমি ঘুরপাক খেতে খেতে এসে পড়েন একেবারে লঙ্কায়। রাবণের সিংহাসনে।

'হনুমান', 'রাম' এবং 'রাবণ' দেখুন।

কিষ্কিন্ধ্যা: বানররাজ বালীর রাজ্য। রাজধানীও কিষ্কিন্ধ্যা। বর্তমান মহীশূরের উত্তরে ছিল কিষ্কিন্ধ্যা।

এই কিষ্কিন্ধ্যাতেই, পম্পা সরোবরের তীরে, ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীবের সঙ্গে দেখা হয় রাম-লক্ষ্মণের। সীতাকে খুঁজে বার করার প্রতিশ্রুতি দেন সুগ্রীব। রাম কথা দেন , বালীকে তিনি বধ করবেন।

রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সীতা 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ!' বলে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর গা থেকে কিছু অলঙ্কার আর তাঁর উত্তরীয় খুলে ফেলে দিয়েছিলেন ঋষ্যমূক পর্বতে। সুগ্রীব সে সব সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন পর্বতের গুহায়। রাম-লক্ষ্মণকে সে সব দেখাতেই, সীতার শোকে অধীর হয়ে ওঠেন রাম।

'রাম' এবং 'হনুমান' দেখুন।

কুঞ্জর: হনুমানের দাদামশাই। অঞ্জনার বাবা।

কুবলাশ্ব: অযোধ্যার এক রাজা। 'ধুন্ধু' নামে এক রাক্ষসকে বধ করায় এঁর নাম হয় 'ধুন্ধুমার'।

কুবের: রাবণের দাদা। সৎ দাদা। বিশ্রবা এবং দেববর্ণিনীর ছেলে। ভরদ্বাজের দৌহিত্র।

পুলস্ত্যের নাতি। (ছেলের ছেলে।)

বিশ্রবার ছেলে বলে এক নাম 'বৈশ্রবণ'। দেবী রুদ্রাণীকে হঠাৎ দেখে ফেলায় এঁর ডান চোখ ঝলসে যায়। আর বাঁ চোখ পিঙ্গল (কটা) হয়ে যায়। তাই এঁর এক নাম 'একপিঙ্গল'। এছাড়াও, 'ধনপতি', 'যক্ষরাজ' ইত্যাদি অসংখ্য নাম আছে এঁর।

ঠিকানা 'কৈলাস'। বাড়ির নাম 'অলকা'। বাগানের নাম 'চৈত্ররথ'। রথের নাম 'পুষ্পক'।

এই পুষ্পকই পরে রাবণের হাতে চলে যায়। রাবণের মৃত্যুর পর রাম এঁকে এঁর পুষ্পক রথ ফেরত দিয়ে দেন। ইনি পরে তা আবার উপহারস্বরূপ পাঠান রামের কাছে।

দু'হাজার বছর তপস্যা করে কুবের ব্রহ্মার কাছে বর পান, যে, তিনি অমর হবেন। এ ছাড়া উত্তর দিগন্তের দিকপাল এবং ধনাধিপতি হবেন। ব্রহ্মাই এঁকে পুষ্পক রথটি দেন। আর দেন দেবতার মর্যাদা।

বাবার ইচ্ছে মতো, বিশ্বকর্মার তৈরি লঙ্কাপুরীতে বাস করছিলেন কুবের। রাবণ লঙ্কাপুরী চাইলে, ইনি বাবার ইচ্ছেতেই কৈলাসে চলে যান।

রাবণকে দুষ্কর্ম করতে নিষেধ করে উপদেশ দেওয়ায়, রাবণ এঁর পুষ্পক রথ কেড়ে নেন।

অত্যন্ত কুৎসিত দর্শন। তিনটে পা। আটটা দাঁত।

আহুতি এঁর স্ত্রী। দুই ছেলে। নলকুবের আর মণিগ্রীব । এক মেয়ে। মীনাক্ষী।

'রাবণ', 'বিশ্রবা' এবং 'পুষ্পক রথ/বিমান' দেখুন।

কুম্ভ: কুম্ভকর্ণ এবং বজ্রজ্বালার ছেলে। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে লঙ্কার যুদ্ধে সুগ্রীবের ঘুষিতে প্রাণ দেন।

কুমুদ্বতী: কুশের স্ত্রী। রাম-সীতার পুত্রবধূ। অতিথির মা।

কুম্ভকর্ণ: রাবণের মেজ ভাই। কৈকসীর গর্ভজাত বিশ্রবার দ্বিতীয় সন্তান। বজ্রজ্বালার স্বামী। কুম্ভ এবং নিকুম্ভের বাবা।

বিশাল দেহের অধিকারী ছিলেন কুম্ভকর্ণ। কোমরের মাপ ছিল চার শো হাত (৬০০ ফুট)। উচ্চতা ছিল দু'হাজার চারশো হাত (৩৬০০ ফুট)।

কুম্ভকর্ণের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বর দিতে চাইলে, দেবতারা ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা ব্রহ্মাকে বললেন, 'ভগবান! একে বর দিলে যে ত্রিভুবনের সর্বনাশ হবে! আপনি বরং একে বর দেওয়ার নাম করে মোহ দিন।'

ব্রহ্মার পরামর্শে সরস্বতী কুম্ভকর্ণের জিবে বসে বহু বছর ধরে ঘুমোবার বর চাইয়ে নিলেন কুম্ভকর্ণকে দিয়ে।

ভাইয়ের দুর্ভাগ্যে বিচলিত রাবণ ব্রহ্মার চরণে প্রার্থনা জানালেন। ব্রহ্মা বললেন, 'বেশ! কুম্ভকর্ণ প্রতি ছ'মাস অন্তর এক দিন জেগে থাকবে। তবে হ্যাঁ। ছ'মাসের মধ্যে কেউ তার ঘুম ভাঙালে, তার (কুম্ভকর্ণের) মৃত্যু হতে পারে।'

রামের সঙ্গে প্রথম দিনের সরাসরি যুদ্ধে নাস্তানাবুদ হয়ে ফিরে রাবণ যেদিন সভাসদ্‌দের নিয়ে আলোচনায় বসেছেন, তার ঠিক ন'দিন আগেকার কথা। সেদিন কুম্ভকর্ণ জেগে। দাদাকে সীতাহরণের জন্য তিনি তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেছেন। আবার ছ'মাসের জন্য শুতে যাওয়ার আগে, বিপদে দাদার পাশে দাঁড়াবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

ঠিক তার ন'দিন পরেই, কুম্ভকর্ণকে জাগানো হল। কুম্ভকর্ণের সে ঘুম ভাঙানোও এক যজ্ঞ। নানা রকম বিকট শব্দের বাজনা তারস্বরে বাজানো হল কানের কাছে। কানে জল ঢেলে দেওয়া হল। বড় বড় হাতিকে তুলে দেওয়া হল কুম্ভকর্ণের শরীরের ওপর। বড় বড় মুষল, পাহাড়ের চূড়া, গাছের গুঁড়ি ইত্যাদি দিয়ে পিটিয়ে অনেক কষ্টে তাঁর ঘুম ভাঙানো হল।

ঘুম থেকে উঠেই, ভরপেট মাংস খেয়ে আর আকণ্ঠ মদ্যপান করে, রাবণকে আর এক প্রস্থ গালাগাল দিয়ে কুম্ভকর্ণ গেলেন যুদ্ধে। মহাবিক্রমে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করে, বহু বানরকে উদরস্থ করে, শেষে রামের হাতে প্রাণ দিয়েছেন কুম্ভকর্ণ।

কুম্ভকর্ণের মাথা পড়েছে লঙ্কায়। আর দেহ সাগরে। মাথার আঘাতে বহু বাড়ি ঘরদোর ভেঙে গেছে।

কুম্ভকর্ণ কখনওই সীতাহরণকে সমর্থন করেননি। বরং, রাম কেন এখনও রাবণকে

বধ করেননি, তা ভেবেই তিনি বিস্মিত হয়েছেন। কুম্ভকর্ণ রাবণকে যে-সব নীতিবাক্য বলেছেন, তা রামায়ণের এক শ্রেষ্ঠ অংশ।

আরও তথ্যের জন্য 'রাম', 'রাবণ' এবং 'কৈকসী' দেখুন।

কুম্ভযোনি: অগস্ত্যের অন্য নাম। 'অগস্ত্য' দেখুন।

কুম্ভীনসী (১): রাবণের মাসি। সুমালী এবং কেতুমতীর মেয়ে।

কুম্ভীনসী (২): রাবণের মাসতুতো বোন। বিশ্বাবসু এবং অনলার মেয়ে। মাল্যবানের দৌহিত্রী। লবণাসুরের মা।

রাবণের দিগ্বিজয় যাত্রা, কুম্ভকর্ণের ঘুম আর বিভীষণের কঠোর তপস্যা একই সঙ্গে চলতে থাকায়, লঙ্কা কিছুটা অরক্ষিত ছিল। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে, দৈত্য মধু কুম্ভীনসীকে হরণ করেন।

রাবণ ছোটেন মধুকে শাস্তি দিতে। কুম্ভীনসী স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে দাদার পা জড়িয়ে ধরেন।

মধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতান রাবণ।

আরও তথ্যের জন্য 'মধু' এবং 'লবণাসুর' দেখুন।

কুশধ্বজ: জনকের ছোট ভাই। মাণ্ডবী এবং শ্রুতকীর্তির বাবা। 'সাংকাশ্যা'র রাজা।

কুশনাভ: বিশ্বামিত্রের ঠাকুরদা। ঘৃতাচারী স্বামী। কুশ এবং বৈদর্ভীর ছেলে।

'কান্যকুব্জ (কনৌজ)' দেখুন।

কেকয়: কৈকেয়ীর বাবা। কেকয়রাজের রাজ্য। শতদ্রু আর বিপাশার মধ্যবর্তী অঞ্চল। মতান্তরে, সিন্ধু নদের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল।

কেকয়রাজ: কৈকেয়ীর বাবা। দশরথের শ্বশুর। ভরতের দাদামশাই।

কেতুমতী: অসামান্যা রূপবতী গন্ধর্বী।

রাবণের দিদিমা। সুমালীর স্ত্রী। প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ডী, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদ, প্রহাস, ভাসকর্ণ, কুম্ভীনসী, কৈকসী (বা নিকষা, রাবণের মা), পুষ্পোৎকটা এবং রাকার মা।

কেশরী: বানর রাজা। হনুমানের বাবা। (হনুমানের ধর্মপিতা পবন।) অঞ্জনার স্বামী।

'অঞ্জনা' এবং 'হনুমান' দেখুন।

কৈকসী (নিকষা): রাবণের মা। রাক্ষস সুমালী এবং কেতুমতীর মেয়ে। বিশ্রবার স্ত্রী।

সুমালী মেয়েকে বিশ্রবার কাছে গিয়ে তাঁকে (বিশ্রবাকে) স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার পরামর্শ দিলেন।

কৈকসী যখন বিশ্রবার কাছে এলেন, তখন প্রদোষকাল। বিশ্রবা ধ্যান করছিলেন।

ধ্যান ভঙ্গ হলে, কৈকসী কেন এসেছেন, জানতে চাইলেন বিশ্রবা।

কৈকসী মাথা নিচু করে মাটিতে আঁক কাটছিলেন। বললেন, 'আপনি ধ্যানযোগেই তো জানতে পারেন, কেন আমি এসেছি!'

বিশ্রবা ধ্যানে সব জানতে পেরে, কৈকসীকে বিয়ে করতে রাজি হলেন। কিন্তু বলে দিলেন, 'প্রদোষকালে পুত্রলাভের বাসনা প্রকাশ করায়, তোমার ছেলেরা সব ভয়ঙ্কর হবে।'

কেঁদে পড়লেন কৈকসী।

বিশ্রবা বললেন, 'বেশ! তোমার তিন ছেলে আর এক মেয়ের মধ্যে ছোট ছেলেটি খুব ধার্মিক হবে।'

নিকষা নামেও কৈকসী পরিচিতা ছিলেন। রামকে তিনি মনে মনে অত্যন্ত ভক্তি করতেন।

'বিশ্রবা' দেখুন।

কৈকেয়ী: ভরতের মা। দশরথের অন্যতমা প্রধানা স্ত্রী। এক মতে দ্বিতীয়া। এক মতে তৃতীয়া। কেকয়রাজ অশ্বপতির মেয়ে। তাই 'কৈকেয়ী' নাম।

কৈকেয়ী ছিলেন বৃদ্ধ দশরথের সুন্দরী তরুণী ভার্যা। তাই দশরথ কৈকেয়ীর ভবনেই বেশি সময় কাটাতেন। দশরথের প্রশ্রয়ে কৈকেয়ী হয়ে উঠেছিলেন অহঙ্কারিণী। কৌশল্যা বা সুমিত্রা কাউকেই তিনি মান্য বা গ্রাহ্য করতেন না।

বিয়ের সময় 'মন্থরা' নামে এক কুব্জা দাসীকে বাপের বাড়ি থেকে দেওয়া হয়েছিল। কৈকেয়ীর সঙ্গে। এই মন্থরাই, ছুটে এসে রামের অভিষেকের কথা জানিয়েছেন কৈকেয়ীকে। কৈকেয়ী তৎক্ষণাৎ মন্থরাকে পুরস্কৃত করেছেন। বলেছেন, 'রাম আর ভরতে কোনও প্রভেদ নেই। এ খুব আনন্দের খবর।'

মন্থরা নানা ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন কৈকেয়ীকে, এতে তাঁর কী ক্ষতি হতে পারে। কৈকেয়ী কিছুতেই তা বুঝতে চান না।

কুচক্রী মন্থরা বললেন, 'দেখো মা! প্রথমত, ভরত আর শত্রুঘ্ন মামার বাড়িতে থাকাকালীন রামের অভিষেক হচ্ছে। এতে নিশ্চয়ই ভরতের বিপদ ঘটবে।

'দ্বিতীয়ত, দশরথের প্রশ্রয়ে এতদিন তুমি মা কৌশল্যার ওপর লাঠি ঘুরিয়ে এসেছ। রাম রাজা হলে কৌশল্যা কি তার প্রতিশোধ নেবে না ভেবেছ?'

এই দুই অস্ত্রে কাজ হল।

একবার। দেবাসুরের যুদ্ধে আহত দশরথের সেবা করে তাঁর কাছ থেকে দুটি বর পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন কৈকেয়ী। মন্থরার কুপরামর্শে এখন বৃদ্ধ দশরথের কাছে সেই দুই বর চাইলেন কৈকেয়ী। এক বরে, রাম চোদ্দো বছরের জন্য বনে যাবে। অন্য বরে, ভরত রাজা হবে।

রাম-লক্ষ্মণ-সীতার বনযাত্রার সময় সবাই কাঁদছে। কৈকেয়ীকে অভিশাপ দিচ্ছে। কৈকেয়ী কিন্তু তখন অবিচলিতা।

সুমন্ত্র বললেন, 'এই কৈকেয়ীর মা নিজের স্বামীকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। এও আজ তাই করতে চলেছে।'

কৈকেয়ী অম্লান বদনে রাম-সীতার হাতে চীর-বসন তুলে দিয়েছেন।

মামার বাড়ি থেকে ফিরে, ভরত সব শুনে মাকে 'পাপীয়সী', 'চরিত্রভ্রষ্টা' ইত্যাদি যা মুখে এসেছে, তা-ই বলেছেন।

ভরতের ঘৃণায় কৈকেয়ীর চৈতন্য হল। ভরতের সঙ্গে স্বয়ং কৈকেয়ীও রামকে ফেরাতে চিত্রকূটে গেছেন। কান্নাকাটি করেছেন।

চোদ্দো বছর তাঁকে অন্তঃপুরে, সকলের ভর্ৎসনা সহ্য করে, চোখের জলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। বনবাস থেকে ফিরে, রাম তাঁকে আবার সম্মানের আসনে বসিয়েছেন।

আরও তথ্যের জন্য 'দশরথ', 'রাম' এবং 'ভরত' দেখুন।

কৈলাস পর্বত: শিব এবং কুবেরের বাড়ি এখানে। কৈলাস আর ঋষভ পর্বতের মধ্যেই ছিল গন্ধমাদন পর্বত। ঔষধি নিতে এসে যার চূড়া তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন হনুমান।

কৈলাস পর্বতের অবস্থান মানস-সরোবরের উত্তর-পশ্চিমে।

কোশল (উত্তর): রামের রাজ্য।

উত্তর আর দক্ষিণ, দু'ভাগে বিভক্ত ছিল কোশল। উত্তর কোশলকেই অযোধ্যা বলা হত। বর্তমান কাশীর উত্তর দিকে ছিল কোশল রাজ্য। উত্তর কোশলের রাজধানী ছিল অযোধ্যা।

'অযোধ্যা' দেখুন।

কৌশল্যা: রামের মা। দশরথের প্রধানা স্ত্রী। 'দক্ষিণ কোশল'-এর রাজার মেয়ে।

দশরথ ছিলেন উত্তর কোশলের রাজা।

কৌশল্যা ছিলেন আদর্শ স্নেহময়ী জননী। তরুণী ভার্যা কৈকেয়ীর ভয়ে দশরথ কৌশল্যার দিকে বিশেষ নজর দিতে পারতেন না। সে দুঃখ বুকে চেপেই, হাসি মুখে সংসারের হালটি ধরেছিলেন কৌশল্যা।

স্বামী-সোহাগে বঞ্চিতা কৌশল্যা সারাদিন পুজোআর্চা নিয়েই থাকতেন। দশরথ কৌশল্যাকে খুব সমীহ করতেন। তাঁকে এক হাজার গ্রাম দান করেছিলেন দশরথ।

দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াকে তিন কোপে বলি দেন কৌশল্যা। তারপর, পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে, সেই মৃত ঘোড়ার সঙ্গে এক রাত কাটান।

রামের রাজ্যাভিষেকের খবর কৌশল্যা দশরথের কাছে পাননি। শুনেছেন লোকমুখে। খবরদাতা সবাইকেই তিনি নানা পারিতোষিকে তৃপ্ত করেছেন।

রাম যখন বনে যাওয়ার সেই মর্মঘাতী সংবাদ শোনালেন, আর্তনাদ করে সংজ্ঞা হারালেন কৌশল্যা। চেতনা ফিরলে, কৈকেয়ীর দাপটের কথা চিন্তা করে, ভয়ে শিউরে উঠেছেন।

রাম-লক্ষ্মণ-সীতার বনবাসে যাওয়ার সময় সীতাকে বলছেন, 'দেখো মা, আমার রামের যেন কোনও অমর্যাদা কোরো না কখনও।'

রাম বনে গেলে, দশরথ কৌশল্যার বাড়িতেই এসে উঠেছেন। মামার বাড়ি থেকে ফিরে-আসা ভরতকে কৌশল্যা প্রথমে তিরস্কার করলেও, পরে ভরতের আন্তরিক ব্যবহারে নিজের ভুল বুঝতে পেরে, তাঁকে বুকে টেনে নিয়েছেন।

চোদ্দো বছর বনবাসের শেষে রাম ফিরে এলে, অন্য সবার সঙ্গে কৌশল্যাও নন্দিগ্রামে গেছেন। রামকে স্বাগত জানাতে। অযোধ্যার রাজরানিরূপে অভিষেকের আগে সীতাকে নিজের হাতে করে সাজিয়ে দিয়েছেন।

সীতার পাতাল প্রবেশেরও অনেক পরে দেহত্যাগ করেছেন কৌশল্যা।

আরও তথ্যের জন্য 'দশরথ' এবং 'রাম' দেখুন।

খর-দূষণ: রাবণের দুই সৎ ভাই। বিশ্রবা এবং সুমালী রাক্ষসের মেয়ে রাকার ছেলে। খরের ছেলে মকরাক্ষ।

ভুল করে ভগ্নিপতি বিদ্যুজ্জিহ্বকে মেরে ফেলে অনুতপ্ত রাবণ সদ্যোবিধবা বোন শূর্পণখাকে যথেচ্ছ-বিহারের স্বাধীনতা দিয়ে পাঠালেন দণ্ডকারণ্যে। সেখানে বোনের পাহারায় পাঠালেন দুই জাঁদরেল সেনাপতি খর আর দূষণকে।

লক্ষ্মণের হাতে নাক-কান খুইয়ে শূর্পণখা এলেন দুই সৎ দাদার কাছে। তাঁরা তো শূর্পণখার এই অবস্থা দেখেই, ছুটলেন রাম-লক্ষ্মণকে বধ করতে।

কিন্তু তা তো হবার নয়? কাজেই, রাম-লক্ষ্মণই তাঁদের দুই ভাইকে চোদ্দো হাজার রাক্ষসসেনাসহ যমালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। আর এ কাজে তাঁরা সময় নিলেন, মাত্রই দেড় মুহূর্ত (= তিন দণ্ড = ১ ঘণ্টা ১২ মিনিট)।

'রাম', 'রাবণ' এবং 'শূর্পণখা' দেখুন।

গঙ্গা: 'গঙ্গার মর্তে অবতরণ' শিরোনামের আলাদা অধ্যায় দেখুন।

গন্ধমাদন পর্বত: হিমালয়ের ঋষভ আর কৈলাস পর্বতের মধ্যে অবস্থিত ঔষধি পর্বত।

হনুমান দু'বার এই পর্বতশৃঙ্গ তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। একবার রাম-লক্ষ্মণসহ সমস্ত বানরদের বাঁচাতে। আর একবার শক্তিশেলের আঘাতে মুমূর্ষু লক্ষ্মণকে বাঁচাতে।

এই পর্বতের চূড়ায় মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী এবং সন্ধানী—এই চার রকম ঔষধি গাছের ছড়াছড়ি। তার গন্ধে মাত হয়ে থাকত এই পর্বত। তাই 'গন্ধমাদন' নাম।

'রাম', 'লক্ষ্মণ' এবং 'হনুমান' দেখুন।

গয়: সুগ্রীবের বানর-চর। কিষ্কিন্ধ্যায় সীতাকে খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছিলেন।

গরুড়: ভগবান বিষ্ণুর বাহন। পক্ষিরাজ। কশ্যপ এবং বিনতার ছেলে। অরুণের ভাই। সম্পাতি আর জটায়ুর জ্যাঠামশাই।

অনেক নাম গরুড়ের। কশ্যপের ছেলে। তাই 'কাশ্যপেয়'। বিনতার ছেলে। তাই 'বৈনতেয়'।

ইন্দ্র এঁকে বজ্রাঘাত করলে, ইনি একটা সোনার পালক ফেলে দিয়েছিলেন। তা-ই 'সুপর্ণ'।

ইন্দ্রকে জয় করেছিলেন। তাই 'ইন্দ্রজিৎ' বা 'সুরেন্দ্রজিৎ'।

ইন্দ্রের বজ্র ধ্বংস করেছিলেন। তাই 'বজ্রজিৎ'।

এ ছাড়াও 'খগরাজ', 'রক্তপক্ষ', 'কামায়ুধ', 'বিষ্ণুরথ' ইত্যাদি অনেক নাম এঁর।

কশ্যপের দুই স্ত্রী কদ্রু এবং বিনতার প্রার্থনা মতো, তাঁদের সঙ্গে কশ্যপের মিলনের ফলে, কদ্রুর গর্ভে এক হাজার সর্প-সন্তানের জন্ম হয়। বিনতা দুটি ডিম প্রসব করেন।

বোন এবং সতীন কদ্রুর ছেলেরা বড় হয়ে উঠছে। অথচ বিনতার প্রসূত ডিম থেকে সন্তান বেরিয়ে আসছে না। ধৈর্য হারালেন বিনতা।

একটা ডিম ভাঙতেই, তা থেকে অসম্পূর্ণ শরীর নিয়ে বেরিয়ে এলেন অরুণ। চলে গেলেন সূর্যের রথের সারথি হতে।

অরুণ মাকে শাপ দিলেন, 'অসময়ে আমাকে ডিম থেকে বার করেছ! তোমাকে মা কদ্রুর দাসী হয়ে থাকতে হবে। পাঁচশো বছর। অবশ্য বাকি ডিমটা যদি অসময়ে না ভাঙো, তা হলে, তা থেকে জন্ম নেবে এক মহাশক্তিমান সন্তান। সে-ই তোমার দাসীত্ব মোচন করবে।'

দ্বিতীয় ডিম থেকে যথাসময়ে পক্ষিরাজ গরুড়ের জন্ম হল। গরুড় কদ্রুর সর্প সন্তানদের দাবি মতো স্বর্গ থেকে অমৃত এনে মার দাসীত্ব মোচন করেন।

অমৃত আনতে গেলে, দেবতাদের সঙ্গে তাঁর লড়াই বাধে। দেবতারা পরাস্ত হন। ইন্দ্রের ছোড়া বজ্রের মর্যাদা রাখতে, নিজের শরীর থেকে মাত্র একটা পালক ঝরিয়ে দেন গরুড়।

বিষ্ণুর বরে গরুড় অমর হন। গরুড়ের বরে বিষ্ণু গরুড়কে তাঁর বাহন হিসেবে পান।

স্বর্গ থেকে আনা 'অমৃতকুম্ভ' গরুড় রেখেছিলেন কুশাসনের ওপর। সাপেরা অমৃত পান করার আগেই, পূর্বশর্ত মতো ইন্দ্র 'অমৃতকুম্ভ' নিয়ে সরে পড়েন। সাপেরা, অমৃত না পেয়ে, কুশাসনই চাটতে থাকে। কুশের ধারে সাপদের জিব চিরে যায়। সেই থেকেই সাপের জিব চেরা। আর গরুড় হয়ে গেলেন সাপদের যম।

ইন্দ্রজিৎ রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে বেঁধে ফেললে গরুড় সেখানে ছুটে আসেন। গরুড় আসতেই, সাপরা রাম-লক্ষ্মণকে ফেলে পালায়।

'রাম','লক্ষ্মণ' এবং 'বিনতা' দেখুন।

গাধি: বিশ্বামিত্রের বাবা। কুশনাভ এবং অপ্সরা ঘৃতাচীর ছেলে। পরশুরামের বাবা জমদগ্নির দাদামশাই।

গুহ (গুহক/গুহকমিতা): নিষাদরাজ।

রাম, লক্ষ্মণ আর সীতাকে গঙ্গা পার করে দেন। রামের সন্ধানে ছুটে-আসা সসৈন্য ভরতকেও গঙ্গা পার করে দেন। রাম এঁর সঙ্গে মিতালি পাতান। বনবাস শেষে, অযোধ্যায় ফেরার পথে, এঁর কুটিরে অতিথি হন রাম। এঁর রাজ্যের নাম 'শৃঙ্গবেরপুর' (এখনকার মির্জাপুরের কাছে)।

'রাম' দেখুন।

গোকর্ণ: এখানকার আশ্রমেই ভগীরথ রাবণ, কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণ কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার বর লাভ করেন।

গৌতম: মহাশক্তিমান ঋষি। অহল্যার স্বামী। শতানন্দের বাবা। এঁর শাপেই অহল্যাকে পাষাণী হয়ে থাকতে হয়। এক হাজার বছর। অণ্ডকোষ খসে পড়ে ইন্দ্রের।

'অহল্যা' দেখুন।

ঘটোৎভব: অগস্ত্যে মুনির অন্য নাম। 'অগস্ত্য' দেখুন।

ঘৃতাচী: স্বর্গের ডাকসাইটে সুন্দরী অপ্সরা।
অনেক বিখ্যাত সন্তানের জন্ম দিয়েছেন ঘৃতাচী। তার মধ্যে আছেন, দ্রোণাচার্য, শুকদেব, রুরু, গাধি ইত্যাদি।
'শুকদেব' এবং 'গাধি' দেখুন।

চিত্রকূট পর্বত: বনবাসকালে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা, ভরদ্বাজ মুনির পরামর্শে, কিছুদিন এই পর্বতে বাস করেন। প্রয়াগ থেকে প্রায় দশ ক্রোশ দূরে এই পর্বত। ভরত এখানেই এসে রামের সঙ্গে দেখা করে রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। (চিত্রকূট এখনকার বান্দা জেলার কাছাকাছি।)
আরও তথ্যের জন্য 'রাম' দেখুন।

চিত্রাঙ্গদা: রাবণের স্ত্রী। বীরবাহুর মা।

জটায়ু: পক্ষিরাজ । বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের ভাই অরুণের ছেলে। মা শ্যেনী। সম্পাতির ভাই। দশরথের বিশিষ্ট বন্ধু।
রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় সীতার কান্না শুনে জটায়ু ছুটে যান। এবং রাবণের সঙ্গে তুমুল লড়াই করেন। রাবণ জটায়ুর ডানা কেটে দেন। জটায়ু অসহায়ভাবে মাটিতে পড়ে যান।
সীতার খোঁজে বেরিয়ে রক্তাক্ত জটায়ুকে দেখতে পান রাম। তাঁর মনে হয়, এই দুষ্ট পাখিই নিশ্চয়ই তাঁর স্ত্রীকে খেয়েছে। জটায়ুকে হত্যা করতে যান রাম। জটায়ু তখন যা ঘটেছে, সব বলেন রামকে। এরপরই জটায়ুর মৃত্যু হয়।
বাবার বন্ধুর দেহের যথোচিত মর্যাদাসহ সৎকারের ব্যবস্থা করেন রাম এবং লক্ষ্মণ।
আরও তথ্যের জন্য 'রাম', 'সীতা', 'রাবণ' এবং 'সম্পাতি' দেখুন।

জনক: মিথিলার রাজা। আসল নাম 'সীরধ্বজ'।
বস্তুত, 'জনক' কোনও নাম নয়। উপাধি মাত্র। 'মিথিলা' নাম যাঁর নাম থেকে এসেছে, সেই 'মিথি'রই আর এক নাম ছিল 'জনক'। মিথির পরবর্তী বংশধর রাজারা সকলেই 'জনক' উপাধি গ্রহণ করেন।
বিষ্ণুপুরাণ মতে, ৫৬ জন জনক ছিলেন। ভাগবত মতে, ৫৩ জন। তবে, সীতার বাবা সীরধ্বজকেই সাধারণত 'জনক' বা 'জনক রাজা' বলা হয়।
সীতার পালক পিতা। ঊর্মিলার জন্মদাতা পিতা। মাণ্ডবী এবং শ্রুতকীর্তির জ্যাঠামশাই। কুশধ্বজের দাদা। হ্রস্বরোমার ছেলে।
খেতে লাঙলের ফলার দাগ (সীতা) থেকে এক পরমাসুন্দরী শিশু কন্যাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। তাই তার নাম রাখেন 'সীতা'।
বীর্যশুল্কা সীতাকে বিয়ে করতে চান সাংকাশ্যার রাজা 'সুধন্বা'। জনক রাজি হন না। সুধন্বা মিথিলা অবরোধ করেন। জনক সুধন্বাকে বধ করে ভাই কুশধ্বজকে সাংকাশ্যার রাজা করে দেন।

রাম হরধনু ভেঙে সীতাকে বিয়ে করলে, আনন্দে অধীর হয়ে ওঠেন জনক। এই রকম জামাই-ই তো তিনি চেয়েছিলেন।

জনক ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী। রাজর্ষি। তাঁর যোগ আর ভোগ দুইই ছিল। এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল।

'রাম' এবং 'সীতা' দেখুন।

জমদগ্নি: মহাতেজস্বী ঋষি। পরশুরামের বাবা। সত্যবতী (কৌশিকী) এবং ঋচীকের ছেলে। ভৃগুর নাতি। গাধির দৌহিত্র। বিশ্বামিত্রের ভাগ্নে। রেণুকার স্বামী। শুনঃশেফ এবং শুনঃপুচ্ছের দাদা।

এঁর আদেশে, এঁর ছেলে পরশুরাম নিজের মা রেণুকার মাথা কেটে ফেলেন। পরে এঁর বরে রেণুকা আবার জীবন ফিরে পান।

'পরশুরাম' দেখুন।

জম্বুমালী: প্রহস্তের ছেলে। অশোকবন ধ্বংস করার সময় হনুমানকে বাধা দিতে গিয়ে হনুমানের হাতে প্রাণ দেন।

'হনুমান' দেখুন।

জয়ন্ত কাক (একাক্ষ): এক পৌরাণিক কাক।

চিত্রকূট পর্বতে সীতা একদিন যখন ঘুমোচ্ছিলেন, তখন 'জয়ন্ত' নামে এক কাক সীতার বুকে আঁচড়ে দিয়ে, খুব অন্যায় হয়েছে বুঝতে পেরে, প্রাণভয়ে পালাতে থাকে।

সীতার চিৎকারে ছুটে এসে, সব শুনে, রাম এক বাণ ছোড়েন। সেই বাণ কাককে তাড়া করে বেড়ায়।

প্রাণভয়ে কাক স্বর্গে গিয়ে দেবতাদের পায়ে পড়ে। দেবতারা তাকে স্বয়ং রামের শরণাগত হতে বলেন। কাক তাই করলে, রামের বাণ একে প্রাণে না মেরে, শুধু এর একটা চোখ উপড়ে নেয়।

তাই এর নাম একাক্ষ। (অক্ষি = চোখ। একাক্ষ = একচোখো)।

'সীতা' দেখুন।

জাম্ববান: ভল্লুকরাজ। ব্রহ্মার ছেলে। সুগ্রীবের মন্ত্রী।

জাম্ববান ত্রেতাযুগে রামকে সীতা উদ্ধারে সাহায্য করেছিলেন।

দ্বাপরে 'স্যমন্তক মণি'-র দখল নিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে একুশ দিন এঁর যুদ্ধ হয়। যখন জানতে পারলেন, রামই কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, তখন কৃষ্ণকে স্যমন্তক মণি দিয়ে দিলেন। আর নিজের মেয়ে জাম্ববতীকেও কৃষ্ণের হাতে সঁপে দিয়ে, বিষ্ণুর ধ্যান করতে করতে দেহত্যাগ করলেন।

জয়-বিজয়: স্বর্গে বিষ্ণুর দ্বাররক্ষক দুই ভাই।

একদিন ঋষিদের বিষ্ণুর সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়ায়, ঋষিরা শাপ দিলেন, 'তোরা মর্তে মানুষ হয়ে জন্মাগে যা'।

দু'ভাই কেঁদে পড়লেন ঋষিদের পায়ে।

ঋষিরা বললেন, 'বিষ্ণুর ভক্ত হয়ে জন্মালে সাত জন্মে, আর শত্রু হয়ে জন্মালে তিন জন্মেই মুক্তি লাভ করবি। এখন তোদের যা ইচ্ছে।'

জয়-বিজয় তাড়াতাড়ি বিষ্ণুর কাছে ফিরে আসতে চান।তাই বিষ্ণুর শত্রু হয়েই জন্মাতে চাইলেন।

সত্য যুগে জয় হলেন 'হিরণ্যাক্ষ'। বিজয় হলেন 'হিরণ্যকশিপু'।

ত্রেতা যুগে জয় হলেন 'রাবণ'। বিজয় হলেন 'কুম্ভকর্ণ'। দ্বাপরে জয় হলেন 'শিশুপাল'। বিজয় হলেন 'দন্তবক্র'।

অর্থাৎ, জয় = হিরণ্যাক্ষ (সত্য), রাবণ (ত্রেতা), শিশুপাল (দ্বাপর)।

বিজয় = হিরণ্যকশিপু (সত্য),কুম্ভকর্ণ (ত্রেতা), দন্তবক্র (দ্বাপর)।

জহ্নু: এক মতে রাজা। এক মতে রাজর্ষি। সুহোত্র এবং কেশিনীর ছেলে। কাবেরীর স্বামী। সুনহের বাবা।

গঙ্গা এঁকে বিয়ে করতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাতা হন। সেই রাগে গঙ্গা এঁর যজ্ঞভূমি ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ায়, ইনি গঙ্গাকে খেয়ে ফেলেন। পরে, দেবতাদের অনুরোধে গঙ্গাকে মুক্তি দেন। এঁর নাম অনুসারেই গঙ্গার 'জাহ্নবী' নাম।

কেউ বলেন, গঙ্গাকে জহ্নু তাঁর জানু দিয়ে বার করে দেন।

কেউ বলেন 'কান' দিয়ে।

আরও তথ্যের জন্য 'ভগীরথ' এবং 'গঙ্গার মর্তে অবতরণ' দেখুন।

জাবালি: একজন বাস্তববাদী মুনি।

দশরথের রাজ-পরিবারের উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ। বনবাস থেকে রামকে ফেরাতে ভরতের সঙ্গে চিত্রকূটে যান। রামকে প্রয়োজনে পিতৃসত্যকে অগ্রাহ্য করে রাজমুকুট ধারণের পরামর্শ দিলে, রাম এঁকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেন।

জামদগ্ন্য: পরশুরামের অন্য নাম। 'পরশুরাম' দেখুন।

জাম্ববতী: কৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী । ভল্লুক-রাজ জাম্ববানের মেয়ে। কৃষ্ণের মর্তলীলা সাঙ্গ হলে, ইনি আগুনে আত্মাহুতি দেন।

জাহ্নবী: গঙ্গার অন্য নাম। 'গঙ্গার মর্তে অবতরণ' এবং 'জহ্নু' দেখুন।

জৃম্ভিক: ঘুমপাড়ানি অস্ত্র।

তাড়কাবধের পর বিশ্বামিত্র এই অস্ত্র দেন রামকে। বিশ্বামিত্র এ অস্ত্র পেয়েছিলেন অগ্নির কাছে। লব-কুশও এ অস্ত্রের ব্যবহার জানতেন।

তক্ষ-পুষ্কল: ভরত আর মাণ্ডবীর দুই ছেলে তক্ষ আর পুষ্কল।

ভরত দুই ছেলেকে নিয়ে গান্ধার (এখনকার কান্দাহার) জয় করে দুই ছেলের নামে দুই নগরীর পত্তন করেন। তক্ষের নামে হয় 'তক্ষশীলা' নগরী। আর পুষ্কলের নামে হয় 'পুষ্কলাবতী'।

তক্ষশীলার রাজা হন তক্ষ। পুষ্কল হন পুষ্কলাবতীর রাজা।

'ভরত' দেখুন।

তমসা নদী: রামায়ণের বিখ্যাত নদী।

মহাকবি বাল্মীকি এই তমসার তীরেই বিশ্বের প্রথম কবিতা ('মা নিষাদ...') রচনা করেন।

বনে যাওয়ার সময় সুমন্ত্র তমসার তীর পর্যন্ত এসে রামের অনুরোধে ফিরে যান। রাম এখানে বনবাসের তৃতীয় রাত কাটান।

'রাম' দেখুন।

তরণীসেন: বিভীষণ এবং সরমার ছেলে।

বাল্মীকি-রামায়ণে এঁর কোনও উল্লেখ নেই। কৃত্তিবাস তরণীসেন চবিত্রটিকে মহাভারতের অভিমন্যুর আদলে গড়েছেন।

বিভীষণ দাদাকে ত্যাগ করে রামের পক্ষে চলে এলেও, তাঁর স্ত্রী-পুত্ররা রাবণের কাছেই ছিলেন। রাবণ এই ভাইপোটিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কিন্তু, তরণীসেন মনে মনে রাম-ভক্ত ছিলেন।

যুদ্ধে রামের হাতে ঈপ্সিত মৃত্যু বরণ করেন তরণীসেন। বিভীষণ ছেলের মৃত্যুর পর রামের কাছে ছেলের পরিচয় দিলে, রাম এই হঠকারিতার জন্য বিভীষণকে তিরস্কার করেন এবং অত্যন্ত অনুতপ্ত হন।

তাড়কা: রামায়ণের স্বনামধন্যা রাক্ষসী।

যক্ষ সুকেতুর মেয়ে। দৈত্য জম্ভের ছেলে সুন্দের স্ত্রী। মারীচের মা।

ব্রহ্মার আশীর্বাদে সুকেতু তাড়কাকে মেয়ে হিসেবে পান।

অগস্ত্যকে কোনও কারণে একবার রাগিয়ে দেওয়ায়, অগস্ত্য সুন্দকে মেরে ফেলেন। তাড়কা আর মারীচ তখন খেতে যান অগস্ত্যকে। অগস্ত্যের শাপে তাড়কা হয়ে যান বিকট চেহারার এক রাক্ষসী। আর মারীচ হন কদাকার এক রাক্ষস।

'মলদ' আর 'করুষ' নামে দুটো নগরকে ধ্বংস করে সেখানে সপুত্র বাস করতে থাকেন তাড়কা। অগস্ত্য আর বিশ্বামিত্রের আশ্রমে মা ছেলের অত্যাচার তুঙ্গে ওঠে।

প্রতিকার করতে, বিশ্বামিত্র নিয়ে আসেন রাম-লক্ষ্মণকে। রামকে দেখে তাড়কা তেড়ে আসেন। নানা মায়ার আশ্রয় নেন। তাড়কা নারী বলে প্রথমে রাম তাঁকে মারতে চাননি। শেষে, বিশ্বামিত্রের নির্দেশে, রাম তাড়কাকে বধ করেন।

বিশ্বামিত্রের আশ্রমে পৌঁছে সদ্যোমাতৃহারা মারীচকে প্রাণে না মেরে, রাম তাঁকে মানবাস্ত্রের সাহায্যে একশো যোজন দূরে ছুড়ে ফেললেন।

'রাম' দেখুন।

তার: সুগ্রীবের চার মন্ত্রীর অন্যতম।

সীতার খোঁজে হনুমানের সঙ্গে কিষ্কিন্ধ্যার দক্ষিণে যান।

তারা: বালীর স্ত্রী। পরবর্তী কালে সুগ্রীবও এঁকে বিয়ে করেন। বানরদের বৈদ্য সুষেণ এঁর বাবা। এঁর ঠাকুরদা বরুণ।

প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার (অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা এবং মন্দোদরী) অন্যতমা।

অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন 'তারা'। বালী, মারা যাওয়ার আগে, সুগ্রীবকে 'তারা'র

পরামর্শ মতো কাজ করার উপদেশ দিয়েছেন।

'দুন্দুভি' অসুরের ছেলে 'মায়াবী'কে মারতে এক সুড়ঙ্গে ঢুকেছিলেন বালী। সুগ্রীবকে বলেছিলেন, 'আমি না ফেরা পর্যন্ত তুই এই সুড়ঙ্গের মুখে পাহারায় থাকিস'। এক বছর হয়ে গেল। তবু বালী ফিরলেন না।

একদিন। সুড়ঙ্গের মুখ থেকে বেরিয়ে এল রক্ত আর গর্জনের শব্দ। ভয় পেলেন সুগ্রীব। ভাবলেন, দাদা মারা গেছেন। মায়াবীর ফিরে-আসা ঠেকাতে সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে দিলেন। প্রকাণ্ড এক পাথর দিয়ে। বালী মারা গেছেন ধরে নিয়ে, সবাই সুগ্রীবকেই রাজা করলেন।

বউদি 'তারা'-র প্রতি বরাবরই সুগ্রীবের দুর্বলতা ছিল। এখন সুযোগ বুঝে, সুগ্রীব 'তারা'কে বিয়ে করলেন। কিছুদিন পরেই, ফিরে এলেন বালী। ভাইকে তাড়িয়ে দিয়ে 'তারা'র সঙ্গে সুগ্রীবের স্ত্রী রুমাকেও নিজের স্ত্রী করে নিলেন।

রামের প্রতিশ্রুতি মতো, সুগ্রীব একদিন এলেন বালীর সঙ্গে লড়াই করতে। মার খেয়ে পালালেন। দ্বিতীয় দিন আবার যখন সুগ্রীব এসে গর্জন করতে লাগলেন, বালী ছুটে বেরিয়ে আসতে চাইলে, 'তারা' তাঁকে আটকালেন। বললেন, 'সুগ্রীব যখন ফিরে এসেছে আবার, নিশ্চয়ই বেশ শক্তি সংগ্রহ করেই এসেছে। সম্ভবত রাম-লক্ষ্মণ আছে ওর সঙ্গে। অঙ্গদ আমাকে সব বলেছে। তুমি সুগ্রীবকে যুবরাজ করে রামের সঙ্গে ভাব করে নাও। বিরোধে যেয়ো না।'

বালী কথা শুনলেন না। রামের হাতে প্রাণ দিলেন। 'তারা' রামকে বললেন, 'যে বাণে আপনি আমার স্বামীকে মেরেছেন, সেই বাণেই আমাকেও মারুন। আমি বলছি, আপনার স্ত্রী-হত্যার পাপ হবে না।'

সেই 'তারা'ই কিন্তু, মাত্র দু'মাসের মধ্যেই, স্বামীর শোক ভুলে, দেওরের গলায় দ্বিতীয়বার মালা দিয়েছেন। মনে হয়, দিতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, সমাজের বিধান তখন সে রকমই ছিল।

এঁর একমাত্র সন্তান বালীর ঔরসজাত। অঙ্গদ।

সুগ্রীব সীতা উদ্ধারের কথা ভুলে গেলে লক্ষ্মণ এলেন সুগ্রীবকে শাসাতে। তখন 'তারা' আকণ্ঠ মদ্যপান করে, টলতে টলতে লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে লক্ষ্মণকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'বুঝতেই তো পারছেন, রাজ্য, রুমা আর আমাকে পেয়ে, সুগ্রীব একটু আমোদ-ফুর্তি করছেন। তাই সীতার কথা ভুলে গেছেন। ছোট ভাই মনে করে ওঁকে ক্ষমা করে দিন। সুগ্রীবকে ভুল বুঝবেন না। উনি রামের জন্য নিজের রাজ্য, অঙ্গদ, রুমা এমনকী আমাকেও, ত্যাগ করতে পারেন।'

সম্ভবত, বালীর মৃত্যুর পর রামের মুখে অনেক মূল্যবান উপদেশ শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল বলেই, ভ্রষ্টচরিত্রা হয়েও, 'তারা' প্রাতঃস্মরণীয়া হয়ে আছেন।

'রাম', 'বালী' এবং 'সুগ্রীব' দেখুন।

তুম্বুরু: বিরাধের পূর্বজন্মের নাম। 'বিরাধ' দেখুন

তৃণবিন্দু: রাবণের ঠাকুরমা হবির্ভূর বাবা। পুলস্ত্যের শ্বশুর মশাই।

ত্রিকূট: তিন চূড়াওয়ালা বিশাল পর্বত। এর ওপরেই ছিল রাবণের লঙ্কা নগরী।

ত্রিজট: অযোধ্যার এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

বনে যাওয়ার সময় রাম খুব দান ধ্যান করছেন শুনে ত্রিজট ছুটে এলেন। রাম বললেন, 'আপনি যত দূর পর্যন্ত লাঠি ছুড়তে পারবেন, তত দূর পর্যন্ত সব গরু আপনার।'

ব্রাহ্মণের লাঠি সরযূ নদীও পার হয়ে গেল। রামের প্রতিশ্রুতি মতো গরু পেলেন তিনি।

ত্রিজটা: লঙ্কার এক ধর্মপ্রাণা বৃদ্ধা রাক্ষসী।

অশোক বনে সীতাকে দেখাশোনার ভার পেয়েছিলেন বৃদ্ধা রাক্ষসী ত্রিজটা। বিভীষণের স্ত্রী সরমার মতো, ইনিও, সীতার অত্যন্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন। কেউ কেউ ত্রিজটাকে বিভীষণের মেয়ে বলেছেন। 'বৃদ্ধা' বিশেষণ কিন্তু সে মতকে অগ্রাহ্য করে।

তাঁর দেখা দুঃস্বপ্নের কথা বলে, ত্রিজটা রাক্ষসীদের ভয় দেখান। এবং সীতাকে তাদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচান।

রাবণের নির্দেশে, রাক্ষসীরা পুষ্পকে করে সীতাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যান। রাবণের মায়ায় মৃত রাম-লক্ষ্মণকে দেখে সীতা শোকে একেবারেই ভেঙে পড়েন। অতঃপর রাবণকে বিয়ে করতে সীতা আর আপত্তি করবেন না, এই ছিল দশাননের ধারণা।

ত্রিজটা সীতাকে অভয় দিয়ে বোঝান, এ সবই মিথ্যে। রাবণের মায়া মাত্র। রাম-লক্ষ্মণ বেঁচেই আছেন। এবং সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। তাঁরা শিগ্‌গিরি সীতাকে উদ্ধার করবেন।

ত্রিশঙ্কু: ইক্ষ্বাকু বংশের এক রাজা।

সশরীর স্বর্গে যাওয়ার উপায় করে দিতে বলেন কুলগুরু বশিষ্ঠকে।

বশিষ্ঠ রাজি হন না। তখন একে একে বশিষ্ঠের একশো ছেলের কাছে একই প্রার্থনা নিয়ে যান ত্রিশঙ্কু। সকলেই প্রত্যাখ্যান করেন। অভিমানে ত্রিশঙ্কু বলেন, তিনি অন্য কারও সাহায্যে সশরীর স্বর্গে যাবেন। বশিষ্ঠের ছেলেরা ত্রিশঙ্কুকে চণ্ডাল হওয়ার শাপ দেন।

চণ্ডাল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে বশিষ্ঠের চিরশত্রু বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হন ত্রিশঙ্কু। বিশ্বামিত্র রাজি হয়ে এক মহাযজ্ঞ শুরু করেন। যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়েও, বশিষ্ঠ এবং তাঁর ছেলেরা এলেন না। দেবতারাও যজ্ঞের ভাগ নিতে এলেন না। সম্ভবত, বশিষ্ঠকে জব্দ করতেই বিশ্বামিত্র নিজের তপস্যালব্ধ শক্তি প্রয়োগ করে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গের দিকে পাঠালেন।

ইন্দ্র ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে ঢুকতে দিলেন না। কারণ, ত্রিশঙ্কু শাপগ্রস্ত। চণ্ডাল হয়ে গেছেন। দেবতারা ত্রিশঙ্কুকে নীচে নেমে যেতে বললেন।

বিশ্বামিত্রও দমবার পাত্র নন। 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলে তিনি ত্রিশঙ্কুকে আকাশেই আটকে দিলেন। সৃষ্টি করলেন নতুন নক্ষত্রলোক। আর সপ্তর্ষিমণ্ডল।

নতুন দেবতা আর ইন্দ্রও সৃষ্টি করতে যাচ্ছিলেন। দেবতারা ভয় পেয়ে ছুটে এলেন বিশ্বামিত্রের কাছে। বললেন, 'ঠিক আছে। দক্ষিণ আকাশে আপনি যে নতুন তারামণ্ডল

তৈরি করেছেন, সেখানেই, মাথা নীচের দিকে রেখে, ত্রিশঙ্কু দেবতার মর্যাদা নিয়ে বাস করতে পারবেন।'

হরিবংশ মতে, ত্রিশঙ্কু ছিলেন মহারাজ এয্যরুণের ছেলে। নাম ছিল সত্যব্রত। পরস্ত্রী-হরণের অপরাধে এয্যরুণ ছেলেকে বারো বছরের জন্য নির্বাসন দেন। আর বলেন, চণ্ডালের সঙ্গে বাস করতে। এয্যরুণের কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ এর কোনও প্রতিবাদ করেননি।

সত্যব্রত চণ্ডাল অবস্থায় যে দেশে বাস করছিলেন, ইন্দ্র সেখানে বারো বছর ধরে বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন। দেখা দিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ।

বিশ্বামিত্র তাঁর স্ত্রীকে ওই দেশেই রেখে তপস্যায় গিয়েছিলেন। সে সময় সত্যব্রতই বিশ্বামিত্রের পরিবারের অন্নবস্ত্রের জোগান দেন। নির্বাসনকাল শেষ হওয়ার মুহূর্তে, প্রচণ্ড খিদের জ্বালায়, সত্যব্রত একদিন বশিষ্ঠের কামধেনুকে মেরে, নিজে খান এবং বিশ্বামিত্রের ছেলেদেরও গোমাংস দেন।

রাগে অন্ধ বশিষ্ঠ সত্যব্রতকে 'ত্রিশঙ্কু' বলে ঘোষণা করেন। তিনটে মহাপাপ করেছেন। তাই ত্রিশঙ্কু।

প্রথম পাপ, বাবার ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কাজ করা।

দ্বিতীয় পাপ, গুরুর কামধেনুকে হত্যা করা।

তৃতীয়, গোমাংস খাওয়া।

বশিষ্ঠের শাপের বদলা নিতে, বিশ্বামিত্র কৃতজ্ঞতায় সত্যব্রতকে তাঁর প্রার্থনা মতো সশরীর স্বর্গে যাওয়ার বর দেন। এর পর বিশ্বামিত্র শুরু করেন মহাযজ্ঞ। দেবতারা বশিষ্ঠকে গুরুত্ব না দিয়ে, বিশ্বামিত্রের বর আর ত্রিশঙ্কুর ইচ্ছেকেই মেনে নেন। এই ত্রিশঙ্কুরই ছেলে রাজা হরিশ্চন্দ্র।

'বশিষ্ঠ', 'বিশ্বামিত্র' এবং 'হরিশ্চন্দ্র' দেখুন।

ত্রিশিরা (ত্রিশির): রাবণের ছেলে।

অন্য ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়ে হনুমানের থাপ্পড় খেয়ে মাটিতে পড়ে যান। হনুমান তখন এঁর ত্রিশির (তিন মাথা) কেটে দেন। তিনটে মাথা ছিল বলেই, এঁর নাম ছিল 'ত্রিশির' বা 'ত্রিশিরা'।

দধিমুখ: সুগ্রীবের মামা। মধুবনের রক্ষক। (রেঞ্জার/ফরেস্টার?)

দণ্ড/দণ্ডক: ইক্ষ্বাকুর একশো ছেলের মধ্যে সবার ছোট।

'এই বোকা, অপদার্থ ছেলের কপালে অনেক দণ্ডভোগ আছে,' এই ভেবে ইক্ষ্বাকু বিন্ধ্য আর শৈবাল পর্বতের মাঝখানে মধুমন্ত নামে এক নগর তৈরি করে, দণ্ডকে তার রাজা করে দিলেন। রাজপুরোহিত শুক্রাচার্যের বড় মেয়ে, অব্জাকে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে ধর্ষণ করায়, শুক্রাচার্যের অভিশাপে এক সপ্তাহের মধ্যে দণ্ড এবং তাঁর গোটা রাজ্যই ধ্বংস হয়।

ইন্দ্র তার ওপর বৃষ্টির মতো ধুলো ফেলে গোটা রাজ্যটাকেই ধুলো দিয়ে ঢেকে দেন। পরে, সেখানে নর্মদা আর গোদাবরীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে গড়ে ওঠে এক বিশাল গভীর অরণ্য। দণ্ডের নাম অনুসারে সেই অরণ্যের নাম হয় 'দণ্ডকারণ্য'।

বনবাসের বেশিরভাগ সময়ই রাম কাটান দণ্ডকারণ্য বা দণ্ডকবনে।
আরও তথ্যের জন্য 'রাম' দেখুন।

দণ্ডকারণ্য/দণ্ডকবন: রামায়ণের বিখ্যাত সুবিশাল ঘন বনাঞ্চল। রামের বনবাসের বেশিরভাগ সময়ই কাটে এই বনে।
আরও জানার জন্য 'দণ্ড/দণ্ডক' এবং 'রাম' দেখুন।

দন্তবক্র: রামের বন্ধু এবং বিদূষক-সভাসদ্। সীতার সম্বন্ধে অযোধ্যার জনরবের বিষয়ে 'ভদ্র'র বক্তব্যকে ইনি সমর্থন করেন। সেই মতো সীতাকে ত্যাগ করেন রাম।
'ভদ্র' দেখুন।

দশরথ: রামের বাবা। অজ এবং ইন্দুমতীর ছেলে। রঘু বংশের আদি পুরুষ রঘুর নাতি।
অযোধ্যার রাজা। কৌশল্যা, কৈকেয়ী আর সুমিত্রা—এই তিন জন ছিলেন রাজার পাটরানি। এ ছাড়া আরও সাড়ে তিনশো স্ত্রী ছিল এঁর।
ছেলে ছিল না বলে, নিজেরই জামাই, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে দিয়ে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করালেন দশরথ। এর ফলে, কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত, আর সুমিত্রার গর্ভে দুই যমজ ছেলে, লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্নর জন্ম হল।
একমাত্র মেয়ে শান্তাকে দত্তক হিসেবে বন্ধু লোমপাদকে দিয়েছিলেন দশরথ। শান্তার বরই ঋষ্যশৃঙ্গ।
দেবাসুরের যুদ্ধে, দেবতাদের হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারাত্মক আঘাত পান দশরথ। স্ত্রী কৈকেয়ী খুব সেবা করে সুস্থ করে তোলেন দশরথকে। দশরথ দুটি বর দিতে চান।
কৈকেয়ী বলেন, 'পরে সময় মতো নেব সেই বর।'
সময়মতোই বর চেয়েছিলেন কৈকেয়ী। রাম রাজা হবেন। সব ঠিকঠাক। কুব্জা দাসী মন্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ী সেই দুই বর চেয়ে নিলেন দশরথের কাছে। এক বরে, রাম চোদ্দো বছরের জন্য বনে যাবেন। অন্য বরে, ভরত রাজা হবেন।
একবার। মৃগয়ায় গিয়ে জলপানরত হরিণ ভেবে দশরথ ভুল করে এক ঋষিকুমারকে শব্দভেদী বাণ ছুড়ে মেরে ফেলেন। সেই ঋষিকুমারের মা-বাবা দু'জনেই ছিলেন অন্ধ। ঋষিকুমারের বাবা অন্ধক মুনি শাপ দেন দশরথকে, 'তোমাকেও এই পুত্রশোকেই মরতে হবে রাজা দশরথ!'
সেই শাপই সত্যি হল। লক্ষ্মণ আর সীতাকে নিয়ে বনে গেলেন রাম। পুত্রশোকে প্রাণ হারালেন দশরথ।
লঙ্কায় সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে দেখা দিয়েছেন দশরথ। প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছেন সবাইকে।
কৈকেয়ী ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী। সে কারণে কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের বিশেষ দুর্বলতা ছিল। সে জন্য ঘরে-বাইরে সকলেই দশরথের সমালোচনা করেছেন। এই দোষটুকু বাদ দিলে, দশরথের গুণের শেষ নেই। সত্যনিষ্ঠ দৃঢ় আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। মুনি ঋষিদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাবাপন্ন।
সম্ভবত, একই সঙ্গে দশ দিকে তাঁর রথ ছুটত বলেই তাঁর নাম 'দশরথ' হয়েছে।

তবে এখানে একটা প্রশ্ন থাকে। জন্মেই তো আর তিনি দশ দিকে রথ ছোটাননি। তা হলে? তা হলে কেন তাঁর নাম 'দশরথ' হল? রহস্য থেকেই যায়।

'রাম', 'লক্ষ্মণ', 'ভরত', 'শত্রুঘ্ন,' 'কৌশল্যা', 'কৈকেয়ী', 'সুমিত্রা' এবং 'শান্তা' দেখুন।

দিলীপ: ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা।

অংশুমানের ছেলে। অসমঞ্জের নাতি। সগর রাজার প্রপৌত্র। রঘু এবং ভগীরথের বাবা। অজ-র ঠাকুরদা। দশরথের প্রপিতামহ। রামের বৃদ্ধ প্রপিতামহ। সুদক্ষিণার স্বামী।

স্বর্গের কামধেনু সুরভিকে অপমান করায় সুরভি দিলীপকে শাস্তি দেন— 'তোমাকে সুরভির মেয়ে নন্দিনীর সেবা করতে হবে।'

দিলীপ-সুদক্ষিণার সেবায় খুশি হয়ে নন্দিনী তাঁদের পুত্রলাভের বর দেন। সেই বরেই রঘুর জন্ম হয়।

আরও তথ্যের জন্য 'সুরভি' আর 'রঘু' দেখুন।

দুন্দুভি: মহাশক্তিধর রাক্ষস। ইনি মোষের (মহিষ) রূপ ধরে থাকতেন। অপ্সরা হেমার গর্ভজাত ময়দানবের ছেলে। কশ্যপ এবং দিতির নাতি। মন্দোদরী এবং মায়াবীর ভাই। রাবণের শ্যালক।

মহাবলশালী গর্বিত দুন্দুভি একদিন সমুদ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। সমুদ্র দুন্দুভিকে বললেন, 'শিবের শ্বশুর হিমবানের সঙ্গে যুদ্ধ করো।'

হিমবান বললেন, 'আমি তপস্বীদের আশ্রয়দাতা মাত্র। যুদ্ধ-টুদ্ধ জানি না। তুমি বরং মহাবল কিষ্কিন্ধ্যারাজ ইন্দ্রপুত্র বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করো।'

দুন্দুভি কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে বালীকে অহঙ্কারী কথাবার্তা বলে উত্তেজিত করে তুললেন। বালী দুই শিং ধরে তুলে আছাড় মারলেন দুন্দুভিকে। ঘুষি, লাথি আর পাথরের ঘা মেরে দুন্দুভির ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন। তারপর দুন্দুভির দেহটাকে তুলে ছুড়ে ফেললেন এক যোজন (প্রায় আট মাইল) দূরে।

দুন্দুভির মুখের রক্ত হাওয়ায় উড়ে গিয়ে পড়ল ঋষ্যমূক পর্বতে। মতঙ্গ মুনির আশ্রমে। মতঙ্গ শাপ দিলেন, 'যে এ কাজ করেছে, সে আমার আশ্রমের এক যোজনের মধ্যে এলেই মারা পড়বে।'

খবর পেয়ে বালী ছুটলেন মতঙ্গের কাছে। ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু ক্ষমা পেলেন না। বালী মতঙ্গের শাপে 'ঋষ্যমূক পর্বতে আসতে পারবেন না' জেনেই, সুগ্রীব বালীর ভয়ে ঋষ্যমূকে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আরও তথ্যের জন্য 'বালী' দেখুন।

দুর্ধর্ষ: রাবণের বিশ্বস্ত এক সেনাপতি।

অশোকবনে হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধ-করতে-পাঠানো রাবণের পাঁচ সেনাপতির অন্যতম। হনুমানের হাতে নিহত হন দুর্ধর্ষ।

দুর্বাসা: অত্যন্ত বদ্‌রাগী এক মুনি। রামায়ণে আছেন। মহাভারতেও আছেন।

অনসূয়ার গর্ভজাত। অত্রি ঋষির ছেলে। শিবের স্ত্রী সতীর বোনপো। দত্তাত্রেয়

এবং চন্দ্র বা সোমের ভাই। ঔর্ব মুনির মেয়ে কন্দলীর স্বামী।

কথায় কথায় শাপ দেওয়া, ভস্ম করে দেওয়া ইত্যাদির জন্যই পৌরাণিক কাহিনীতে দুর্বাসা সুপরিচিত। স্ত্রী কন্দলীর একশো অপরাধ ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বিয়ের সময়। স্ত্রীর অপরাধের সংখ্যা একশো পার হতেই, স্ত্রীকে ভস্ম করে দেন। ঔর্ব শাপ দেন, 'তোমার এই দর্প চূর্ণ হবেই হবে।' হলও তাই।

সূর্যবংশীয় রাজা অম্বরীষ এক বছর ধরে এক ব্রত পালন করেছিলেন। ব্রত পালনের শেষে, তিন দিন উপোস করে তিনি যেই পারণের জন্য বসেছেন, ঠিক তক্ষুনি দুর্বাসা এসে খেতে চাইলেন।

দুর্বাসা স্নানে গেলেন। গেলেন তো গেলেনই। আর ফেরেন না। অন্য ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে, অম্বরীষ সবে বিষ্ণুর চরণামৃত পান করেছেন। অমনি দুর্বাসা এসে হাজির। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে মাথার জটা ছিঁড়ে ফেললেন মাটিতে। জটা থেকে সৃষ্টি হল এক উগ্রদেবতার। তিনি অম্বরীষকে মারতে গেলে, বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র তাঁকে কেটে ফেলল।

সুদর্শন এবার ধাওয়া করল দুর্বাসাকে। দুর্বাসা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়লেন। ত্রিভুবনে কেউ তাঁকে আশ্রয় দিলেন না। শেষে, কৃষ্ণের পরামর্শে, অম্বরীষের কাছেই ক্ষমা চেয়ে প্রাণ বাঁচালেন। শ্বশুর ঔর্বের শাপ ফলে গেল।

কুন্তীর সেবায় খুশি হয়ে দুর্বাসা কুন্তীকে দেবতাদের ডাকার মন্ত্র শিখিয়ে দেন। সেই মন্ত্রের শক্তি পরীক্ষা করতে গিয়ে কুন্তী সূর্যকে ডেকে কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হন। লোকলজ্জা ঢাকতে কর্ণকে ভাসিয়ে দেন জলে। পরে, পাণ্ডুর অনুরোধে, ধর্ম, পবন আর ইন্দ্রকে ডেকে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম আর অর্জুনকে সন্তান-হিসেবে পান। মাদ্রীর অনুরোধে মাদ্রীকেও শেখান সেই মন্ত্র। মাদ্রীরও দুই যমজ ছেলে হয়। নকুল-সহদেব।

দুর্বাসাকে দেওয়া এক অপ্সরার 'সন্তানক' মালা ইন্দ্রের ঐরাবত ছিঁড়ে ফেলায়, দুর্বাসার শাপে ইন্দ্র রাজ্যহারা হন।

একদিন। শকুন্তলা কণ্বমুনির আশ্রমে বসে দুষ্মন্তের চিন্তায় এতই মগ্ন হয়ে ছিলেন, যে, অতিথি দুর্বাসার যথোচিত সেবা করার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন।

খ্যাপা-দুর্বাসা সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ঝুলি থেকে শাপ বার করতে ছাড়েননি। বললেন, ' যার চিন্তায় তুমি এত মগ্ন, সে তোমায় ভুলে যাবে।'

শকুন্তলার দুই সখী অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা দুর্বাসার পায়ে পড়লেন। দুর্বাসা বললেন, 'কোনও অভিজ্ঞান (চেনবার মতো চিহ্ন) দেখাতে পারলে তাঁর আবার সব মনে পড়ে যাবে।'

দুষ্মন্তের দেওয়া আংটি শকুন্তলার হাত থেকে জলে পড়ে। সেই আংটি এক মাছ খায়। সেই মাছকে ধরে এক জেলে। তার হাত থেকে সে আংটি আসে দুষ্মন্তের কাছে। শকুন্তলাকে মনে পড়ে দুষ্মন্তের। সাদরে নিয়ে আসেন শকুন্তলা আর ছেলে ভরতকে।

পাণ্ডবদের বিপদে ফেলতে দুর্যোধনের অনুরোধে দশ হাজার ক্ষুধার্ত শিষ্য নিয়ে বনবাসী পাণ্ডবদের অতিথি হন দুর্বাসা। কোনও আগাম খবর না দিয়েই।

দ্রৌপদীর প্রার্থনায় ছুটে আসেন কৃষ্ণ। সূর্যের দেওয়া বিশেষ থালার কানায় লেগেছিল কণামাত্র শাকান্ন। তাই খান কৃষ্ণ। দুর্বাসা এবং তাঁর শিষ্যদের পেট ভরে

আই ঢাই অবস্থা হয়। চম্পট দেন সশিষ্য দুর্বাসা। কৃষ্ণের কৌশলে বেঁচে যান পাণ্ডবরা।

একদিন দুর্বাসা গরম পায়েস খাচ্ছিলেন। কৃষ্ণকে বললেন, সেই পায়েস তাঁর সর্বাঙ্গে মাখিয়ে দিতে। কৃষ্ণ দুর্বাসার শুধু পায়ের তলাটা বাদ দিয়ে বাকি সারা গায়ে লেপে দিলেন পায়েস।

খ্যাপা দুর্বাসা এবার নিজেই সেই পায়েস মাখালেন রুক্মিণীর সারা দেহে। তারপর নিজের রথের ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে রুক্মিণীকে জুড়লেন রথে। চাবুক মেরে মেরে রুক্মিণীকে অবশ করে দিলেন। কৃষ্ণ কিন্তু নির্বিকার।

কৃষ্ণ-রুক্মিণীর সেবায় খুশি হলেন দুর্বাসা। বললেন, 'তোমরা ক্রোধকে জয় করেছ। সর্বলোকে তোমাদের জয় জয়কার হবে। তবে একটা কথা। কৃষ্ণ! তুমি কিন্তু আমার পায়ের তলায় পায়েস মাখাওনি। তাই তোমার সারা শরীর অভেদ্য হবে। শুধু পায়ের তলাটা ছাড়া।'

এই কারণেই, কৃষ্ণের দেহত্যাগের সময়, ব্যাধ কৃষ্ণের পায়ের তলায় তীর মেরেছিল।

কালপুরুষ এসেছেন রামের কাছে। রামকে দিয়ে শর্ত করিয়ে নিয়েছেন। দুজনের কথা বলার সময় তৃতীয় কেউ এসে পড়লে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। পাছে কেউ আচমকা অসময়ে এসে পড়ে অযথা মৃত্যুদণ্ড ভোগ করেন, তাই লক্ষ্মণকে দরজায় পাহারায় রেখেছেন রাম। এমন সময় যাঁর আসার কথা, ঠিক তিনিই এলেন। দুর্বাসা। বললেন, 'এক্ষুনি আমাকে রামের কাছে নিয়ে চলো।'

লক্ষ্মণ বললেন, 'দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন মুনিবর! রাম এখন অত্যন্ত জরুরি কাজে ব্যস্ত। আপনি আমায় বলুন না, কী করতে হবে।'

দুর্বাসা বললেন, 'এক্ষুনি যদি রামকে আমার আসার খবর না দাও, আমি কিন্তু তোমাদের ছেলেপুলে সমেত চার ভাই আর এই অযোধ্যাকে একেবারে ধ্বংস করে দেব।'

লক্ষ্মণ দুর্বাসাকে চিনতেন। ভাবলেন, বাকি সবাইকে আর অযোধ্যাকে বাঁচাতে আমার একার প্রাণ দেওয়া অনেক বাঞ্ছনীয়। লক্ষ্মণ গেলেন রামকে খবর দিতে। শর্ত মতো সরযূর তীরে প্রাণ দিতে হল লক্ষ্মণকে। রামের কোনও নিষেধই শুনলেন না লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের শোকে বাকি তিন ভাইও প্রাণ দিলেন সরযূর জলে।

দুর্বাসা তপস্যাবলে অনেক শক্তি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ক্রোধকে কোনও দিনই জয় করতে পারেননি।

দুর্বাসা দশরথকে শুনিয়েছিলেন ভৃগুর বিষ্ণুকে শাপ দেওয়ার কাহিনী। সেই শাপেই, রাম সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন।

আরও জানার জন্য 'ভৃগু' এবং 'রাম' দেখুন।

দুর্মুখ: রামের গুপ্তচর।

এঁর মাধ্যমে রাম প্রজাদের সন্তোষ-অসন্তোষ এবং মতামতের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতেন। এক মতে, এই দুর্মুখই সীতার চরিত্র সম্বন্ধে প্রজাদের কানাঘুষোর কথা রামের কানে তোলেন। এবং এর ফলস্বরূপ রাম সীতাকে ত্যাগ করেন।

অন্য মতে, বিজয়, মধুমত্ত, ভদ্রক, দন্তবক্র, সুমাগধ প্রমুখ বন্ধুবান্ধবের মুখেই রাম প্রথম শোনেন সীতাকে নিয়ে অযোধ্যার মানুষের কানাঘুষোর কথা।

দেববর্ণিনী: কুবেরের মা। রাবণের সৎ মা। বিশ্রবার স্ত্রী। মহর্ষি ভরদ্বাজের মেয়ে।

দেবান্তক: রাবণের ছেলে। যুদ্ধে হনুমান এঁকে বধ করেন।

দ্বিবিদ: অঙ্গদের মামা।
রামের হয়ে যুদ্ধ করেন। জাম্ববান, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে কলিযুগ পর্যন্ত প্রাণধারণ করার নির্দেশ দেন রাম। লঙ্কার যুদ্ধে শোণিতাক্ষ এঁর হাতেই প্রাণ দেন।

ধনপতি: কুবেরের অন্য নাম। 'কুবের' দেখুন।

ধর্মধ্বজ: মিথিলার রাজা জনকের এক পূর্বপুরুষ।

ধর্মরথ: সগর রাজার ছেলে। হরিবংশ মতে, কপিলের ক্রোধাগ্নি থেকে সগরের ষাট হাজার ছেলের মধ্যে চার ছেলে বেঁচে যান। ইনি তাঁদের অন্যতম।

ধান্যমালিনী: রাবণের অন্যতমা স্ত্রী। অতিকায়ের মা।

ধুন্ধু: রাক্ষস মধুর ছেলে। এঁকে মারার জন্যই, অযোধ্যার রাজা কুবলাশ্ব 'ধুন্ধুমার' আখ্যা পান।
'কুবলাশ্ব' দেখুন।

ধুন্ধুমার: কুবলাশ্বের অন্য নাম। 'কুবলাশ্ব' দেখুন।

ধূম্রাক্ষ: রাবণের সেনাপতি।
লক্ষ্মণ নাগপাশ থেকে মুক্ত হলে, রাবণ ধূম্রাক্ষকে পাঠান যুদ্ধে। প্রচুর বানরসেনা প্রাণ হারায় ধূম্রাক্ষের হাতে। এরপর হনুমান এক মস্ত বড় পাথর ছুড়ে এঁর মাথা গুঁড়িয়ে দেন।
ধূম্রাক্ষ, সম্পর্কে রাবণের মামা। সুমালী-কেতুমতীর ছেলে।

নন্দিগ্রাম: ভরতের রাজধানী।
চিত্রকূট থেকে রামের পাদুকা নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা-দশরথহীন অযোধ্যায় ফিরে এলেন ভরত। কিন্তু, অযোধ্যায় না থেকে, অযোধ্যার পুবে, অযোধ্যা থেকে এক ক্রোশ দূরে এই নন্দিগ্রামে থেকেই, রামের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন ভরত। রামের পাদুকাকে সিংহাসনে বসিয়ে, নিজে সেই পাদুকার আজ্ঞাবহ দাস হয়ে রইলেন।
চোদ্দো বছর বনবাসের পর এই নন্দিগ্রামেই, পুষ্পক বিমান থেকে নেমে আসা রাম-লক্ষ্মণ-সীতা আর তাঁদের সঙ্গীদের স্বাগত জানান ভরত। রামকে ফিরিয়ে দেন তাঁর সিংহাসন।

নন্দিনী: বশিষ্ঠের কামধেনু। সুরভির মেয়ে।
দিলীপ এবং তাঁর স্ত্রী সুদক্ষিণা নন্দিনীর সেবা করে নন্দিনীর বরে ছেলে রঘুকে

পান। এই রঘু থেকেই রঘুবংশের উৎপত্তি।

এই নন্দিনীকে হরণ করার জন্যই; বশিষ্ঠের শাপে অষ্টবসুকে মানুষ হয়ে মর্তে আসতে হয়েছিল। গঙ্গাপুত্র হয়ে জন্মে, সাত বসু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে গেলেন স্বর্গে। শুধু 'দ্যু' নামের এক বসু ফিরতে পারলেন না তখনই। কারণ, তিনিই ছিলেন নন্দিনী হরণের নায়ক। দেবব্রত বা ভীষ্মই হলেন সেই দ্যু। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের বিরোধের মূলেও এই নন্দিনী ।

'সুরভি' দেখুন।

নন্দী: শিবের অন্যতম অনুচর।

কুবেরকে হারিয়ে রাবণ কার্তিকেয়র জন্মস্থান শরবনে এলেন। সেখানে তাঁর পুষ্পক বিমান হঠাৎ থেমে গেল। রাবণ এই থেমে যাওয়ার কারণ নিয়ে মন্ত্রী মারীচের সঙ্গে আলোচনা করছেন। এমন সময় নন্দী সেখানে এলেন।

নন্দী রাবণকে শিবের বিচরণভূমি অবিলম্বে ত্যাগ করতে বললেন। রাবণ ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, 'শিব কে?'

নন্দীর মুখ ছিল বানরের মতো। সেই মুখ দেখে তাচ্ছিল্যভরে হেসেছিলেন রাবণ। নন্দী বললেন, 'আমায় দেখে হাসছ? বেশ! তবে শুনে রাখো। আমার মতো চেহারার অসংখ্য বানরই তোমার বংশ ধ্বংস করবে।' হলও তাই।

'রাবণ দেখুন।'

নরান্তক: রাবণের ছেলে। যুদ্ধে অঙ্গদের হাতে প্রাণ দেন।

নল: বানরদের ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যতম নেতা। বিশ্বকর্মার ছেলে।

এঁরই তত্ত্বাবধানে, মাত্র পাঁচ দিনে, রামেশ্বর থেকে লঙ্কা পর্যন্ত এক শো যোজন (আট শো মাইল) লম্বা আর দশ যোজন (আশি মাইল) চওড়া সেতু তৈরি করে লক্ষ লক্ষ বানর সেনা। কারিগরকুলতিলক বিশ্বকর্মার উপযুক্ত সন্তান হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেন নল।

'রাম' এবং 'সেতুবন্ধ' দেখুন।

নারদ: বিখ্যাত দেবর্ষি। ব্রহ্মার মানসপুত্র। ত্রিকালজ্ঞ ঋষি।

সব সময় 'নার' অর্থাৎ জল দিয়ে তর্পণ করতেন। তাই নাম 'নারদ'।

ভাগবত মতে, এক দাসীর গর্ভে জন্ম হয় নারদের। সাধুদের উচ্ছিষ্ট খাওয়ায়, এঁর মনে ধর্মভাব জেগে ওঠে। সাপের কামড়ে মার মৃত্যু হলে ইনি সন্ন্যাস নিয়ে বনে যান। ঈশ্বরের দেখা পান। তবে, মাত্র মুহূর্তের জন্য।

কল্পশেষে, ভগবান বিষ্ণু যখন অনন্তশয্যায় শুয়েছিলেন, তখন নারদ বিষ্ণুর প্রশ্বাসের সঙ্গে তাঁর দেহে ঢুকে যান। প্রলয় শেষে, ভগবান অন্যান্য মহর্ষিদের সঙ্গে নারদকেও আবার সৃষ্টি করেন। নারদ বীণা হাতে ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াতে থাকেন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসারে, নারদের জন্ম হয় ব্রহ্মার গলা থেকে। ব্রহ্মার কথা মতো সৃষ্টি করতে রাজি না হওয়ায়, ব্রহ্মার শাপে নারদকে 'উপবর্হণ' নামের এক গন্ধর্ব হয়ে জন্মাতে হয়।

গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের পঞ্চাশটি মেয়েকে বিয়ে করেন উপবর্হণ। ব্রহ্মার নৃত্যসভায়

একদিন রম্ভার নাচ দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েন উপবর্হণ। তাঁর বীর্যক্ষরণ হয়। শাপ দেন ব্রহ্মা, 'তোমাকে মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে।'

একদিন। স্বর্গের নর্তকী মেনকাকে দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েন কশ্যপ। তাঁর বীর্যপাত হয়। সেই বীর্য খেয়ে গর্ভবতী হন দ্রুমিলের বন্ধ্যা স্ত্রী কলাবতী। দ্রুমিল ছিলেন কান্যকুব্জের গোপদের রাজা। যথাসময়ে কলাবতীর এক ছেলে হল। সেই ছেলেই নারদ বা উপবর্হণ।

বিষ্ণুর নাম জপ করতে করতে বিষ্ণুর দেখা পেলেন নারদ। মৃত্যুর পর বিষ্ণু-দেহেই মিশে গেলেন। পরে নতুন করে ব্রহ্মা যখন সৃষ্টির কাজ শুরু করলেন, তখন তাঁর গলা থেকে জন্ম নিলেন নারদ।

বীণা ছাড়া নারদকে ভাবাই যায় না। বীণা বাজিয়ে গান শুনিয়ে ত্রিভুবনকে মাতিয়ে রেখেছিলেন নারদ। গান শিখেছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গন্ধর্ব তুম্বুরু, (এই 'তুম্বুরু-ই অভিশপ্ত হয়ে পরে রাক্ষস বিরাধ রূপে জন্ম নেন। রামের হাতে প্রাণ দিয়ে শাপমুক্ত হন।) গন্ধর্ব উলুকেশ্বর ইত্যাদির কাছে।

দৌত্যের কাজে নারদের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। এঁর খবর ওঁকে দেওয়া, অসুরনিধনে দেবতাদের সহায়তা করা, সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে কাউকে সতর্ক করে দেওয়া, দরকার হলে দু'পক্ষে যুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়া, ঘটকালি করা ইত্যাদি কাজে নারদ সিদ্ধহস্ত। শিবদুর্গার বিয়ের ঘটকালি করেছেন নারদ। ধ্রুবকে মন্ত্র দিয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে জ্ঞানযোগ, গীতযোগ ইত্যাদি শুনেছেন।

রামায়ণ রচনার মূলেও নারদ। কারণ, নারদই প্রথম বাল্মীকিকে রামের কথা শোনান। রামের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—সবই নারদ বলেছেন বাল্মীকিকে। নারদ বাল্মীকিকে রামের কাহিনী শুনিয়ে দেবলোকে চলে যাওয়ার পরেই, হঠাৎ করে বাল্মীকির কাব্যপ্রতিভা আত্মপ্রকাশ করে।

ঢেঁকিকে নারদের বাহন বলা হয়। তবে এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

'বাল্মীকি' দেখুন।

নিকষা: রাবণের মা। অন্য নাম কৈকসী। 'কৈকসী' দেখুন।

নিকুম্ভ: কুম্ভকর্ণ এবং বজ্রজ্বালার ছেলে। যুদ্ধে রামের হাতে প্রাণ দেন।

নিকুম্ভিলা: লঙ্কার এক উপবন।

ইন্দ্রজিতের যজ্ঞাগার ছিল লঙ্কার এই উপবনে। 'নিকুম্ভিলায় যজ্ঞ করে যুদ্ধে গেলে মেঘনাদ বা ইন্দ্রজিৎকে কেউ হারাতে পারবেন না', এই ছিল ব্রহ্মার বর। বিভীষণের পরামর্শে এই যজ্ঞশালাতেই, যজ্ঞে বসার ঠিক আগেই, মেঘনাদকে হত্যা করেন লক্ষ্মণ।

'মেঘনাদ (ইন্দ্রজিৎ)' দেখুন।

নিমি: ইক্ষ্বাকুর ছেলে।

পুত্রহীন ছিলেন। একবার এক যজ্ঞে বশিষ্ঠ, গৌতম ইত্যাদি মুনিকে আমন্ত্রণ জানালেন। বশিষ্ঠ ইন্দ্রের এক যজ্ঞেও নিমন্ত্রিত ছিলেন। সে যজ্ঞ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত নিমিকে অপেক্ষা করতে বলেন। বশিষ্ঠের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে, নিমি

গৌতমকে দিয়ে হোম শুরু করান।

ইন্দ্রের যজ্ঞ থেকে ফিরে গৌতমকে হোম করতে দেখে, নিমিকে অচেতন হওয়ার শাপ দেন বশিষ্ঠ। নিমি তখন ঘুমোচ্ছিলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে শাপ দেওয়াতে, নিমিও বশিষ্ঠকে মৃত্যু-শাপ দিলেন।

বশিষ্ঠের তেজ মিত্রাবরুণের দেহে ভর করে। একদিন উর্বশীকে দেখে মিত্রাবরুণের বীর্যস্খলন হল। তা থেকেই আবার দেহ ধারণ করলেন বশিষ্ঠ।

নিমির দেহ তেল আর সুগন্ধি দিয়ে অবিকৃত রাখলেন ঋষিরা। দেবতারা সেই দেহে আবার চেতনা ফিরিয়ে দিতে চাইলেন। নিমি বললেন, 'এই দুঃখময় জগতে শরীর ধারণ করে, আবার তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার মতো বেদনার আর কিছুই নেই। তাই এ শরীরে আর আমি ফিরতে চাই না। বরং, সবার চোখে অমর হয়ে থাকতে চাই।' দেবতারা বললেন, 'তথাস্তু'।

নিমি 'নিমিখ' বা 'নিমেষ' অর্থাৎ 'পলক' হয়ে চোখে চোখে থেকে গেলেন।

নিমির পরিত্যক্ত দেহ মন্থন করতে লাগলেন ঋষিরা। সেই দেহ থেকে জন্ম নিল এক ছেলে। মন্থন থেকে জন্ম বলে, তার নাম হল 'মিথি'। জনন থেকে নাম হল 'জনক'। বিগত দেহ থেকে জন্ম বলে নাম হল 'বিদেহ' বা 'বৈদেহ'।

'জনক' দেখুন।

নিষাদরাজ: নিষাদ নামে অনার্য জাতির রাজা। রামের বন্ধু। অন্য নাম 'গুহ' বা 'গুহক' বা 'গুহকমিতা'।

'গুহ' বা 'গুহক/গুহকমিতা' এবং 'রাম' দেখুন।

নীল: রাম-ভক্ত বানর। সুগ্রীবের বন্ধু।

হাজার হাজার বানর নিয়ে সীতাকে খুঁজে বেড়িয়েছেন। সেতু-বন্ধনে উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছিলেন। লঙ্কার যুদ্ধে প্রহস্ত এবং মহোদর (১) এঁর হাতে প্রাণ দেন।

'মহোদর (১)' দেখুন।

নৃগ: এক মহাযশস্বী রাজা। পুষ্কর তীর্থে ব্রাহ্মণদের এক কোটি ধেনু দান করেছিলেন নৃগ। সঙ্গে বাছুরও ছিল। সবার গায়ে ছিল সোনার অলঙ্কার।

এর মধ্যে এক গরিব ব্রাহ্মণের একটা গরু আর একটা বাছুরও ছিল। গরুর খোঁজে বেরিয়ে ব্রাহ্মণ কনখলে অন্য এক ব্রাহ্মণের কাছে তাঁর গরু আর বাছুরকে দেখতে পান। গরুর মালিকানা নিয়ে দুই ব্রাহ্মণে লেগে যায় ঝগড়া।

দুই ব্রাহ্মণ বিচারপ্রার্থী হয়ে এলেন রাজা নৃগের কাছে। কিন্তু, বহুদিন অপেক্ষা করেও, নৃগের দেখা পেলেন না তাঁরা। দুজনেই নৃগকে শাপ দিলেন, 'বিচারপ্রার্থীদের দর্শন না দেওয়ার জন্য তোমাকে কৃকলাস (গিরগিটি) হয়ে বহু বছর গর্তে বাস করতে হবে। ভগবান বিষ্ণু মানুষরূপ ধরে এলে তবে তোমার মুক্তি হবে।'

শাপ দিয়ে দুই ব্রাহ্মণ অন্য এক ব্রাহ্মণকে ওই বিতর্কিত গরু-বাছুর দিয়ে দিলেন।

পঞ্চবটী: গোদাবরী নদীর উৎসের কাছাকাছি এক অত্যন্ত রমণীয় বন।

বনবাসকালে রাম এখানে বেশ কিছুদিন ছিলেন। এই পঞ্চবটী থেকেই, সীতাকে হরণ করে নিয়ে যান রাবণ। এখানেই, শূর্পণখার নাক কেটে দিয়েছিলেন লক্ষ্মণ।

মারীচ, রাবণের আদেশে, সোনার মায়া-হরিণের রূপ ধারণ করেছিলেন এখানেই।

অশ্বথ , বেল, বট, অশোক আর আমলকী, এই পাঁচ রকমের পবিত্র গাছে ভরা ছিল বলেই 'পঞ্চবটী' নাম। সম্ভবত, এখনকার 'নাসিক' (শূর্পণখার 'নাসিকা' থেকে যার নামের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়) শহরেই ছিল পঞ্চবটী।

'রাম', 'সীতা' এবং 'শূর্পণখা' দেখুন।

পবন: হনুমান এবং ভীমের ধর্মপিতা। অন্য নাম বায়ু।

কুশনাভের একশো মেয়ে এঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে, ইনি তাঁদের বিকলাঙ্গ করে দেন।

বানররাজ কেশরীর স্ত্রী অঞ্জনা একদিন খুব সেজেগুজে বেড়াচ্ছিলেন। পবন তাঁকে দেখেই কামার্ত হয়ে পড়েন। পবনের স্পর্শেই, গর্ভবতী হয়ে পড়েন অঞ্জনা। জন্ম হয় হনুমানের। কুন্তীর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তা থেকেই ভীমের জন্ম।

আরও জানার জন্য 'হনুমান' এবং 'কান্যকুব্জ (কনৌজ)' দেখুন।

পম্পা: রামায়ণের বিখ্যাত নদী এবং সরোবর। এর উৎস ঋষ্যমূক পর্বত। পরে তুঙ্গভদ্রায় মিশেছে।

এই পম্পার তীরে এসে পম্পা সরোবর এবং তার চারপাশের প্রকৃতির শোভা দেখে মোহিত হয়ে পড়েন রাম। লক্ষ্মণকে বলেন, 'লক্ষ্মণ! যদি সীতাকে নিয়ে আমি সারাজীবন এখানে বাস করতে পারি, তবে ইন্দ্রের পদ বা অযোধ্যা, কোনওটাই আমি চাইব না।'

'রাম' দেখুন।

পরশুরাম: মূল নাম রাম। বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। জমদগ্নির ছেলে বলে অন্য নাম জামদগ্ন্য। মা রেণুকা মহাদেবের কাছ থেকে পরশু পেয়েছিলেন তাই 'পরশুরাম'।

হরধনু ভঙ্গের খবর পেয়ে পরশুরাম এসে বৈষ্ণবধনু ভাঙতে বলেন রামকে। রাম অক্লেশেই তা করেন। পরশুরামের সব তপস্যালব্ধ শক্তিও নষ্ট করে দেন। নির্বীর্য পরশুরাম রামের পুজো করে ফিরে যান মহেন্দ্র পর্বতে। এক অবতারের কাছে হার হয় আর এক অবতারের

পুঞ্জিকস্থলা: স্বর্গের এক অপ্সরা। মার্কণ্ডেয় মুনির (মতান্তরে, বৃহস্পতির) শাপে বানরী হয়ে জন্মান। নাম হয় অঞ্জনা। বানররাজ কেশরীর স্ত্রী হন। পবনের স্পর্শে এঁর গর্ভে হনুমানের জন্ম হয়।

ইন্দ্র পুঞ্জিকস্থলাকে পাঠিয়েছিলেন মার্কণ্ডেয় মুনির তপস্যা ভাঙতে। পারেননি পুঞ্জিকস্থলা।

একবার ব্রহ্মার কাছে যাচ্ছিলেন পুঞ্জিকস্থলা। রাবণ তাঁকে বিবস্ত্রা করেন। পুঞ্জিকস্থলা সব কথা জানান ব্রহ্মাকে। ব্রহ্মা শাপ দেন, 'এরপর রাবণ আর কোনও স্ত্রীলোকের ওপর বলপ্রয়োগ করলে, রাবণের মাথা একশো টুকরো হয়ে যাবে।'

আরও তথ্যের জন্য 'রাবণ', 'অঞ্জনা' 'কেশরী' এবং 'হনুমান' দেখুন।

পুলস্ত্য: সত্যযুগের এক ব্রহ্মর্ষি। সপ্তর্ষির একজন। ব্রহ্মার ছেলে। রাজর্ষি তৃণবিন্দুর মেয়ে হবির্ভূর স্বামী। বিশ্রবার বাবা। রাবণের ঠাকুরদা। পুলস্ত্য ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মার কান থেকে এঁর জন্ম।

সুমেরু পর্বতের পাশে তৃণবিন্দুর আশ্রমে ধ্যান করতেন পুলস্ত্য। অপ্সরা, নাগকন্যা, রাজকন্যা আর ঋষিকন্যাদের নাচগানে তাঁর ধ্যানের বিঘ্ন হয়। পুলস্ত্য একদিন রেগে গিয়ে বললেন, 'ধ্যানের সময় আমার চোখের সামনে কোনও স্ত্রীলোক এসে পড়লেই, সঙ্গে সঙ্গে তার গর্ভলক্ষণ দেখা দেবে।'

তৃণবিন্দুর মেয়ে 'হবির্ভূ' (অন্য নাম 'বেদশ্রুতি') এই শাপের কথা জানতেন না। একদিন পুলস্ত্য বেদপাঠ করছেন। হবির্ভূ এসে বসলেন তাঁর সামনে। পুলস্ত্যর দৃষ্টি পড়ল হবির্ভূর ওপর। সঙ্গে সঙ্গেই গর্ভলক্ষণ দেখা দিল হবির্ভূর।

লজ্জায় মরে গেলেন হবির্ভূ। বাবা তৃণবিন্দুকে খুলে বললেন সব। তৃণবিন্দু ধ্যানে বসে জানতে পারলেন এই অলৌকিক গর্ভসঞ্চার-রহস্য। মেয়েকে নিয়ে এলেন পুলস্ত্যের কাছে। বললেন, 'ভগবান পুলস্ত্য! দয়া করে আমার এই পরম গুণবতী মেয়েটিকে আপনি গ্রহণ করুন। তপস্যা করতে করতে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়লে এ আপনার সেবা করবে।'

রাজি হলেন পুলস্ত্য। হবির্ভূকে বললেন, "আমার মতোই ছেলে হবে তোমার। তার নাম হবে 'পৌলস্ত্য'। আর বেদপাঠ শুনতে শুনতে তোমার গর্ভে তার জন্ম হয়েছে। তাই তার নাম হবে 'বিশ্রবা'।" ('বি', অর্থাৎ বিশেষ, হয়েছে 'শ্রবঃ', অর্থাৎ কীর্তি, যাঁর)।

পুলস্ত্য থেকে রাক্ষসকুলের সৃষ্টি বলে, এক মতে সমস্ত রাক্ষসই 'পৌলস্ত্য'। এবং সমস্ত রাক্ষসীই 'পৌলস্ত্যী'।

পুলোমা: একজন দানব।

দনুর ছেলে। কশ্যপের নাতি। শচীর বাবা। ইন্দ্রের শ্বশুরমশাই। জয়ন্তর দাদামশাই।

রাবণ স্বর্গজয় করতে গেলে মেঘনাদের সঙ্গে জয়ন্তর দারুণ লড়াই বেধে গেল। মেঘনাদের মায়াবলের কাছে নাস্তানাবুদ হলেন জয়ন্ত। পুলোমা তখন নাতিকে নিয়ে পাতালে চলে গেলেন।

পুলোমা অনুহ্লাদকে শচীহরণের অনুমতি দেওয়ায়, ইন্দ্র পুলোমা এবং অনুহ্লাদ— দু'জনকেই মেরে ফেলেন।

পুষ্কল: ভরত মাণ্ডবীর ছোট ছেলে। 'তক্ষ-পুষ্কল', 'রাম' এবং 'ভরত' দেখুন।

পুষ্পক রথ/বিমান: 'পুষ্পক এবং অন্যান্য পৌরাণিক বিমান' এই নামের আলাদা অধ্যায় দেখুন।

পুষ্পোৎকটা (১): রাক্ষস মাল্যবানের মেয়ে। বিশ্রবার স্ত্রী। মহোদর, কুম্ভীনসী এবং মহাপার্শ্বের মা। রাবণের সৎমা।

পুষ্পোৎকটা (২): রাবণের মাসি। কৈকসী (নিকষা), প্রহস্ত, অকম্পন, ধূম্রাক্ষ

ইত্যাদির বোন। সুমালী এবং কেতুমতীর মেয়ে।

পৌলস্তী: পুলস্ত্যের মেয়ে। এক মতে, পুলস্ত্যের বংশজাত সব রাক্ষসীই 'পৌলস্তী'।

পৌলস্ত্য: বিশ্রবার অন্য নাম। একমতে, পুলস্ত্যব বংশধর সব রাক্ষসই 'পৌলস্ত্য'।
'বিশ্রবা' দেখুন।

প্রঘস: রাবণের সেনাপতি।
অশোকবনে হনুমানের সঙ্গে লড়াইতে রাবণের যে পাঁচ সেনাপতি প্রাণ হারান, তাঁদের অন্যতম।
'হনুমান' দেখুন।

প্রজঙ্ঘ: রাবণের চর। যুদ্ধে অঙ্গদের ঘুষিতে নিহত হন।
'অঙ্গদ' দেখুন।

প্রমীলা: রাবণের পুত্রবধূ। মেঘনাদের স্ত্রী।
'মেঘনাদ' দেখুন।

প্রসেনজিৎ: সূর্যবংশের রাজা। মান্ধাতার ঠাকুরদা। যুবনাশ্বের বাবা। সুষেণের ছেলে। বৈবস্বত মনুর নাতি। অন্য নাম 'প্রসন্ন'।

প্রহস্ত: রাবণের প্রধানমন্ত্রী।
প্রহস্ত রাবণের মামা। মা কেতুমতী। বাবা সুমালী। ছেলে জম্বুমালী।
অকম্পনের মৃত্যুর পর ইনিই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। এবং যুদ্ধে প্রাণ দেন।
ইনি যখন যুদ্ধ করতে আসছেন, তখন এঁকে দেখে রামের কৌতূহল হয়। বিভীষণের কাছে এঁর সম্বন্ধে জানতে চান রাম।
বিভীষণ বলেন, 'লঙ্কার মোট সেনার তিন ভাগের এক ভাগ আসছে এই যুদ্ধ-বিশারদ মহাবীরের সঙ্গে।'
ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের পর 'নীল'-এর হাতে প্রাণ দেন।
রাবণ দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে অশ্মনগরে এসে 'বলি'-র প্রাসাদ দেখে মুগ্ধ হন। প্রহস্তকে পাঠান প্রাসাদের মালিকের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে।
প্রহস্ত ঢুকলেন সেই প্রাসাদে। দেখলেন, আগুনের শিখার মধ্যে এক পুরুষ বসে আছেন। বিশাল তাঁর আকৃতি!
প্রহস্তকে দেখে হাসতে লাগলেন সেই অগ্নিময় পুরুষ। ভয় পেয়ে পালালেন প্রহস্ত।
পরে, রাবণ নিজেই এলেন। এবং বলির মুখে শুনলেন, সেই অগ্নিময় পুরুষ আর কেউ নন, স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু।
'রাম', 'রাবণ', 'বলি' এবং 'নীল' দেখুন।

বজ্রজ্বালা: কুম্ভকর্ণের স্ত্রী। বিরোচনের ছেলে বলির নাতনি। এঁর দুই ছেলে। কুম্ভ আর নিকুম্ভ।

বজ্রদংষ্ট্র: রাবণের সেনাপতি। ধূম্রাক্ষের মৃত্যু হলে রাবণ এঁকে যুদ্ধে পাঠান। অনেক বানর সেনাকে হত্যা করে অঙ্গদের হাতে প্রাণ দেন ইনি।

'অঙ্গদ' দেখুন।

বশিষ্ঠ: দশ প্রজাপতির এক প্রজাপতি।

এক মতে, মিত্রাবরুণের মিত্রের ঔরসে উর্বশীর গর্ভে বশিষ্ঠের জন্ম। বরুণের ঔরসে উর্বশীরই গর্ভে জন্মান অগস্ত্য।

হরিবংশ মতে, বশিষ্ঠ ব্রহ্মার সাত মানসপুত্রের এক জন। কোনও কোনও পুরাণে এঁকে সপ্তর্ষির এক ঋষি বলা হয়েছে।

সূর্যবংশের কুলগুরু এবং পুরোহিত। এঁর স্ত্রী অরুন্ধতীর গর্ভে 'শক্তি' নামে এঁর এক ছেলে হয়। শক্তির ঔরসে এবং অদৃশ্যন্তির গর্ভে জন্ম হয় পরাশরের। এই পরাশরই, সত্যবতীর গর্ভে (কুমারী অবস্থায়) জন্ম দেন মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের।

বশিষ্ঠও রামকে রামায়ণ শুনিয়েছিলেন। সেই রামায়ণই 'যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ'।

নন্দিনী নামে এক কামধেনু ছিল বশিষ্ঠের। মৃগয়ায় বেরিয়ে তৃষ্ণার্ত বিশ্বামিত্র একবার সদলবল উঠলেন বশিষ্ঠের আশ্রমে। নন্দিনী একাই সব অতিথিকে তৃপ্ত করল। অর্ধেক রাজত্বের বিনিময়ে নন্দিনীকে পেতে চাইলেন বিশ্বামিত্র। বশিষ্ঠ রাজি হলেন না।

বিশ্বামিত্র জোর করে নিয়ে যেতে চাইলেন নন্দিনীকে। বশিষ্ঠের নির্দেশে নন্দিনী তার দেহ থেকে অসংখ্য সৈন্য তৈরি করল। বিশ্বামিত্র পরাজিত হয়ে রাগে নানারকম দিব্যাস্ত্র দিয়ে বশিষ্ঠকেই আক্রমণ করলেন। বশিষ্ঠ তাঁর ব্রহ্মদণ্ড দিয়ে ভস্ম করে দিলেন বিশ্বামিত্রের সব দিব্যাস্ত্র। বিশ্বামিত্র বুঝলেন, ক্ষাত্রতেজ ব্রহ্মতেজের কাছে তুচ্ছ। রাজ্যত্যাগ করে তপস্যা শুরু করলেন বিশ্বামিত্র।

ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা 'কল্মাষপাদ' এক বিবাদের সূত্র ধরে বশিষ্ঠের ছেলে 'শক্তি'কে কশাঘাত করেন। শক্তি অভিশাপ দেন, 'তুমি নরমাংসভোজী হবে।'

বিশ্বামিত্রের কৌশলে কল্মাষপাদ রাক্ষস হয়ে শক্তিকেই খেয়ে ফেলেন। এবং একে একে বশিষ্ঠের একশো ছেলেকেই খেয়ে ফেলেন।

আত্মহত্যা করতে যান বশিষ্ঠ। বিফল হন। নানা দেশ ঘুরে বাড়ি ফেরার পথে পেছন থেকে বেদপাঠ শুনতে পান।

'আরে! এ যে আমারই পুত্র শক্তির স্ত্রী অদৃশ্যন্তি! সে গর্ভবতী। তারই গর্ভস্থ সন্তান গর্ভ থেকেই বেদ পাঠ করছে!'

বিস্ময়ের পর বিস্ময়! পথে আবার সেই রাক্ষসরূপী কল্মাষপাদ আক্রমণ করলেন বশিষ্ঠকে। বশিষ্ঠের কৃপায় কল্মাষপাদ আবার ফিরে পেলেন মানুষের চেহারা। আর এক বরে পেলেন 'অশ্মক' নামে এক ছেলে।

বিষ্ণু পুরাণে আছে, বশিষ্ঠ নিমির শাপ থেকে মুক্তি পেতে ব্রহ্মার বরে আবার উর্বশীর গর্ভে জন্ম নেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলছেন, বশিষ্ঠ ছিলেন রাজা হরিশ্চন্দ্রের কুল-পুরোহিত। হরিশ্চন্দ্রের দুর্ভাগ্যের জন্য বিশ্বামিত্রকে দায়ী করে, তাঁকে বক পাখিতে পরিণত করে দেন বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্রও বশিষ্ঠকে এক পাখি করে দেন।

দুই পাখিতে লাগল লড়াই। সে এমন ভয়ঙ্কর লড়াই, যে, পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার উপক্রম। শেষে, ব্রহ্মা দু'জনকেই মানুষের শরীর ফিরিয়ে দিলেন। সন্ধি হল দুই ঋষির মধ্যে।

তাড়কা বধের জন্য বিশ্বামিত্র যখন রাম লক্ষ্মণকে নিতে চাইলেন, তখন দশরথ দুই কিশোর পুত্রকে এই ভয়ানক কাজের জন্য ছাড়তে চাইছিলেন না। বশিষ্ঠই তখন অনেক বুঝিয়ে শুঝিয়ে দশরথকে রাজি করান।

পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম বনে যেতে চাইলে, বশিষ্ঠ অনেক বুঝিয়েও তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারেননি।

অযোধ্যার রাজপরিবারে বশিষ্ঠের সম্মান এবং দাপট ছিল প্রশ্নাতীত।

'বিশ্বামিত্র', 'অরুন্ধতী', 'শক্তি', 'কল্মাষপাদ', 'দশরথ' এবং 'রাম' দেখুন।

বলা: রামকে বিশ্বামিত্রের শেখানো অতি শক্তিশালী দুই মন্ত্রের অন্যতম। অন্য মন্ত্রের নাম 'অতিবলা'।

'অতিবলা' দেখুন।

বলি: বিষ্ণুর কৃপাপ্রাপ্ত দৈত্যরাজ। অন্য নাম 'বৈরোচন'।

বিরোচন এবং সুরুচির ছেলে। প্রহ্লাদের নাতি। হিরণ্যকশিপুর প্রপৌত্র। বিন্ধ্যাবলী এবং সুদেষ্ণার স্বামী। বাণ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ইত্যাদি একশো ছেলের বাবা।

স্বর্গ জয়ের পর বলি দানধ্যান করছিলেন। ভগবান বিষ্ণু বামন অবতারের বেশে তাঁর কাছে এসে মাত্র ত্রিপাদ জমি চান। বামনের এই সামান্য প্রার্থনাকে অবজ্ঞার ছলে পূর্ণ করতে চান বলি। কিন্তু, তাঁকে বিস্মিত করে, মাত্র দু'পা ফেলে স্বর্গ আর মর্ত অধিকার করে নেন বামন।

নাভি থেকে তৃতীয় পা বার করে, তা রাখার জন্য জমি চান বামন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে, নিজের মাথা পেতে দেন বলি। বিষ্ণু বলির মাথার ওপর তৃতীয় পাটি রাখেন। বলির স্তবে খুশি হয়ে বিষ্ণু বলিকে স্থলে বাস কবার বর দেন।

দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে অশ্মনগরে এলেন রাবণ। সেখানে রত্নমণ্ডিত এক অপূর্ব সুন্দর প্রাসাদ চোখে পড়ল তাঁর। রাবণ প্রহস্তকে পাঠালেন প্রাসাদের মালিকের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে।

প্রহস্ত ঢুকলেন প্রাসাদে। সাতটা ঘর পেরিয়ে এসে দেখলেন, আগুনের শিখার মধ্যে এক বিশাল চেহারার পুরুষ বসে আছেন। প্রহস্তকে দেখে হাসতে লাগলেন তিনি। ভয়ে পালালেন প্রহস্ত।

রাবণ নিজেই এলেন এবার। ভয়ঙ্কর সেই পুরুষকে দেখে, ভয়ে কাঁপতে লাগলেন রাবণ। সেই পুরুষ বললেন, 'আমি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। তুমি কি বলির সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইছ?'

রাবণ বললেন, 'ওই ঘরে যিনি আছেন, শুধু তাঁর সঙ্গেই আমি যুদ্ধ করব'।

পুরুষ বললেন, 'উনিই মহাবলশালী দানবরাজ বলি। আমার সঙ্গেই যুদ্ধ করো না।'

রাবণ সেই পুরুষের কথায় কান না দিয়ে ভেতরে গেলেন।

বলি হাসতে হাসতে রাবণকে কোলে তুলে নিলেন। রাবণ বললেন, 'বিষ্ণু নাকি তোমাকে এখানে বন্দি করে রেখেছেন? আমি তাঁর হাত থেকে তোমায় মুক্ত করব'।

বলি হেসে বললেন, 'দরজায় যাঁকে দেখে এলে, উনিই বিষ্ণু। বিষ্ণুকে হারাতে পারে, এমন কেউ জন্মায়নি এখনও। বৃত্র, দনু, শুম্ভ, নিশুম্ভ, আমার বাবা বিরোচন, কংস, মধু, কৈটভ এবং আমার মতো মহাশক্তিশালী বহু দৈত্যকে বিষ্ণু অবলীলায় পরাস্ত করেছেন। আচ্ছা, তুমি বরং এক কাজ করো। ওই যে দেখছ আগুনের মতো উজ্জ্বল কানের দুলটা পড়ে আছে, ওটা নিয়ে এসো তো! ওটা আমার প্রপিতামহ হিরণ্যকশিপুর কানের দুল ছিল।'

রাবণ সে দুল তুলতেই পারলেন না। রক্তাক্ত, ঘর্মাক্ত দেহে ফিরে এলেন। লজ্জায়, ক্রোধে অন্ধ হয়ে, ছুটলেন বিষ্ণুকে মারতে। বিষ্ণু অদৃশ্য হলেন। কারণ, তিনি তো রাবণ বধের পালা তুলে রেখেছেন রামরূপ ধরে সে কাজটা সারবেন বলে।

রাবণ ভাবলেন, বিষ্ণু তাঁর ভয়ে সেখান থেকে পালিয়েছেন। মহানন্দে গর্জন করতে করতে চলে গেলেন রাবণ। মনে মনে বললেন, 'আমাকে আর পায় কে? আমি স্বয়ং বিষ্ণুকেও জয় করেছি।'

'রাবণ' দেখুন।

বামদেব: দশরথের অন্যতম পুরোহিত।

বায়ু: হনুমান এবং ভীমের ধর্মপিতা। অন্য নাম পবন। আরও জানার জন্য 'পবন' দেখুন।

বালী: বানররাজ। সুগ্রীবের দাদা। প্রথমে তারার এবং পরে সুগ্রীবের স্ত্রী রুমারও স্বামী হন। অঙ্গদের বাবা। ইন্দ্র এবং ঋক্ষরজার ছেলে। ব্রহ্মার নাতি।

ব্রহ্মার এক বিন্দু চোখের জল পড়েছিল মাটিতে। তা থেকেই বানর ঋক্ষরজার জন্ম।

বালীর মতো বলবান, বীর্যবান, উদার ব্যক্তিত্ব শুধু বানরকুলে নয়, গোটা রামায়ণেই বিরল। সুগ্রীবকে রাজ্যচ্যুত করা এবং তাঁর স্ত্রী রুমাকে বিয়ে করার পেছনে বালী তাঁর সমকালের সামাজিক বিধির সমর্থন চাইতেই পারেন। রাম বালীকে না মেরে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে, বালী একাই রাবণকে যমালয়ে পাঠিয়ে সীতাকে উদ্ধার করতে পারতেন—মৃত্যুর আগে রামকে এ কথা বলেছেনও বালী।

ঋক্ষরজা একদিন এক মায়া সরোবরে জল খেতে যান। সেখানে নিজের প্রতিবিম্বকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে ঝাঁপ দেন জলে। জল থেকে উঠে দেখেন তিনি হয়ে গেছেন এক অসামান্যা সুন্দরী নারী। ইন্দ্র আর সূর্যের নজর পড়ল নারী ঋক্ষরজার ওপর। ঋক্ষরজার মাথায় পড়ল ইন্দ্রের তেজ। বালে (চুলে) পড়া তেজ থেকে ঋক্ষরজার যে সন্তান হল, সে-ই 'বালী'।

সূর্যের তেজ পড়েছিল ঋক্ষরজার গ্রীবায় (ঘাড়ে)। সেই তেজ থেকে জন্মানো শিশুর নাম হল 'সুগ্রীব'।

ব্রহ্মার বরে, পরদিনই পুরুষত্ব ফিরে পেয়ে কিষ্কিন্ধ্যায় চলে যান ঋক্ষরজা।

সোনালি রঙের বিশাল দেহের অধিকারী ছিলেন। মহাশক্তিশালী ছিলেন তিনি। 'দুন্দুভি' নামে এক ভয়াবহ অসুরকে মেরে তার দেহ এক যোজন (৮ মাইল) দূরের 'ঋষ্যমূক' পর্বতে ছুড়ে ফেলেন বালী। দুন্দুভির মুখের রক্ত ছিটকে পড়ে মতঙ্গ

আশ্রমে। মতঙ্গ অভিশাপ দেন, 'ঋষ্যমূক পর্বতে এলেই, বালীর মৃত্যু হবে'। তাই, বালীর হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে, সুগ্রীব ঋষ্যমূক পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

রাবণ একবার বালীর সঙ্গে লড়ে তাঁকে হারাতে চেয়েছিলেন। রাবণের দর্প চূর্ণ করতে বালী রাবণকে বগলের তলায় পুরে রেখে দেন। ওই অবস্থায় তিনি অনেক জায়গায় পর্যটন করেন। তিন সাগরে স্নান করেন। তারপর জপে বসেন। তারপর রাবণকে মুক্তি দেন।

দুন্দুভি অসুরের ছেলে 'মায়াবী'র সঙ্গে বালীর একটা দীর্ঘদিনের ঝগড়া ছিল। নারীঘটিত ব্যাপার। মায়াবী এসে বালীকে উত্তেজিত করে এক গর্তে ঢুকে পড়ে। সুগ্রীবকে গর্তের মুখে পাহারায় রেখে, মায়াবীকে ধাওয়া করেন বালী। বলে যান, তিনি না ফেরা পর্যন্ত যেন সুগ্রীব গর্তের মুখে পাহারায় থাকেন। এক বছর কেটে যায়। গর্তের মুখে রক্ত দেখে আর গর্জনের শব্দ শুনে, সুগ্রীব ভাবেন, বালী মারা গেছেন। একটা পাথর দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দেন তিনি।

সুগ্রীবকেই রাজা করেন মন্ত্রীরা। সুগ্রীব বউদি তারাকে বিয়ে করেন। তখন এটাই সামাজিক প্রথা ছিল। বালী মায়াবীকে বধ করে ফিরে এসে রাগে সুগ্রীবকে তাড়িয়ে নিজে রাজা হন। সুগ্রীবের স্ত্রী রুমাকেও নিজের স্ত্রী করে নেন। সুগ্রীব ঋষ্যমূক পর্বতে আশ্রয় নেন।

রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে পরিচয়ের পর, সুগ্রীব আসেন বালীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। মার খেয়ে পালান। রাম, দু' ভাইয়ের চেহারা এক হওয়ায় প্রতিশ্রুতি মতো বালীকে হত্যা করতে পারেননি।

পরদিন। সুগ্রীব আবার যান গলায় মালা পরে। মালাটা তাঁকে চেনার চিহ্ন। এবার রাম বালীকে মেরে ফেলেন। বালী রামের এই আচরণে বিস্মিত হয়ে প্রথমে রামকে ভর্ৎসনা করেন। পরে অঙ্গদের দায়িত্ব রামকে দেন। সুগ্রীবকেও স্নেহের চোখে দেখতে বলেন। আর চান তারার নিরাপত্তা। রাম বালীর অনুরোধ রাখার প্রতিশ্রুতি দেন।

বালী, সুগ্রীবের সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়ার সময়, তারাকে কথা দিয়েছিলেন, যে, সুগ্রীবকে তিনি প্রাণে মারবেন না। সুগ্রীবের তারাকে বিয়ে করার কথা কলঙ্ক-ভয়ে বালী কারও কাছে প্রকাশ করেননি। বালী যে অত্যন্ত মহৎপ্রাণ লোক ছিলেন, এ থেকে তা প্রমাণিত হয়।

বালী সুগ্রীবকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কিন্তু, গর্তের মুখ বন্ধ করে চলে আসা, বালীর ফেরার প্রতীক্ষায় আরও অপেক্ষা না করে নিজে সিংহাসনে বসা, এবং সর্বোপরি মাতৃসমা বউদিকে দাদার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অঙ্কশায়িনী করা, ইত্যাদি কারণে বালী সুগ্রীবের ওপর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দেন।

বালীর এই ক্রোধ খুবই যুক্তি সঙ্গত। মৃত্যুকালে বালী নিজেই সুগ্রীবকে রাজা করে ইন্দ্রের দেওয়া সৌভাগ্যসূচক মালা সুগ্রীবের গলায় পরিয়ে দেন।

আরও তথ্যের জন্য 'রাম', 'অঙ্গদ', 'সুগ্রীব', 'তারা' এবং 'দুন্দুভি' দেখুন।

বাল্মীকি: আদিকবি। রামায়ণের রচয়িতা। প্রথম জীবনে দস্যু ছিলেন। নাম ছিল রত্নাকর।

এক মতে, প্রচেতার বংশধর। প্রচেতস-এর দশম পুত্র।

এক মতে, ভৃগুর বংশধর। এক মতে, বরুণের ছেলে।

দশরথের সমবয়সী ছিলেন। দস্যুবৃত্তি করেই সংসার চালাতেন। রত্নাকর একদিন নারদকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। নারদ তাঁকে জিগ্গেস করলেন, 'রত্নাকর! তোমার এই পাপের ভার তোমার মা, বাবা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলেই নেবেন তো!'

রত্নাকর ছুটলেন বাড়িতে। সকলকে জিগ্গেস করলেন। কিন্তু, কেউই তাঁর পাপের ভার নিতে রাজি হল না। ফিরে এলেন নারদের কাছে। নারদ বললেন, 'এই পাপের হাত থেকে যদি মুক্তি চাও, তবে শুধু রাম নাম জপ করো। আর কিছু করতে হবে না।'

রত্নাকর রাম নাম উচ্চারণ করতে পারলেন না।

নারদ বললেন, "বেশ! তুমি 'মরা মরা' বলে শুরু করো। তা-ই 'রাম রাম' হয়ে যাবে।"

রত্নাকর এক মনে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রথমে 'মরা-মরা' এবং পরে 'রাম রাম' জপ করতে লাগলেন। এ ভাবে ষাট হাজার বছর কেটে গেল। তাঁর সারা শরীর 'বল্মীক'-এর, অর্থাৎ উইপোকার, ঢিপিতে চাপা পড়ে গেল। তাই তাঁর নাম হল 'বাল্মীকি'।

নারদ ফিরে এসে তাঁকে রামের জন্মবৃত্তান্ত এবং আরও সব কাহিনী শোনালেন।

একদিন। ভরদ্বাজ মুনির সঙ্গে বনে ঘুরতে ঘুরতে, হঠাৎ এক জায়গায় বাল্মীকি দেখেন, এক ক্রৌঞ্চ (কোঁচ-বক) দম্পতি গাছের ডালে খেলা করছে। নিজেদের মধ্যে মিলনরত অবস্থায়। হঠাৎই, কোথা থেকে এসে, এক ব্যাধ পুরুষ ক্রৌঞ্চকে শরের আঘাতে মাটিতে ফেলে দিল। শোকে বিলাপ করতে লাগল ক্রৌঞ্চী। বেদনায় বিদ্ধ হলেন বাল্মীকি। তাঁর অজান্তেই, তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হল বিশ্বসাহিত্যের প্রথম কবিতা—প্রথম শ্লোক—

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং
 ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ
 কামমোহিতম্ ॥'

'তোর ভাল হবে না কখনও
ওরে ব্যাধ! শোন বলি তোরে!
দুটো পাখি করছিল খেলা।
একটার প্রাণ নিলি তীরে?'

(সঙ্গমরত দুটো পাখির একটাকে তুমি শরে বিদ্ধ করলে? ওহে নিষাদ! তুমি কোনও দিনও প্রতিষ্ঠা পাবে না।)

ব্রহ্মার নির্দেশে, এই 'শ্লোক' নিয়েই রামায়ণ রচনা শুরু করলেন বাল্মীকি। এঁর আশ্রমেই ঠাঁই পান রাম-নির্বাসিতা সীতা। এঁর আশ্রমেই জন্ম নিয়ে এঁর স্নেহচ্ছায়ায় লালিত পালিত হয় রামের দুই যমজ ছেলে লব এবং কুশ।

কৃষ্ণ সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুরে এলে, বাল্মীকির সঙ্গে দেখা হয় তাঁর।

'রাম', 'সীতা', 'লব', 'কুশ' এবং 'নারদ' দেখুন।

বাসুকি: নাগরাজ। অন্য দুই নাম—শেষ নাগ এবং অনন্ত নাগ।

কশ্যপ এবং কদ্রুর বড় ছেলে। সর্প-দেবী মনসার বড়দা। আস্তীকের বড় মামা।

অরুণ এবং গরুড়ের মাসতুতো দাদাও বটে, আবার সৎ দাদাও বটে। দক্ষরাজার দৌহিত্র।

সমুদ্র মন্থনের সময় দেবতারা বাসুকিকেই মন্থনরজ্জু বা মন্থনের পাক-দড়ি হিসেবে ব্যবহার করেন। এক হাজার বছরের মন্থনের জের সামলাতে না পেরে, বাসুকি বিষ-বমি করতে থাকেন।

দেবতারা দেখলেন, 'সর্বনাশ! এ বিষে চরাচর ধ্বংস হয়ে যাবে,!' তখন তাঁরা ধরলেন মহাদেবকে। মহাদেব সেই বিষ বা 'হলাহল' পান করে 'নীলকণ্ঠ' হলেন।

মা কদ্রুর কথা মতো, মাসি তথা সৎ মা বিনতাকে কদ্রুর দাসী করে রাখার চক্রান্তে যোগ দেননি বাসুকি। ব্রহ্মার নির্দেশ মতো, পাতালে গিয়ে পৃথিবীকে মাথায় তুলে ধরে থাকেন।

আরও তথ্যের জন্য 'সমুদ্র মন্থন' দেখুন।

বিজয় (১): বিষ্ণুর দ্বার-রক্ষক। অন্য ভাইয়ের নাম জয়।

'জয়-বিজয়' দেখুন।

বিজয় (২): অযোধ্যার দূত।

দশরথের মৃত্যুর পর ভরত-শত্রুঘ্নকে ভরতের মামার বাড়ি থেকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনতে যে চার দূতকে কেকয়রাজ্যে পাঠানো হয়েছিল, ইনি তাঁদেরই অন্যতম।

বিজয় (৩): রামের বন্ধু এবং সভাসদ। রামের রাজসভার অন্যতম বিদূষক।

সীতাকে নিয়ে অযোধ্যার লোকের কানাঘুষোর কথা রামকে প্রথম জানান রামের অন্য এক সভাসদ। ভদ্র। ভদ্রর বক্তব্যকে অন্যদের সঙ্গে সমর্থন করেন বিজয় । এঁদের কথাতেই, সীতাকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন রাম।

'রাম' দেখুন।

বিদেহ: জনকের রাজ্য। এর রাজধানী মিথিলা। বিদেহের মেয়ে বলেই, সীতার এক নাম 'বৈদেহী'।

বিচেতন দেহ থেকে জন্ম বলে জনকের এক নাম বিদেহ।

'জনক' দেখুন।

বিদ্যুজ্জিহ্ব (১): শূর্পণখার বর।

রাবণ পাতাল জয় করতে গিয়ে, কালকেয় দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়, ভুল করে ভগ্নিপতিকে মেরে ফেলেন। সেই অনুতাপেই, রাবণ শূর্পণখাকে দণ্ডকারণ্যে যথেচ্ছ বিহারের অনুমতি দেন। শূর্পণখার নিরাপত্তার জন্য দুই জাঁদরেল সেনাপতি খর আর দূষণকেও দণ্ডকারণ্যে পাঠান।

'শূর্পণখা' এবং 'রাবণ' দেখুন।

বিদ্যুজ্জিহ্ব (২): লঙ্কার এক মায়াবী রাক্ষস।

সসৈন্য রাম লঙ্কায় এলে, রাবণ ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন, যে-সীতাকে নিয়ে এই যুদ্ধ, সেই-সীতাকে হাত করতে পারলে, ঘৃণায়, দুঃখে রাম ফিরে যাবেন।

সীতাকে বশ করতে রাবণের আদেশে যাদুকর বিদ্যুজ্জিহ্ব সীতাকে রামের মায়ামুণ্ড দেখালেন। সীতা কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হলেন। জ্ঞান ফিরলে, বিভীষণের স্ত্রী এবং সীতার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণী সরমা আসল ঘটনা সীতাকে জানালেন।

'রাম', 'সীতা', 'রাবণ' এবং 'সরমা' দেখুন।

বিদ্যুৎকেশ: রাবণের মাতৃকুলের পূর্বপুরুষ এক রাক্ষস। হেতি এবং ভয়ার ছেলে। ব্রহ্মার নাতি। যমের ভাগ্নে। সন্ধ্যারাক্ষসীর মেয়ে সালকটঙ্কটার স্বামী। সুকেশের বাবা। মাল্যবান এবং সুমালীর ঠাকুরদা।

বিদ্যুন্মালী: রাবণের এক সেনাপতি। লঙ্কার যুদ্ধে সুষেণের হাতে নিহত।

বিন্দ-মুহূর্ত: এক বিশেষ মুহূর্ত। এই মুহূর্তে কারও কোনও জিনিস চুরি গেলে, বা হারিয়ে গেলে, তিনি আবার তা ফিরে পান।

সীতার খোঁজে বেরিয়ে রাম জটায়ুর দেখা পেলে, জটায়ু রামকে বলেন, 'রাবণ সীতাকে না জেনে বিন্দ-মুহূর্তে হরণ করেছে। তাই সীতাকে তুমি ফিরে পাবেই। চিন্তা কোরো না।'

বিন্দুমতী: মান্ধাতার স্ত্রী। শশবিন্দুর মেয়ে। মুচকুন্দ, অম্বরীষ আর পুরুকুৎস নামে তিন ছেলে এবং আরও পাঁচ মেয়ের মা।

বিন্ধ্য: অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক পর্বত। আর্যাবর্ত এবং দাক্ষিণাত্যের মধ্যবর্তী।

আরও তথ্যের জন্য 'অগস্ত্য' দেখুন।

বিপাশা: বিখ্যাত পৌরাণিক নদী।

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের একশো ছেলেকে মেরে ফেললে, বশিষ্ঠ আত্মহত্যা করতে পাহাড় থেকে ঝাঁপ দেন। কিন্তু বেঁচে যান। তখন নিজেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে এক নদীতে ঝাঁপ দেন। নদী তাঁকে পাশমুক্ত করে বাঁচিয়ে দেয়। বশিষ্ঠ সে নদীর নাম দেন 'বিপাশা'।

'বশিষ্ঠ' দেখুন।

বিভাণ্ডক: বিখ্যাত ঋষি।

কশ্যপের ছেলে। ঋষ্যশৃঙ্গের বাবা। রামের একমাত্র দিদি শান্তার শ্বশুর। 'ভগ'-এর মেয়ে স্বর্ণমুখীর স্বামী।

উর্বশীকে দেখে কামার্ত হওয়ায় বিভাণ্ডকের বীর্যপাত হয় এক হ্রদের জলে। এক হরিণী জলের সঙ্গে সেই বীর্য খায়। সেই হরিণী যথাসময়ে জন্ম দেয় ঋষ্যশৃঙ্গের।

আরও তথ্যের জন্য 'ঋষ্যশৃঙ্গ' দেখুন।

বিভীষণ: রাবণের ছোট ভাই। কৈকসীর গর্ভজাত বিশ্রবার কনিষ্ঠ সন্তান।

রাম-ভক্ত। অত্যন্ত ধর্মভীরু এবং আদর্শনিষ্ঠ।

'প্রদোষকালে মিলিত হওয়ায়, কৈকসীর গর্ভজাত সন্তানরা ভয়ঙ্কর চেহারা পাবে।' এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল বিশ্রবার। কৈকসীর অনুনয়ে বিশ্রবা বললেন, 'বেশ। তোমার ছোট ছেলে খুব ধর্মভীরু হবে।'

তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা বর দিতে চাইলেন বিভীষণকে।

বিভীষণ বললেন, 'শত বিপদে পড়েও যেন ধর্মবুদ্ধি না ত্যাগ করি। আর না শিখেও যেন ব্রহ্মাস্ত্রের ব্যবহার জানতে পারি।'

ব্রহ্মা সে বর তো দিলেনই। উপরন্তু বললেন, 'তুমি অমর হবে।'

বিভীষণ তাই দশজন চিরজীবীর একজন।

বিভীষণের স্ত্রী সরমা। বাল্মীকি রামায়ণে বিভীষণের ছেলেদের নাম নেই। কৃত্তিবাস বিভীষণের ছেলে তরণীসেনকে অভিমন্যুর সমান্তরাল করে তৈরি করেছেন।

বিভীষণ বহুবার দুশ্চরিত্র দাদাকে সৎ পথে আনার চেষ্টা করেছেন। প্রতিবারেই ব্যর্থ হয়েছেন।

হনুমান লঙ্কা তছনছ করে পালাবার পর, অপমানিত রাবণ সভাসদদের নিয়ে পরবর্তী কর্তব্য স্থির করতে আলোচনায় বসলেন। মেঘনাদ সহ প্রায় সকলেই রাবণকে যুদ্ধে প্ররোচিত করলেন।

বিভীষণ বললেন, 'মহারাজ! এঁরা কেউই আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী নন। আপনি এঁদের কথায় কান দিয়ে দয়া করে নিজের এবং লঙ্কার সর্বনাশ ডেকে আনবেন না। এখনও সময় আছে। প্রচুর ধনরত্নসহ সীতাকে তাঁর অপরাজেয় স্বামীর হাতে তুলে দিন। তাতে লঙ্কাও বাঁচবে। শান্তিও বজায় থাকবে।'

রাবণ বললেন, 'এ কথা আর কেউ বললে, আমি তাকে প্রাণদণ্ড দিতাম।'

অপমানিত বিভীষণ তাঁর চার সচিব অনল, অনিল, হর আর সম্পাতিকে নিয়ে আকাশপথে সমুদ্র পার হয়ে রামের পক্ষে যোগ দিয়েছেন। রাম বিভীষণকে রাজা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিভীষণ রামকে সীতা উদ্ধারে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ইন্দ্রজিৎ মায়া-সীতাকে হত্যা করলে, রাম শোকে ভেঙে পড়েছেন। বিভীষণ সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'এ সত্যি নয়! এ মায়া-সীতা!'

বিভীষণের পরামর্শেই, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞ শেষ করার আগেই, ইন্দ্রজিৎকে মেরেছেন লক্ষ্মণ।

বিভীষণকে শক্তিশেল থেকে বাঁচাতে গিয়েই, লক্ষ্মণের বুকে এসে বেঁধে রাবণের 'শক্তিশেল'।

রাবণ বধের পর বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসালেন রাম। কৃত্তিবাস লিখেছেন—

'প্রচলিত রাজধর্ম অনুসারে বিভীষণ মন্দোদরীকে বিয়ে করেন।'

বাল্মীকি কিন্তু এ রকম কিছু লেখেননি। এ বিয়ে একান্তই কৃত্তিবাসের দেওয়া। বাল্মীকির নয়।

রামের অভিষেকের সময় বিভীষণ রামকে চামর দুলিয়ে হাওয়া করেছেন। অযোধ্যাও বিভীষণকে প্রচুর সম্মান দিয়েছে। রাম দিয়েছেন প্রচুর দামি দামি উপহার।

রামের বিষ্ণুলোকে যাত্রার খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন বিভীষণ। তিনিও সহমরণে যেতে চেয়েছেন।

রাম বলেছেন, 'না। যত দিন আকাশে চন্দ্র-সূর্য থাকবে, ততদিন তুমি বেঁচে থাকবে। এই আমার আদেশ।' অর্থাৎ, আবার 'চিরজীবী' হওয়ার আশীর্বাদ।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন বিভীষণ।

বিভীষণের পরামর্শ না শুনে, রাবণ নিজের এবং লঙ্কার ধ্বংস ডেকে এনেছেন। আর বিভীষণের পরামর্শকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে, রাম যুদ্ধ জিতেছেন। সীতাকে ফিরে পেয়েছেন। বিভীষণ লঙ্কার এবং রাবণের কল্যাণই চেয়েছিলেন। তবে রাবণকে সুপথে আনতে ব্যর্থ হয়ে, রাবণকে বিনাশ করে হলেও, লঙ্কাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। বিভীষণকে সঙ্গে না পেলে, রামের পক্ষে এ যুদ্ধ জেতা খুবই শক্ত হত।

আরও তথ্যের জন্য 'রাবণ' এবং 'রাম' দেখুন।

বিরাধ: দণ্ডকারণ্যবাসী নরখাদক রাক্ষস। বাবা 'যব'। মা 'শতহ্রদা'।

সীতাকে কোলে তুলে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে, রাম-লক্ষ্মণ অস্ত্রে অস্ত্রে এঁকে বিদ্ধ করেন।

বিরাধ বলেন, 'তোমরা তপস্বীর বেশ ধরে এসে এই সুন্দরী নারীকে ভোগ করবে? তা হতে দিচ্ছি না বাপু। এ আমার বউ হবে।' বলে হা হা করে হেসে উঠতেই, তাঁর গা থেকে সব তীর খুলে বেরিয়ে যায়।

এর পর বিরাধ সীতাকে ছেড়ে রাম-লক্ষ্মণকে কোলে তুলে নিয়ে বনের দিকে ছোটেন।

সীতা বলেন, 'হে রাক্ষসোত্তম! তুমি আমাকে নাও। এঁদের ছেড়ে দাও।'

রাম-লক্ষ্মণ এঁর দুই হাত ভেঙে দেন। রাম পা দিয়ে এঁর গলা চেপে ধরে লক্ষ্মণকে এক বিশাল গর্ত খুঁড়তে বলেন।

বিরাধ বলেন, "আমি গন্ধর্ব 'তুম্বুরু'। রম্ভার প্রতি আসক্ত হয়ে কর্তব্যে অবহেলা করেছিলাম। তাই কুবেরের শাপে আজ আমার এই অবস্থা। তবে কুবের বলেছিলেন, 'রামের হাতে মৃত্যু হলে তোমার স্বর্গলাভ হবে।' আজ আমার শাপমুক্তি হল। হে রাম! তোমাকে প্রণাম। তুমি আমার দেহ এই গর্তে পুঁতে দিয়ো। আর হ্যাঁ, এখান থেকে দেড় যোজন দূরে মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রম। তুমি সেখানে যাও। তোমার মঙ্গল হবে।"

রাম-লক্ষ্মণ বিরাধকে গর্তে ফেলতেই, বন-কাঁপানো শব্দ করে তিনি দেহত্যাগ করলেন।

'তুম্বুরু' অবস্থায় এই বিরাধই নারদকে গান শিখিয়েছিলেন।

'রাম' দেখুন।

বিরূপাক্ষ (১): রাবণের এক সেনাপতি। লঙ্কার যুদ্ধে সুগ্রীবের হাতে নিহত।

বিরূপাক্ষ (২): রাবণের এক সেনাপতি।

অশোকবন লণ্ডভণ্ড করার পর, হনুমানকে হারাবার জন্য রাবণ তাঁর যে-পাঁচ মন্ত্রিপুত্রকে পাঠান, বিরূপাক্ষ তাঁদের অন্যতম। হনুমান এঁকে বধ করেন।

বিশল্যকরণী: রামায়ণখ্যাত ঔষধি লতা।

শরীরের ভেতরে ঢুকে থাকা 'শল্য' ইত্যাদি যে কোনও অস্ত্রকে শরীরের বাইরে বের করে দিয়ে শরীরের ঘা ইত্যাদি সারিয়ে দিতে পারে এই লতা।

রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণ মৃতপ্রায় হলে, রামের কবিরাজ সুষেণের পরামর্শে

হনুমান 'মহোদয়' (গন্ধমাদন) পর্বত থেকে 'বিশল্যকরণী', 'সাবর্ণ্যকরণী', 'সঞ্জীবকরণী' আর 'সন্ধানী', এই চার রকম মহৌষধি নিয়ে আসেন।

হনুমান ঔষধির গাছ চিনতে না পারায়, গোটা পর্বতকেই তুলে আনেন। চার মহৌষধির নস্যি ('স্মেলিংসল্ট'?) নাকের গোড়ায় ধরতেই, লক্ষ্মণ উঠে বসেন।

বিশ্রবা (বিশ্বশ্রবা): ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্য এবং (রাজর্ষি তৃণবিন্দুর মেয়ে) হবির্ভূর ছেলে। রাবণের বাবা।

পুলস্ত্যের ছেলে বলে এক নাম 'পৌলস্ত্য'। বেদ শুনতে শুনতে এঁর জন্ম হয় বলে 'বিশ্রবা' নাম। 'বিশ্বশ্রবা' নামেও ইনি পরিচিত। অত্যন্ত ধার্মিক এবং জ্ঞানী।

লিঙ্গ আর কূর্মপুরাণ মতে, এঁর চার স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রী (বৃহস্পতির মেয়ে) দেববর্ণিনীর ছেলে কুবের।

দ্বিতীয়া স্ত্রী (রাক্ষস মাল্যবানের মেয়ে) বলাকার গর্ভে ত্রিশিরা, দূষণ, বিদ্যুজ্জিহ্ব নামে তিন ছেলে আর মালিকা নামে এক মেয়ে হয়।

তৃতীয়া স্ত্রী (মাল্যবান রাক্ষসের মেয়ে) পুষ্পোৎকটা জন্ম দেন মহোদর, মহাপার্শ্ব আর খর নামে তিন ছেলে আর কুম্ভীনসী নামে এক মেয়ের।

চতুর্থা স্ত্রী (রাক্ষস সুমালীর মেয়ে) কৈকসী বা নিকষার গর্ভে প্রদোষকালীন মিলনের ফলে জন্ম হয় রাবণ, কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণ নামে তিন ছেলে আর শূর্পণখা নামে এক মেয়ের। কৈকসীর প্রার্থনার ফলে, তাঁর ছোট ছেলে বিভীষণ ধর্মভীরু হন।

'পুলস্ত্য' এবং 'হবির্ভূ' দেখুন।

বিশ্বামিত্র: একজন বিশিষ্ট ব্রহ্মর্ষি।

বিশ্বামিত্রের জন্ম ক্ষত্রিয় বংশে। কিন্তু কঠোর তপস্যার ফলে ইনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।

গাধির ছেলে বলে নাম 'গাধেয়' বা 'গাধিজ' বা 'গাধিনন্দন'। আবার গাধির ঠাকুরদা কুশের নাম অনুসারে নাম 'কৌশিক'। পুরুবংশে জন্ম বলে হরিবংশে বিশ্বামিত্রকে 'পৌরব'ও বলা হয়েছে। পরশুরামের ঠাকুরমা সত্যবতীর ভাই বিশ্বামিত্র।

রামের কুলগুরু বশিষ্ঠের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের ছিল আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। বিশ্বামিত্রের একশো ছেলেকে হত্যা করেন বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠের একশো ছেলেকে কল্মাষপাদের পেটে যেতে হয়। বিশ্বামিত্রের কৌশলে।

বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র দু'জনেই রাজা সুদাসের পুরোহিত ছিলেন। ওই পুরোহিত থাকাকালীনই, যত ঝগড়ার সূত্রপাত।

সত্যবতীর শ্বশুর ভৃগু একদিন তাঁকে বর দিতে চান। সত্যবতী নিজের জন্য তপস্বী ছেলে আর মায়ের জন্য অমিততেজসম্পন্ন একটি ছেলে চান। ভৃগু দুটো পাত্রে চরু দেন সত্যবতীকে। সাদা চরুটা সত্যবতীর। লালটা তাঁর মা-র।

সত্যবতীর মার চক্রান্তে চরু উল্টে যায়। সত্যবতী খান লাল চরু। তাঁর মা খান সাদা। ভুল বুঝতে পেরে, সত্যবতী কেঁদে পড়েন শ্বশুর ভৃগুর পায়ে।

ভৃগু বলেন, 'তোমার মার ছেলে জন্মসূত্রে ক্ষত্রিয় হলেও, তাঁর আচরণ হবে ব্রাহ্মণের মতো।' আর তোমার ছেলে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মালেও, তার স্বভাব হবে ক্ষত্রিয়ের মতো। কারণ, তুমি সাদার বদলে লাল চরু খেয়েছ। আর তোমার মা

খেয়েছেন লালের বদলে সাদা।' (লাল রং ক্ষত্রিয়ের প্রতীক। সাদা রং প্রতীক ব্রাহ্মণের)

সত্যবতী প্রার্থনা করলেন, যাতে ওই ক্ষত্রিয়-স্বভাব তাঁর ছেলের ওপর না বর্তিয়ে তাঁর নাতির ওপর বর্তায়।

ভৃগু বললেন, 'তথাস্তু।'

সেই মতো, সত্যবতীর মা জন্ম দিলেন ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের। আর সত্যবতীর ঋষিকল্প ছেলে জমদগ্নির ঔরসে জন্মালেন পরশুরাম, যিনি একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন।

একবার মৃগয়ায় বেরিয়ে, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের আশ্রমে অতিথি হন। বশিষ্ঠ তাঁর কামধেনু নন্দিনীর বিশেষ ক্ষমতার সাহায্যে এঁদের সবার সেবা করেন। বিশ্বামিত্র নন্দিনীকে পেতে চাইলেন। এক হাজার গাভীর বিনিময়ে। রাজি হলেন না বশিষ্ঠ। শেষে বিবাদ।

বশিষ্ঠের আদেশে, নন্দিনী নিজের দেহ থেকে অসংখ্য সৈন্য সৃষ্টি করে বিশ্বামিত্রের শতপুত্র সহ বহু সৈন্যকে বধ করে। পরাজিত বিশ্বামিত্র নানা দৈব অস্ত্র প্রয়োগ করলে, বশিষ্ঠ তাঁর ব্রহ্মদণ্ডের সাহায্যে সে সবই ব্যর্থ করে দেন।

'ক্ষত্রিয় বলকে ধিক্! ব্রহ্মবলই বল।' এই বলে বিশ্বামিত্র চলে যান তপস্যায়। ব্রহ্মার বরে তিনি রাজর্ষি হন। তাতে তুষ্ট না হয়ে, আরও কঠোর তপস্যা চালাতে থাকেন।

ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীর স্বর্গে যেতে চেয়ে বশিষ্ঠ আর তাঁর একশো ছেলের সাহায্য চান। তাঁরা ত্রিশঙ্কুকে হতাশ করায়, তিনি তখন বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হন।

বিশ্বামিত্র নিজের যোগলব্ধ শক্তিতে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে পাঠান। কিন্তু ইন্দ্র এবং অন্য দেবতারা রাগে ত্রিশঙ্কুকে হেঁটমুণ্ড করে ফেরত পাঠান মর্তে।

বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে শূন্যে রেখে, সেখানেই দ্বিতীয় স্বর্গ তৈরি করা শুরু করলেন। দেবতারা ভয় পেয়ে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে সন্ধি করেন। ঠিক হয়, ত্রিশঙ্কু দেবতার মর্যাদা নিয়ে শূন্যেই বিচরণ করবেন। নক্ষত্ররা অনুসরণ করবেন ত্রিশঙ্কুকে।

বিশ্বামিত্র পুষ্করে গেলেন তপস্যায়। তখন রাজা অম্বরীষ এক যজ্ঞ করছিলেন। ইন্দ্র সেই যজ্ঞের পশুকে চুরি করেন। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ রাজাকে নরবলির ব্যবস্থা করতে বলেন পুরোহিত।

নরবলির লোক খুঁজতে গিয়ে, পাওয়া গেল শুনঃশেফকে। শুনঃশেফ ছিলেন ঋচীকের মেজ ছেলে। বিশ্বামিত্রের ভাগ্নে। পরশুরামের কাকা।

অম্বরীষ শুনঃশেফকে নিয়ে যাওয়ার পথে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে এলে, বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে অগ্নির স্তব করতে বলেন। যজ্ঞে শুনঃশেফকে আহুতি দিলেও, অগ্নির কৃপায় তিনি অক্ষত থাকেন। বিশ্বামিত্র তাঁকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন।

বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে, ব্রহ্মা তাঁকে 'ঋষি' আখ্যা দিলেন। তাতে তৃপ্ত না হয়ে, বিশ্বামিত্র আরও কঠোর তপস্যা শুরু করলে, ইন্দ্র ভয় পেয়ে যান। বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গের জন্য পুষ্করে পাঠান স্বর্গের ডাকসাইটে সুন্দরী অপ্সরা মেনকাকে।

মেনকার রূপে মোহিত হয়ে, বিশ্বামিত্র দশ বছর কাটান মেনকার সঙ্গে। তার ফলে জন্ম হয় শকুন্তলার।

হঠাৎ চৈতন্য হয় বিশ্বামিত্রের। এ কী করছেন তিনি! মেনকাকে ত্যাগ করে হিমালয়ের কৌশিকী নদীর তীরে গিয়ে তপস্যা শুরু করেন।

শিশু কন্যাকে মালিনী নদীর তীরে ফেলে রেখে ইন্দ্রসভায় ফিরে যান মেনকা। এক শকুন্ত পাখি একে রক্ষা করে। তাই ওই শিশুকন্যার নাম হয় 'শকুন্তলা'। পরে মহর্ষি কণ্ব 'শকুন্তলা'কে তুলে এনে পালন করেন।

কৌশিকী-তীরের তপস্যায় বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার বরে 'মহর্ষি'পদ পান। কিন্তু ব্রহ্মা সেই সঙ্গে এও বলে দেন, যে, পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করতে হলে, তাঁকে কাম জয় করতেই হবে। তাঁর কামের বিনাশ এখনও হয়নি।

সুতরাং, আবার তপস্যা। এবার দেবতারা পাঠালেন স্বর্গের আর এক নামজাদা অপ্সরা রম্ভাকে। বিশ্বামিত্র শাপ দিয়ে রম্ভাকে পাষাণ করে দিলেন। কিন্তু, এই শাপ দিতে গিয়ে তাঁর ক্রোধ হওয়ায়, তপস্যায় বিঘ্ন ঘটল।

কাজেই, আবার তপস্যা। আরও কঠোর। এবার ব্রহ্মা আর থাকতে পারলেন না। 'ব্রাহ্মণত্ব' দিলেন বিশ্বামিত্রকে।

বশিষ্ঠ খুব প্রশংসা করেছিলেন রাজা হরিশ্চন্দ্রের।

শত্রুর মুখে এত প্রশংসা এক রাজার? হরিশ্চন্দ্রের পরীক্ষা নিলেন বিশ্বামিত্র। সে পরীক্ষায় হরিশ্চন্দ্র রাজ্য, পুত্র, স্ত্রী, সব হারালেন। শেষে, কাশীতে চণ্ডাল হয়ে শবদাহ করতে হত তাঁকে।

সর্পাঘাতে মৃত পুত্র রোহিতাশ্বকে নিয়ে হতভাগিনী রানি শৈব্যা যখন শ্মশানে এলেন, তখন রানিকে চিনতে পেরে কাঁদতে লাগলেন হরিশ্চন্দ্র। রাজার ত্যাগে প্রসন্ন হয়ে বিশ্বামিত্র রাজ্য-ঐশ্বর্য-স্ত্রী-পুত্র সব ফিরিয়ে দিলেন তাঁকে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে, বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্র পরস্পরকে শাপ দেওয়ায়, দু'জনেই পাখি হয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করেন। তখন ব্রহ্মার মধ্যস্থতায় এঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। রাক্ষসরা বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ নষ্ট করার জন্য তাঁর আশ্রমে তাণ্ডব লাগিয়ে দেয়।

রাক্ষসদের ঠাণ্ডা করার জন্য বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে যান। 'বলা' আর 'অতিবলা' মন্ত্র শেখান দুই ভাইকে। এ ছাড়া দেন প্রচুর দিব্যাস্ত্র। রামের বাণে প্রাণ হারায় রাক্ষসী তাড়কা। যজ্ঞ নির্বিঘ্নে শেষ হয়।

রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে সীতার স্বয়ংবর সভায় যান বিশ্বামিত্র। পথে, রামের পাদস্পর্শে অহল্যার শাপমুক্তি হয়। হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে জিতে নেন রাম। সীতার বয়স তখন মাত্রই ছয়। রামের তেরো।

বিশ্বামিত্রই ছিলেন রামের অস্ত্রগুরু। আর কিমাশ্চর্যম্! রামের কুলগুরু ছিলেন বিশ্বামিত্রের চিরশত্রু বশিষ্ঠ! রাজযোটক বটে!

'রাম', 'বশিষ্ঠ', 'পরশুরাম', 'নন্দিনী', 'ত্রিশঙ্কু', 'শুনঃশেফ' এবং 'হরিশ্চন্দ্র' দেখুন।

বিষ্ণুধনু: বিষ্ণুর ব্যক্তিগত ধনু। বিশ্বকর্মার তৈরি।

হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে বিয়ে করে অযোধ্যায় ফিরছেন রাম। পথে হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় উঠল। ভূমিকম্পে সমস্ত গাছ উপড়ে পড়তে লাগল। অন্ধকারে ঢাকা পড়ল সূর্য।

ধুলোর ঝড়ে জ্ঞান হারালেন দশরথের সৈন্যরা।

দশরথ এবং অন্যরা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে দেখলেন, এক বিশাল চেহারার পুরুষ ঝড়ের বেগে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন তাঁদের সামনে।

চিনতে দেরি হল না কারও। ইনিই পরশুরাম। মাথায় বিশাল জটা। কৈলাসের মতো অতিকায় চেহারা। গা থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরচ্ছে। কাঁধে কুড়ুল। আর হাতে বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল মস্ত এক ধনু।

বশিষ্ঠ ইত্যাদি যে সব ঋষিরা দশরথের সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা ভয় পেলেন। 'এই রে! ইনি কি আবার ক্ষত্রিয় নিধন করবেন নাকি?' পরশুরামকে ফুল-বেলপাতা দিয়ে পুজো করলেন তাঁরা।

পরশুরাম বিস্ময়, অবিশ্বাস আর উপেক্ষা মেশানো দৃষ্টিতে দেখছিলেন রামকে। বললেন, 'রাম! তুমি হরধনু ভঙ্গ করেছ। আমি শুনেছি। খুব ভাল কথা। কিন্তু, আমি যে তোমার জন্য আর একটা ধনু এনেছি রাম! এই ধনুতে যদি তুমি তীর জুড়তে পারো, তবে বুঝব তুমি বীর। আর তা যদি করতে পারো, তবেই তোমার সঙ্গে লড়াই করব আমি।'

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল দশরথের। রামের বয়স সবে বারো পেরিয়ে তেরো চলছে। পরশুরাম বীরশ্রেষ্ঠ! পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেছেন। তাঁর সঙ্গে বালক রাম পারবে কেন?

দশরথ ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আপনি ইন্দ্রকে অস্ত্রত্যাগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কশ্যপকে বসুন্ধরা দান করে জপতপে মন দিয়েছেন। দয়া করে আমার ছেলেদের বাঁচান। রাম না বাঁচলে আমরাও কেউ বাঁচব না।'

দশরথের আর্তিকে পাত্তাই দিলেন না জামদগ্ন্য (পরশুরামের অন্য নাম)। বললেন, "শোনো রাম! তুমি যে 'হরধনু' ভেঙেছ, তা ত্রিপুরাসুরকে বধ করবার জন্য দেবতারা দিয়েছিলেন মহাদেবকে। আর এই যে ধনু দেখছ, এ ছিল বিষ্ণুর। তাই এর নাম 'বিষ্ণুধনু'। দুই ধনুই তৈরি করেছেন বিশ্বকর্মা।

"একবার। বিষ্ণুর সঙ্গে মহাদেবের মনোমালিন্য হয়। তখন বিষ্ণু এমন এক হুংকার দেন, যে, হরধনুর ছিলা একেবারে আলগা হয়ে যায়। বিষ্ণু এই ধনু দিয়েছিলেন আমার ঠাকুরদা ঋচীককে। ঠাকুরদার কাছ থেকে এই ধনু পান আমার বাবা জমদগ্নি।

"একদিন বাবার কাছে বিষ্ণুধনু ছিল না। সুযোগ বুঝে কার্তবীর্যার্জুন বাবাকে হত্যা করেন। তার প্রতিশোধ নিতেই, আমি একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছি।

"মহেন্দ্র পর্বতে তপস্যা করছিলাম আমি। সেখানেই খবর পেলাম, তুমি হরধনু ভেঙেছ। এবার তোমার বীরত্ব দেখাও। দেখি!"

পরশুরামের এই আস্ফালন রাম সহ্য করতে পারছিলেন না। কিন্তু বাবা উপস্থিত ছিলেন বলে খুব নরম করে বললেন, 'আপনার কীর্তির কথা আমি জানি। কিন্তু আমার শক্তির অপমানও তা বলে আমি সইব না।'

এই কথা বলে, বিষ্ণুধনুতে তীর জুড়লেন রাম। পরশুরামকে বললেন, 'নেহাৎ আপনি ব্রাহ্মণ, তার ওপরে আবার ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের আত্মীয় (বিশ্বামিত্রের বোন কৌশিকী বা সত্যবতীর নাতি)। তাই আপনাকে মারলাম না। তবে, এই তীর ছুড়ে আমি হয় আপনার গতি আটকাব, আর নয় আপনি তপস্যার ফলে যে-সব ঊর্ধ্বলোকে

বাস করার অধিকার অর্জন করেছেন, সে সব অধিকার আমি নষ্ট করে দেব।'

ব্রহ্মা আর অন্যান্য দেবতা এবং গন্ধর্বরা এসেছিলেন। দুই রামের (পরশুরামের আসল নাম 'রাম') লড়াই দেখতে। তাঁদের সবার চোখের সামনেই, পরশুরামের সমস্ত তেজ গিয়ে ঢুকল রামের শরীরে।

জড় পদার্থের মতো নিস্তেজ হয়ে গেলেন পরশুরাম। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন রামের দিকে। বললেন, 'কশ্যপকে বসুন্ধরা দান করেছি বলে পৃথিবীতে আর রাত্রিবাস করতে পারব না। তুমি আমার গতি রোধ কোরো না রাম। অনুমতি দাও, আমি মহেন্দ্র পর্বতে চলে যাই। তুমি বরং আমার তপস্যার ফল নষ্ট করে দাও।'

রাম তাই করলেন। তারপর পুজো করলেন মহাতেজস্বী মহাতপস্বী পরশুরামকে। পরশুরামও প্রদক্ষিণ করলেন রামকে। তারপর ফিরে গেলেন মহেন্দ্র পর্বতে।

'রাম', 'পরশুরাম' এবং 'হরধনু' দেখুন।

বীরবাহু: রাবণের বীরপুত্র। এঁর মা হলেন গন্ধর্ব চিত্রসেনের মেয়ে চিত্রাঙ্গদা।

ইনি অত্যন্ত রামভক্ত ছিলেন। রাম এঁকে মারতে চাননি। কিন্তু ইনি রামকে নানাভাবে বোঝালেন, যে, রামের হাতে মৃত্যু হলে ইনি রাক্ষসজন্ম থেকে মুক্তি পাবেন। এবং স্বর্গলাভ করবেন। তখন রাম এঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এবং, বলাই বাহুল্য, এঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন রাম।

বাল্মীকি-রামায়ণে এঁর কথা নেই। আছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে।

বেদবতী: দেবগুরু বৃহস্পতির নাতনি। ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজের মেয়ে। মা মাল্যবতী। কুশধ্বজ মা লক্ষ্মীকে মেয়ে রূপে পেতে চেয়ে কঠোর তপস্যা করেন। লক্ষ্মীর অংশেই জন্ম হয় বেদবতীর।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বেদ উচ্চারণ করেছিলেন। তাই এঁর নাম রাখা হয়েছিল 'বেদবতী'।

পুষ্করে এক মন্বন্তর কাল (৩০,৬৭,২০,০০০ বছর) ধরে কঠোর তপস্যা করেন বেদবতী। জন্মান্তরে বিষ্ণুকে স্বামী রূপে পাওয়ার দৈববাণী শোনেন।

এর পর বেদবতী গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে আবার তপস্যা করতে থাকেন। সেই সময় রাবণ তাঁকে দেখে তাঁর রূপে মোহিত হয়ে বেদবতীকে বিয়ে করতে চান। বেদবতী রাজি হন না। রাবণ বল প্রয়োগ করেন। বেদবতীর চুল ধরে টানেন। বেদবতী নিজের হাতকেই ছুরির রূপ দিয়ে নিজের চুল কেটে ফেলেন (ক্যারাটে কি?)।

রাবণকে শাসালেন বেদবতী, 'আমি এই আগুনে আত্মাহুতি দিচ্ছি। কিন্তু জেনে রেখো, আমি তোমার বধের জন্য আবার জন্মাব।'

পরের জন্মে এক পদ্মফুল থেকে জন্ম হল বেদবতীর। এবারেও, অসামান্য রূপলাবণ্য নিয়ে জন্মালেন। এবারেও, রাবণের কামদৃষ্টিতে পড়লেন। রাবণ তাঁকে জোর করে নিয়ে ঘরে তুললেন। রাবণের এক মন্ত্রী শরীরের লক্ষ্মণ দেখে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারতেন। তিনি বললেন, 'হে লঙ্কেশ্বর! এই রমণীকে অবিলম্বে পরিত্যাগ করুন। নয় এ-ই আপনার মৃত্যু ডেকে আনবে।'

রাবণ বেদবতীকে ফেলে দিলেন সাগরের জলে। তারপর, যেভাবেই হোক, দেবতাদের রাবণবধের পরিকল্পনাকে রূপ দিতে, এক ফুটফুটে শিশুকন্যার রূপ ধরে

বেদবতী আবির্ভূতা হলেন মিথিলায়। মিথিলার রাজা জনকের যজ্ঞভূমিতে লাঙলের ফলায় তৈরি হওয়া দাগে ('সীতা'য়) তাঁকে পেলেন জনক রাজা। 'সীতা' থেকে পাওয়া বলে, এবার নাম হল 'সীতা'।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে, বনবাসের সময় 'আসল সীতা' ছিলেন অগ্নিদেবের কাছে। 'ছায়া-সীতা'কেই রাবণ হরণ করেন। রাবণবধের পর সীতার অগ্নিপরীক্ষার সময় অগ্নিদেব আসল সীতাকে ফিরিয়ে দেন।

এক মতে, রাম আর অগ্নির পরামর্শে, ছায়া-সীতা পুষ্করে গিয়ে তিন লক্ষ বছর তপস্যা করেন। এই তপস্যার জোরেই, তিনি পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের যজ্ঞ থেকে উদ্ভূতা হন। 'যাজ্ঞসেনী' বা 'দ্রৌপদী' রূপে। এই হিসেবে, মা লক্ষ্মীই ত্রেতা যুগে সীতা এবং দ্বাপরে দ্রৌপদী হয়েছিলেন।

বৈদেহ—'সীতা' এবং 'রাবণ' দেখুন।
সীতার পালক-পিতা জনকের অন্য নাম। 'জনক' 'নিমি' এবং 'মিথি' দেখুন।

বৈশ্রবণ: কুবেরের অন্য নাম। 'কুবের' দেখুন।

বৈরোচন: বলির অন্য নাম। 'বলি' দেখুন।

ভগীরথ: ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা। রামের পূর্বপুরুষ।
দিলীপ এবং সুদক্ষিণার ছেলে। রঘুবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুর ভাই। দশরথের বাবা 'অজ'-র কাকা।

ছোটবেলায় দুর্বল হাড়ের জন্য ভগীরথের চেহারা ছিল একটা মাংসপিণ্ডের মতো। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতেন না।

একদিন অষ্টাবক্র মুনিকে সম্মান দিতে গিয়ে ভগীরথ কোনওক্রমে বেঁকে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। অষ্টাবক্র ভাবলেন, তাঁর বাঁকা দেহের জন্য ভগীরথ তাঁকে ব্যঙ্গ করছেন।

অষ্টাবক্র একই সঙ্গে শাপ আর বর দিয়ে বললেন, 'যদি আমাকে বিদ্রুপ করার জন্য তুমি এ ভাবে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো, তবে তোমার দেহ ওই রকম বাঁকাই থেকে যাবে। আর যদি তোমার দেহ সত্যি সত্যিই বাঁকা হয়, তবে তুমি সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী হবে।'

অষ্টাবক্রের শাপ ব্যর্থ হল। বর ফলল। সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হলেন ভগীরথ।

কপিলের শাপে ভস্ম হয়ে যাওয়া সগর রাজার ষাট হাজার ছেলেকে পাতাল থেকে উদ্ধার করতে গোকর্ণতে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন ভগীরথ। ব্রহ্মা খুশি হয়ে বর দিতে চাইলেন। ভগীরথ দুটি বর চাইলেন।

প্রথম প্রার্থনা, 'আমাদের বংশ যেন লোপ না পায়।'

দ্বিতীয় প্রার্থনা, 'কপিলের শাপে ভস্ম হয়ে যাওয়া সগর রাজার ষাট হাজার ছেলেই যেন গঙ্গার জলে পবিত্র এবং পাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে যেতে পারেন।'

প্রথম বর দিতে রাজি হলেন ব্রহ্মা। দ্বিতীয় বরের ব্যাপারে বললেন, 'গঙ্গার বেগ কি পৃথিবী ধারণ করতে পারবে? সে বেগ ধারণ করতে পারেন একমাত্র মহাদেব। তুমি তাঁকে প্রসন্ন করো।'

ভগীরথের তপস্যায় খুশি হয়ে মহাদেব গঙ্গার বেগ ধারণ করতে রাজি হলেন। গঙ্গাকে তিনি রাখলেন তাঁর জটায়। কিন্তু, গঙ্গা দুষ্টুমি করে মহাদেবকে সুদ্ধু ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন পাতালে। গঙ্গার দুষ্টুমির কথা টের পেয়ে, মহাদেব এক হাজার বছর গঙ্গাকে আটকে রাখলেন তাঁর জটায়।

ভগীরথ আবার শুরু করলেন মহাদেবের তপস্যা। খুশি হয়ে গঙ্গাকে ছেড়ে দিলেন মহাদেব।

গঙ্গা সাতটা ধারায় নেমে এলেন মর্তে। তিনটে ধারা গেল পুবে। তিনটে পশ্চিমে। সপ্তম ধারা চলল ভগীরথের পেছন পেছন। উত্তর থেকে দক্ষিণে। ভগীরথ গঙ্গাকে পথ দেখিয়ে এনেছিলেন বলেই, গঙ্গার এই ধারার নাম হল 'ভাগীরথী'।

গঙ্গার চলার পথে এক জায়গায় রাজর্ষি জহ্নু এক যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। গঙ্গা দুষ্টুমি করে জহ্নুর যজ্ঞের উপকরণ ভাসিয়ে নিয়ে চললেন। জহ্নু রেগে গিয়ে এক গণ্ডুষে খেয়ে ফেললেন গঙ্গাকে।

মুনি-ঋষি আর দেবতারা জহ্নুর কাছে এসে হাত জোড় করে গঙ্গার মুক্তি প্রার্থনা করলেন। বললেন, 'গঙ্গা আপনার মেয়ের মতো। দয়া করে ওর অপরাধ নেবেন না। ওকে ছেড়ে দিন।'

খুশি হলেন জহ্নু। গঙ্গাকে মুক্ত করে দিলেন তাঁর 'কান' দিয়ে। (মতান্তরে, 'জানু' দিয়ে)। জহ্নুর কন্যার পরিচয়ে গঙ্গার নাম হল 'জাহ্নবী'।

হরিবংশ মতে, গঙ্গা প্রথমে জহ্নুকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। জহ্নু সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায়, গঙ্গা অভিমানে তাঁর যজ্ঞ পণ্ড করে দেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত গঙ্গাকে পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে নিয়ে এলেন ভগীরথ। গঙ্গার পবিত্র স্পর্শে, শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে। সার্থক হল ভগীরথের নিশ্ছিদ্র, নিরলস তপস্যা।

আরও তথ্যের জন্য 'গঙ্গার মর্তে অবতরণ' দেখুন।

ভদ্র: রামের বন্ধু এবং বিদূষক-সভাসদ।

এঁর কাছেই রাম সীতার চরিত্র সম্বন্ধে অযোধ্যাবাসীদের কানাঘুষোর কথা প্রথম শোনেন। এঁর বক্তব্যকে সমর্থন করেন বিজয়, মধুমত্ত, দন্তবক্র, সুমাগধ প্রভৃতি রামের রাজসভার অন্যান্য বিদূষকরা। এঁদের কথামতোই, রাম সীতা-বিসর্জনের সিদ্ধান্ত নেন।

'রাম' দেখুন।

ভরত: ভগবান বিষ্ণুর অংশ-অবতার। বিষ্ণুর চার ভাগের এক ভাগ পেয়েছিলেন তিনি। দশরথ এবং কৈকেয়ীর ছেলে। রামের থেকে মাত্র এক দিনের ছোট। লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্নের থেকে মাত্র এক দিনের বড়।

রামের মতোই চেহারা ছিল ভরতের। মিথিলায় রাম-সীতার বিয়ের সময় একই সঙ্গে, অন্য ভাইদের মতোই, ভরতেরও বিয়ে হয়। জনকের ভাই কুশধ্বজের মেয়ে মাণ্ডবীর সঙ্গে বিয়ে হয় ভরতের।

বিয়ের কিছুদিন পরে, মামা যুধাজিৎ-এর সঙ্গে মামার বাড়ি গেছেন ভরত। সঙ্গে তাঁর ছায়া শত্রুঘ্নও।

অযোধ্যার দূত ভরত আর শত্রুঘ্ন, দুই ভাইকে আনতে গেল। দশরথের মৃত্যুর পর। তৃতীয় দিনে।

আগের রাতে ভরত দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন, কারও মৃত্যু হবে।

দূতরা বশিষ্ঠের নির্দেশে সব গোপন রেখেছিলেন ভরতের কাছে। অযোধ্যায় যে এত কাণ্ড ঘটে গেছে, তার বিন্দুবিসর্গও জানতেন না ভরত।

অযোধ্যায় ফিরে সব শুনে ভরত কৈকেয়ীকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করেছেন। কৌশল্যাও, প্রথমে ভরতকে ভুল বুঝেছিলেন। পরে কৌশল্যা তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। ভরত আত্মহত্যায় উদ্যত হন। বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র ইত্যাদি তাঁকে নিরস্ত করেন।

শত্রুঘ্ন মন্থরাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে, ভরত তাঁকে নিরস্ত করেন। বলেন, এঁকে হত্যা করেছি জানলে রাম আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। রাম অসন্তুষ্ট না হলে, মা কৈকেয়ীকেও আমি হত্যা করতাম।

রামকে ফিরিয়ে আনতে ভরত চললেন চিত্রকূটে। পথে নিষাদরাজ গুহ ভরতের বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখে প্রথমে তাঁকে সন্দেহ করেন। পরে গুহের পাঁচশো নৌকায় সসৈন্য ভরত গঙ্গা পার হন। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে এলে ভরদ্বাজও প্রথমে ভরতকে সন্দেহ করেন। সত্যিই! বড় দুর্ভাগ্য ভরতের!

চিত্রকূটে পৌঁছে ভরত রামের পা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ভরতের মুখে দশরথের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে ভেঙে পড়লেন রাম। ভরত রামকে ফেরাতে না পেরে, রামের পাদুকা চেয়ে নিলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, 'যত দিন না রাম ফেরেন, তত দিন আমি মাথায় জটা নিয়ে, বল্কল পরে, ফলমূল খেয়ে, এই পাদুকাকে সিংহাসনে বসিয়ে, নগরের বাইরে রামের প্রতীক্ষায় থাকব।'

তেরো বছরের মাথায়, সীতা হরণের খবর পেয়ে, ভরত তিনশো বীর রাজাকে তৈরি থাকতে বলেছিলেন। যাতে প্রয়োজনে রাবণের বিরুদ্ধে তাঁরা যুদ্ধ করতে পারেন।

রাম বনবাসের শেষে ফিরে এলে ভরত নন্দিগ্রামে তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করেন। রামের পাদুকা পরিয়ে দেন রামের পায়ে। রামকে ফিরিয়ে দেন রাজসিংহাসন।

সিংহাসনে বসে, লক্ষ্মণ যুবরাজ হতে না চাওয়ায়, লক্ষ্মণেরই ইচ্ছেয়, ভরতকে যুবরাজ করেছেন রাম। অহেতুক প্রাণনাশ আটকাতে, ভরতের অনুরোধে, রাম রাজসূয় যজ্ঞ করার ইচ্ছে ত্যাগ করেছেন।

গন্ধর্বদেশ জয় করে, তাকে দু'ভাগে ভাগ করে, দুই ছেলে 'তক্ষ' আর 'পুষ্কলে'র মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন ভরত।

রাম ভরতকে সিংহাসনে বসিয়ে সরযূতে আত্মোৎসর্গ করতে চাইলেন। ভরত সিংহাসনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে রামের সঙ্গেই সরযূর জলে ভবলীলা সাঙ্গ করে বিষ্ণু দেহে প্রবেশ করলেন। তুলনা হয় না ভরতের!

ভরতের মতো মহৎ চরিত্র সত্যিই বিরল। সত্যনিষ্ঠ, ধার্মিক ভরত অতি বড় বীর হয়েও, চিরকাল, মাত্র একদিনের বড়, দাদার অনুগত থেকেছেন।

ভরতের ভ্রাতৃভক্তি এবং আত্মহত্যার তুলনা নেই।

ঊনসত্তর বছর, একমাস, উনিশ দিন বেঁচে ছিলেন ভরত।

আরও তথ্যের জন্য 'রাম' এবং কৈকেয়ী' দেখুন।

ভস্মলোচন: রাবণের অনুচর। হাজার বছর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছ থেকে এই বর পেয়েছিলেন, যে, তিনি যার দিকে তাকাবেন, সে-ই ভস্ম হয়ে যাবে। বর দিয়ে ব্রহ্মা তাঁকে চোখে ঠুলি বেঁধে রাখতে বলেন।

রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলে, বিভীষণের পরামর্শ মতো, রাম এঁর চোখের সামনে আয়না ধরেন। আয়নায় নিজের মুখ দেখে নিজেই ভস্ম হয়ে যান ভস্মলোচন।

'রাম' দেখুন।

ভাসকর্ণ: অশোকবনে হনুমানের হাতে হত রাবণের পাঁচ সেনাপতির অন্যতম।

ভৃগু: সপ্তর্ষির এক ঋষি। মহর্ষি।

ঋচীক এবং চ্যবনের বাবা। জমদগ্নির ঠাকুরদা। পরশুরামের প্রপিতামহ। পুলোমার স্বামী। ব্রহ্মার যজ্ঞ থেকে জন্ম হয়েছে ভৃগুর। ভৃগুর বংশধররা সকলেই 'ভার্গব'।

একদিন। ভৃগু স্নানে গেছেন। এমন সময়, পুলোমা নামেরই এক রাক্ষস ভৃগুর স্ত্রী পুলোমাকে নিয়ে পালালেন। ভৃগুর স্ত্রী পুলোমা তখন গর্ভবতী।

এর আগে, 'রাক্ষস-পুলোমা' একবার 'স্ত্রী-পুলোমা'কে বিয়ে করতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। 'স্ত্রী-পুলোমা'র বাবা ভৃগুকেই মেয়ে দেন। সেই অপমানের জ্বালা মেটাতেই, এই হরণ।

'রাক্ষস-পুলোমা' ভৃগুর হোমাগ্নিকে বললেন, 'অগ্নি! সত্যি করে বলো, এই পুলোমা কার স্ত্রী?'

অগ্নি ভয় পেলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, তুমিই প্রথম এঁকে গ্রহণ করেছিলে বটে, কিন্তু মন্ত্রপাঠ করে তোমাদের বিয়ে হয়নি।'

'রাক্ষস-পুলোমা' শুয়োরের রূপ ধরে 'স্ত্রী-পুলোমা'-কে নিয়ে ছুটতে লাগলেন। 'স্ত্রী-পুলোমা'র প্রসব হয়ে গেল। সূর্যের মতো তেজসম্পন্ন সদ্যোজাত শিশুকে দেখেই, ভস্ম হয়ে গেলেন 'রাক্ষস-পুলোমা'। সেই শিশুই 'চ্যবন'।

'স্ত্রী-পুলোমা'র কান্না থেকে এক নদীর সৃষ্টি হল। ব্রহ্মা তার নাম দিলেন 'বসুধারা'।

(এই জন্যই কি বিয়ের সময় 'বসুধারা' আঁকার বিধান?)

'স্ত্রী-পুলোমা' ছেলে কোলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেন আশ্রমে।

ভৃগু ফিরলেন। শুনলেন সব। স্ত্রীকে বললেন, 'তোমার পরিচয় কে দিল রাক্ষসকে?'

পুলোমা বললেন, 'অগ্নি।'

ভৃগু শাপ দিলেন অগ্নিকে, 'এখন থেকে তুমি সর্বভুক্ হবে।'

প্রতর্দনের কাছে হেরে গিয়ে রাজা বীতহব্য এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন ভৃগুর কাছে। প্রতর্দন এলেন ভৃগুর আশ্রমে। বীতহব্যের খোঁজে।

ভৃগু বললেন, 'আমার আশ্রমে একজনও ক্ষত্রিয় নেই।'

ফিরে গেলেন প্রতর্দন। কিন্তু, মহর্ষিবাক্য মিথ্যে হওয়ার নয়। তাই বীতহব্য ভৃগুর এক কথাতেই হয়ে গেলেন ব্রহ্মর্ষি। সুতরাং অবধ্য।

বিষ্ণুপুরাণ মতে, ভৃগু ব্রহ্মার মানসপুত্র।

মনুসংহিতা মতে, ভৃগু হলেন দশ প্রজাপতির একজন। কর্দমের মেয়ে খ্যাতির গর্ভে এঁর দুই ছেলে হয়। 'ধাতা' এবং 'বিধাতা'। এক মেয়েও হয়। সেই মেয়েই 'লক্ষ্মী'।

মুনিদের অনুরোধে ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বরের মধ্যে কে বড়, তা বিচার করার ভার নিলেন ভৃগু। ভৃগু প্রথমে গেলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মাকে উপযুক্ত সম্মান দেখালেন না। ব্রহ্মা রেগে গেলেন। তখন স্তবে তাঁকে তুষ্ট করে ভৃগু এলেন মহেশ্বরের কাছে।

উপযুক্ত মর্যাদা না পেয়ে শিব তো ভৃগুকে বধ করতে গেলেন। ভৃগু সঙ্গে সঙ্গে শিবের স্তব করে তাঁকে ঠাণ্ডা করলেন।

সবার শেষে, এলেন বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু তখন ঘুমোচ্ছিলেন। ভৃগু বিষ্ণুর ঘুম ভাঙাতে বিষ্ণুর বুকে মারলেন এক লাথি।

হুড়মুড়িয়ে ঘুম থেকে উঠেই, বিষ্ণু সামনে দেখতে পেলেন ভৃগুকে।

ভৃগু তাঁর বুকে লাথি মেরেছেন শুনে, বিষ্ণু পরম যত্নে ভৃগুর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। ভাবলেন, লাথি মারতে গিয়ে ভৃগু নিশ্চয়ই পায়ে খুব ব্যথা পেয়েছেন। বিনয়াবনত হয়ে বললেন, 'মহর্ষি! আপনার লাগেনি তো?'

ভৃগু খুশি মনে ফিরে গেলেন। রায় দিলেন, 'ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মধ্যে বিষ্ণুই সর্বশ্রেষ্ঠ।'

'ভৃগুর পদচিহ্ন' স্থায়ী হয়ে রয়ে গেল বিষ্ণুর বুকে।

সীতাকে নির্বাসন দিয়ে ফিরে আসছেন লক্ষ্মণ। কাঁদছেন খুব।

তখন দশরথের অমাত্য এবং বিশ্বস্ত সারথি সুমন্ত্র বললেন, "দুঃখ কোরো না লক্ষ্মণ। এ রকম যে ঘটবে, তা আমি জানতাম। দুর্বাসার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। মহারাজ দশরথ দুর্বাসার কাছে তোমাদের দেশের ভবিষ্যৎ জানতে চেয়েছিলেন। দুর্বাসা তখন এক কাহিনী শোনান। দুর্বাসা বলেন—

"দেবতাদের-ভয়ে-পালিয়ে-বেড়ানো দৈত্যদের আশ্রয় দিয়েছিলেন ভৃগুর স্ত্রী। বিষ্ণু সে খবর পেয়ে প্রচণ্ড রেগে গেলেন। তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে ভৃগুর স্ত্রীর মাথা কেটে দিলেন।

"'ভৃগু শাপ দিলেন বিষ্ণুকে, 'অবধ্যা স্ত্রীকে হত্যার পাপে তোমাকে মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে। স্ত্রী-বিয়োগ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে দীর্ঘদিন।'

"'বিষ্ণুই রাম হয়ে জন্মেছেন। তিনি এগারো হাজার বছর রাজ্যশাসন করবেন। অনেক অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। ব্রহ্মলোকে যাবেন। সীতার গর্ভে তাঁর দুই ছেলে হবে।'"

অনুতপ্ত ভৃগু পরে বিষ্ণুর স্তব করে তাঁকে সন্তুষ্ট করেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজেকে মহর্ষিদের মধ্যে ভৃগু বলে গীতায় উল্লেখ করেছেন।

মকরাক্ষ: রাবণের সেনাপতি 'খর'-এর ছেলে।

কুম্ভ-নিকুম্ভের পতনের পর ইনি যুদ্ধে যান। প্রবল পরাক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করে রামের হাতে প্রাণ দেন।

মতঙ্গ: একজন মুনি।

পম্পাসরোবরের তীরে ঋষ্যমূক পর্বতের কাছে এঁর আশ্রমে শবরী রামের দর্শন পান। সীতার সন্ধানে রাম এখানে আসেন। বালী দুন্দুভি রাক্ষসকে মেরে এক যোজন দূরে ফেলে দিলে, দুন্দুভির মুখের রক্ত মতঙ্গের আশ্রমে এসে পড়ে। মতঙ্গ অভিশাপ দেন, ঋষ্যমূক পর্বতে এলেই বালীর মৃত্যু হবে।

বালীর ভয়ে ভীত সুগ্রীব এই জন্যই, ঋষ্যমূক পর্বতে লুকিয়ে ছিলেন। কারণ, সুগ্রীব জানতেন, মতঙ্গের শাপে বালী কোনওদিনই ঋষ্যমূক পর্বতে আসতে পারবেন না।

'শবরী', 'বালী', 'সুগ্রীব' এবং 'রাম' দেখুন।

মধু: এক ধর্মপরায়ণ দৈত্য।

লোলা দৈত্যের বড় ছেলে। রাবণের মাসতুতো বোন কুম্ভীনসীর স্বামী। লবণাসুর এবং মধুমতীর বাবা।

মহাদেব এঁকে এক শূল দিয়ে বলেছিলেন, 'যদি ব্রাহ্মণদের বিরোধিতা করো, তবে এ শূল তুমি হারাবে। অন্যথায়, এই শূল শত্রুকে বধ করে আবার তোমার কাছেই ফিরে আসবে।'

মধু বললেন, 'প্রভু! এই শূল যেন বংশানুক্রমে আমার বংশধরদের কাছেই থাকে।'

মহাদেব বললেন, 'তা হওয়ার নয় মধু! তবে তোমাব একটি ছেলে এই শূল পেতে পারে।'

মহাদেবের বরে মধুর ছেলে লবণ এই শূল পেয়েও, শত্রুঘ্নের বিরুদ্ধে তাকে কাজে লাগাতে পারেননি।

রাবণ তখন দিগ্বিজয়ে গেছেন। কুম্ভকর্ণের তখন মহানিদ্রা চলছে। বিভীষণ বসেছেন কঠোর তপস্যায়। লঙ্কায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা একটু ঢিলেঢালা। সুযোগ বুঝে, রাবণের মাসতুতো বোন কুম্ভীনসীকে নিয়ে পালালেন মধু।

রাবণ ফিরে এসে এ খবর শুনে তো একেবারে ক্রোধে ফেটে পড়লেন। মধুকে শিক্ষা দিতে তক্ষুনি ছুটলেন মধুপুরে।

কুম্ভীনসী পায়ে পড়লেন রাবণের। বললেন, 'মেয়েদের পক্ষে বিধবা হওয়ার চেয়ে বড় অভিশাপ আর কিছু নেই। দোহাই দাদা! তুমি ওকে মেরো না!'

রাবণ বললেন, 'কোথায় মধু? তাকে এখানে নিয়ে এসো।'

মধু ঘুমোচ্ছিলেন। কুম্ভীনসী তাঁকে ডেকে তুললেন। মধুকে ক্ষমা করলেন রাবণ। মধুর আপ্যায়নে তৃপ্ত হয়ে এক রাত কাটালেন মধুর বাড়িতে। তারপর মধুকে সঙ্গে নিয়ে চললেন কৈলাসে। দেবলোক জয় করতে।

আরও তথ্যের জন্য 'কুম্ভীনসী' এবং 'লবণাসুর' দেখুন।

মধুমতী: দৈত্যরাজ মধু এবং কুম্ভীনসীর মেয়ে। ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা হর্যশ্বের স্ত্রী। যদুর মা। রাবণের ভাগ্নি। লবণাসুরের বোন।

মধুমত্ত: রামের বন্ধু এবং রাজসভার বিদূষক-সভাসদ্।

সীতার সম্বন্ধে অযোধ্যার প্রজাদের কানাঘুষোর ব্যাপারে 'ভদ্র'র বক্তব্যকে ইনি সমর্থন করেন। সেই মতো সীতাকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন রাম।

‘ভদ্র’ দেখুন।

মন্থরা: কৈকেয়ীর বাপের বাড়ি থেকে পাঠানো কৈকেয়ীর একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণী দাসী।

যত নষ্টের গোড়া। জন্ম-কুব্জা। কদাকৃতি। নীচমনা। ঈর্ষাপরায়ণা। কূটবুদ্ধিসম্পন্না। কুমন্ত্রণায় পারদর্শিনী।

রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের প্রাক্কালে, মূলত এঁরই কুমন্ত্রণায়, কৈকেয়ী দশরথের কাছে দশরথের পূর্ব-প্রতিশ্রুত দুটি বর চান। এক বরে, রাম চোদ্দো বছরের জন্য বনে যাবেন। অন্য বরে, রামের বদলে ভরতের রাজ্যাভিষেক হবে। মন্থরাই কৈকেয়ীকে স্মরণ করিয়ে দেন বরের কথা।

শম্বরাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে আহত দশরথকে পরম সেবাযত্নে সুস্থ করে তুলেছিলেন কৈকেয়ী। তখনই তাঁকে দুই বর দিতে চান দশরথ। সেই বর বৃদ্ধ রাজার কাছে এখন চেয়ে নিতে কৈকেয়ীকে প্ররোচিত করেন মন্থরা।

মন্থরার কুপরামর্শে বিভ্রান্ত কৈকেয়ী মন্থরাকে এই কুবুদ্ধি দেওয়ার জন্য প্রচুর অলঙ্কার দিয়ে বলেন, ‘মন্থরা! আমার ভরত রাজা হলে তোমার ওই কুঁজ সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব আমি।’

মামার বাড়ি থেকে ফিরে এসে ভরত আর শত্রুঘ্ন এঁকে বধই করে ফেলতেন। কিন্তু, প্রথমত, স্ত্রীলোক অবধ্য, আর দ্বিতীয়ত, এ কাজ করলে রাম হয়তো আর তাঁদের মুখদর্শনই করবেন না। এ কথা ভেবে মন্থরাকে তাঁরা প্রাণে মারেননি।

আরও তথ্যের জন্য ‘ রাম’, ‘ভরত’ এবং ‘কৈকেয়ী’ দেখুন।

মন্দোদরী: রাবণের প্রধানা মহিষী। পঞ্চকন্যার (অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী) এক কন্যা। এঁর মা অপ্সরা হেমা। বাবা রাক্ষসদের বিশ্বকর্মা ‘ময়দানব’। মেঘনাদ, অক্ষয়কুমার ইত্যাদি বীরপুত্রের জননী।

সীতার সন্ধানে লঙ্কায় গিয়ে পূতচরিত্রা অসামান্যা সুন্দরী মন্দোদরীকেই প্রথমে সীতা বলে ভুল করেন হনুমান।

মন্দোদরী রাবণকে বহুবার অনুরোধ করেছিলেন সীতাকে রামের হাতে ফিরিয়ে দিতে। রামকে তিনি সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু বলেই জানতেন।

রাবণবধের পর রামের আদেশে বিভীষণ লঙ্কার রাজা হন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ মতে (বাল্মীকি রামায়ণ অনুসারে নয়।) তখনকার সমাজে প্রচলিত প্রথামতো বিভীষণ মন্দোদরীকে বিয়ে করেন।

আরও তথ্যের জন্য ‘রাম’ এবং ‘রাবণ’ দেখুন।

ময় (দানব): মহাপ্রতিভাধর দানবশিল্পী। দানবকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি এবং ইঞ্জিনিয়ার।

কশ্যপ এবং দিতির ছেলে। অপ্সরা হেমার স্বামী। মায়াবী, দুন্দুভি এবং মন্দোদরীর বাবা। রাবণের শ্বশুর।

দেবকুলে যেমন বিশ্বকর্মা, দানবকুলে তেমনই ময় সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। ব্রহ্মার বরে এবং শুক্রাচার্যের প্রশিক্ষণে অদ্বিতীয় শিল্পী হয়ে ওঠেন।

গৃহনির্মাণ বিদ্যার ওপর 'ময়মত' নামে এক অসাধারণ বই লেখেন ময়। এ বিষয়ে এ বই-ই নিঃসন্দেহ প্রথম।

অপ্সরা হেমার রূপে মুগ্ধ হয়ে হেমাকে বিয়ে করেন। রাবণের হাতে তুলে দেন অসামান্যা রূপবতী এবং অশেষ গুণবতী মেয়ে মন্দোদরীকে। উপহার হিসেবে দেন 'শক্তিশেল', সেই 'শক্তিশেল'—যার ঘায়ে লক্ষ্মণ চেতনা হারান।

সীতার খোঁজে বেরিয়ে, ক্লান্ত, শ্রান্ত বানররা এসে ঢুকে পড়েন 'ঋক্ষবিল' নামে এক আশ্চর্য এবং বিপজ্জনক গুহায়। সেই গুহার ভেতর দিয়ে এক যোজন (প্রায় আট মাইল) পথ হাঁটার পর, তাঁরা এসে পড়েন এক অপূর্ব সুন্দর বাগানে। সেখানে তাঁরা সোনা-রুপো-মণি-মাণিক্য দিয়ে তৈরি ময়দানবের সাত তলা বাড়ি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

মেরুসাবর্ণির মেয়ে তাপসী 'স্বয়ম্প্রভা' সে বাগানবাড়ি দেখাশোনা করতেন। তিনি বানরদের ময়-হেমার কাহিনী শোনান। তারপর ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত বানরদের পেটপুরে খাইয়ে দাইয়ে আবার গুহার বাইরে পৌঁছে দিয়ে আসেন। নইলে, সেই গুহাতেই পচে মরতে হত বানরদের।

খাণ্ডবদাহের সময় অর্জুনের কৃপায় প্রাণে বেঁচে যান ময়। সেই কৃতজ্ঞতায় কিছু করতে চাইলে, কৃষ্ণের নির্দেশে ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের জন্য এক অপূর্ব সভাঘর বানিয়ে দেন। সেই সভাঘর দেখে হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরেন দুর্যোধন।

ইন্দ্রের নিষেধ অগ্রাহ্য করে হেমাকে বিয়ে করার অপরাধে ইন্দ্র ময়কে 'বজ্র' ছুড়ে মেরে ফেলেন।

মহাপার্শ্ব (১): রাবণের সৎ ভাই।

কুম্ভকর্ণের পতনের পর ইনি যুদ্ধে যান। বানর ঋষভ এঁর গদার আঘাতে অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান ফিরে পেয়ে ঋষভ মহাপার্শ্বের গদা কেড়ে নিয়ে সেই গদা দিয়েই পিটিয়ে মহাপার্শ্বকে মেরে ফেলেন।

মহাপার্শ্ব (২): রাবণের অমাত্য।

মেঘনাদের মহাপতন ঘটলে ইনি যুদ্ধে যান এবং অঙ্গদ এঁকে হত্যা করেন।

মহীরাবণ: কৃত্তিবাস লিখেছেন এঁর কথা। বাল্মীকি লেখেননি। রাবণের ছেলে। পূর্বজন্মে গন্ধর্ব ছিলেন।

বিষ্ণুর সামনে নাচছিলেন। এমন সময় সেখানে এলেন অষ্টাবক্র মুনি। তাঁর বাঁকা দেহ দেখে ফিক্ করে হেসে ফেললেন গন্ধর্ব। অষ্টাবক্র শাপ দিলেন, 'তুই রাক্ষসের ঘরে জন্মাগে যা। পাতালে থাকবি।'

পায়ে পড়লেন গন্ধর্ব। মুনি বললেন, 'রাম-লক্ষ্মণকে এনে তোর কাছে পাতালে লুকিয়ে রাখবি। হনুমান তাঁদের খুঁজতে এসে তোর গলা কেটে দিলে তুই মুক্ত হয়ে আবার ফিরে আসবি এই বিষ্ণুলোকে।'

মহীরাবণ বিভীষণের রূপ ধরে সবাইকে অজ্ঞান করে রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে পালিয়ে এলেন পাতালে। উদ্দেশ্য, রাম-লক্ষ্মণকে বলি দেবেন মা যোগাদ্যা মহামায়ার কাছে। হনুমান মাছির রূপ ধরে এসে দেখা করলেন রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে।

মহামায়া বললেন, "শোনো হনুমান! রাম-লক্ষ্মণের পায়ের ধুলোয় এ মন্দির পবিত্র হয়ে গেছে। মহীরাবণ এক দুরাচারী। ও যখন রামকে বলির জন্য হাঁড়িকাঠে গলা বাড়াতে বলবে, রাম যেন তখন মহীরাবণকে বলে, 'আমি তো জানি না, কী করে হাঁড়িকাঠে গলা রাখতে হয়। আপনি একবার দেখিয়ে দিন।' যেই মহীরাবণ দেখাবে, অমনি তুমি এই খড়্গ দিয়ে তাকে বলি দেবে।"

মা মহামায়ার কথা মতোই কাজ করলেন হনুমান। মহীরাবণকে দেবীর কাছে বলি দিলেন।

মহোদর (১): রাবণের সৎ ভাই। যুদ্ধে নীলের হাতে মারা যান।

মহোদর (২): লঙ্কার এক সেনাপতি। লঙ্কার যুদ্ধে সুগ্রীবের হাতে নিহত হন।

মাণ্ডবী: ভরতের স্ত্রী। জনকের ছোট ভাই কুশধ্বজের মেয়ে।

এঁর গর্ভে ভরতের 'তক্ষ' আর 'পুষ্কল' নামে দুই ছেলে হয়। রামায়ণে এঁর সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু বলা নেই। শুধু নামমাত্র উল্লেখ আছে।

'ভরত' দেখুন।

মাতলি: ইন্দ্রের রথের সারথি।

রাবণবধের দিন ইন্দ্র রামের জন্য তাঁর রথ পাঠিয়ে দেন। মাতলির সারথ্যে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন রাম।

মান্ধাতা: ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা। যুবনাশ্বের ছেলে। পুত্র লাভের জন্য যজ্ঞ করেছিলেন যুবনাশ্ব। যজ্ঞ শেষে মন্ত্রপূত জলের কলস বেদির ওপর রেখে মুনিরা ঘুমিয়ে পড়েন। তৃষ্ণার্ত যুবনাশ্ব মাঝরাতে উঠে অজ্ঞানে সে জল নিজেই খেয়ে ফেলেন। অথচ সে জল খাওয়ার কথা তাঁর স্ত্রীর।

এর ফলে, একশো বছর পরে, যুবনাশ্বের শরীর ফুঁড়ে এক সূর্যতুল্য ছেলে বেরিয়ে এল। কিন্তু সে স্তন্যপান করবে কী ভাবে?

ইন্দ্র বললেন, 'ধাস্যতি মাময়ং', অর্থাৎ আমাকে ধারণ করবে। অর্থাৎ, আমার সাহায্যেই জীবিত থাকবে। 'ধাস্যতি' শব্দটি 'ধেট' ধাতুর পর 'তৃচ্' করে নিষ্পন্ন। 'ধেট্' ধাতুর মানে পান করা। এখানে, পান করা বলতে শিশুর মাতৃস্তন্য পান করা। কিন্তু, ইন্দ্র তো পুরুষ! মান্ধাতা তাঁর স্তন পান করবেন কী করে? তাই ইন্দ্র শিশু-মান্ধাতার মুখে নিজের আঙুল পুরে দিলেন। শিশু তাই চুষেই খিদে মেটাল। তাই সেই নবজাতকের নাম হল 'মান্ধাতা'।

সুমেরু পর্বতে মান্ধাতার সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ হয়। কেউ কাউকে হারাতে না পারায় শেষে বন্ধুত্ব হয়। মান্ধাতা স্বর্গ জয় করতে গেলেন।

ইন্দ্র বললেন, 'আগে গোটা পৃথিবী জয় করে এসো। মধুর ছেলে লবণকে আগে হারাও।'

মান্ধাতা লবণকে হারাতে গিয়ে লবণের হাতেই প্রাণ দিলেন। লবণকে পরে হত্যা করেছিলেন মান্ধাতারই এক বংশধর। শত্রুঘ্ন।

পিতৃগর্ভজাত বলে, মান্ধাতার মা (কন্দক রাজার মেয়ে) কালনিমি মান্ধাতার

'গর্ভধারিণী' নন।

মান্ধাতা শশবিন্দুর মেয়ে বিন্দুমতীকে বিয়ে করেন। তাঁদের তিন ছেলে এবং পাঁচ মেয়ে হয়। ছেলেরা হলেন, অম্বরীষ, মুচকুন্দ আর পুরুকুৎসু।

এই মুচকুন্দের বংশেই রামের জন্ম হয়।

মারীচ: রাবণের অনুচর। রাক্ষসী তাড়কা এবং হিরণ্যকশিপুর বংশধর রাক্ষস সুন্দের ছেলে।

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে মারীচ এবং অন্যান্য রাক্ষসরা খুব উৎপাত করছিলেন। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে আসেন এঁদের শায়েস্তা করার জন্য। মারীচের মা তাড়কাকে আগেই বধ করায়, মাতৃহীন মারীচকে প্রাণে না মেরে, রাম এঁকে একশো যোজন দূরে ছুড়ে ফেলেন।

দণ্ডকারণ্যে ছদ্মবেশে মুনি-ঋষিদের হত্যা করে তাঁদের মাংস খেয়ে সুখেই কাটছিল মারীচের। রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে সেখানে দেখে তাঁর প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে। ধারালো শিংওয়ালা হরিণের রূপ ধরে আরও দুই রাক্ষসের সঙ্গে মারীচ রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে আক্রমণ করেন।

রামের বাণে অন্য দুই রাক্ষসের ভবলীলা সাঙ্গ হলেও, মারীচ পালিয়ে বাঁচেন। তপস্বীর বেশে আশ্রমবাসী হয়ে থাকেন।

সীতাহরণের সুবিধের জন্য রাবণ মারীচকে সোনার মায়ামৃগ সেজে সীতাকে ভোলাতে বলেন। আগের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে, মারীচ রাজি হন না। রাবণ লোভ এবং ভয় দুই-ই দেখান। কাজ হাসিল হলে অর্ধেক রাজত্ব। অন্যথায় প্রাণদণ্ড।

মারীচ ভাবেন, রাবণের হাতে বেঘোরে মরার চেয়ে রামের হাতে প্রাণ দিয়ে মুক্তি পাওয়া অনেক শ্রেয়। কাজেই, রাবণের নির্দেশ পালন করতে রাজি হয়ে যান মারীচ।

সীতা যথারীতি মায়ামৃগকে দেখে মোহিত হন। এবং মেয়েদের যা স্বভাব, তাকে পাওয়ার জন্য প্রচণ্ড জেদাজেদি করতে থাকেন। রাম -লক্ষ্মণের কোনও কথাই কানে তোলেন না।

রাবণের চক্রান্ত সফল হয়। রাম ছোটেন সোনার হরিণ ধরতে।

রামের বাণে প্রাণ দেওয়ার সময় কুচক্রী মারীচ রামের গলায় 'ভাই লক্ষ্মণ! আমি মারা পড়লাম। আমায় রক্ষা করো! হা লক্ষ্মণ! হা সীতা!' বলে আর্তনাদ করেন।

সীতা গঞ্জনা দিয়ে লক্ষ্মণকে পাঠান রামের খোঁজে। শেষ অস্ত্র হিসেবে লক্ষ্মণ এক গণ্ডি কাটেন। ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনও কারণেই সীতাকে ওই গণ্ডির বাইরে যেতে নিষেধ করেন।

(এই গণ্ডির কথা বাল্মীকি বলেননি। বলেছেন কৃত্তিবাস।)

সীতা বামাসুলভ আচরণে সেই নিষেধাজ্ঞা বিস্মৃত হয়েই হোক, বা নিজেকে ভিক্ষুকবেশি রাবণের কাছে নিরাপদ ভেবেই হোক, গণ্ডির বাইরে যান। এবং অপহৃতা হন।

মারীচ রাবণকে রাম-লক্ষ্মণের শক্তি সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এবং সীতাহরণের চক্রান্ত পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, 'এর ফলে লঙ্কাসহ সমস্ত রাক্ষসকুলের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে।'

চোরা নাহি শুনে কভু ধর্মের কাহিনী। রাবণও শোনেননি মারীচের কথা।
আরও তথ্যের জন্য 'রাম', 'রাবণ', 'সীতা', এবং 'বিশ্বামিত্র' দেখুন।

মারুত: দিতির গর্ভজাত সপ্ত-সন্তান।
'সমুদ্র-মন্থন' দেখুন।

মালী: এক শক্তিশালী রাক্ষস। সুকেশ এবং বেদবতীর ছেলে। রাবণের দাদামশাই সুমালীর ভাই। অন্য ভাই মাল্যবান। বসুদার স্বামী।
আরও তথ্যের জন্য 'সুমালী' দেখুন।

মাল্যবান: এক বলবান রাক্ষস।
সুকেশ এবং বেদবতীর ছেলে। রাবণের দাদামশাই সুমালীর দাদা। অন্য ভাই মালী। সুন্দরীর স্বামী।
আরও তথ্যের জন্য 'সুমালী' দেখুন।

মিথি: ইক্ষ্বাকুর নাতি। নিমির ছেলে।
এঁর নাম অনুসারেই 'মিথিলা' নামের উৎপত্তি।
নিমির কোনও ছেলে ছিল না। বশিষ্ঠের শাপে নিমি অচেতন হয়ে যান।
মুনিরা যজ্ঞের অরণি জ্ঞানে এঁর দেহকে মন্ত্রের সাহায্যে মন্থন করতে লাগলেন।
তখন সেই অচেতন দেহ থেকে এক ছেলের জন্ম হল। সেই ছেলেই মিথি।
মন্থনের ফলে জন্ম বলে নবজাতকের নাম হল 'মিথি'। আর জনন থেকে নাম হল 'জনক'। বিগত দেহ অর্থাৎ 'বিদেহ' থেকে জন্ম বলে নাম হল 'বিদেহ' বা বৈদেহ'।
মিথি থেকে শুরু করে এ বংশের সব রাজাকেই বলা হত 'জনক'। বিষ্ণুপুরাণ মতে, জনকের সংখ্যা ৫৬। ভাগবত মতে, ৫৩। অবশ্য জনক বললে প্রথমেই সীতার বাবা সীরধ্বজের কথাই মনে হয়। মিথির ছেলে উদাবসুও জনক নামেই বেশি পরিচিত।
আরও তথ্যের জন্য 'নিমি', 'বিদেহ' এবং 'জনক' দেখুন।

মিথিলা: জনকের রাজধানী। বিদেহর রাজধানী বলে 'বিদেহ' নামেও পরিচিত। মিথিলার মেয়ে বলেই, সীতার এক নাম 'মৈথিলী'।

মুচকুন্দ: মান্ধাতা এবং বিন্দুমতীর ছেলে। পৃথুর বাবা। ইক্ষ্বাকুর ঠাকুরদা।
হরিবংশ মতে, অসুরদের বধ করার পুরস্কারস্বরূপ মুচকুন্দ দেবতাদের কাছে এই বর চেয়ে নিয়েছিলেন, যে, যে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবে, তার দিকে তিনি (মুচকুন্দ) তাকানো মাত্র সে ভস্ম হয়ে যাবে।
কৃষ্ণ মথুরায় কালযবনকে মারতে গিয়ে পালাবার ভান করে, যে গুহায় মুচকুন্দ ঘুমোচ্ছিলেন, সেখানে গিয়ে লুকোলেন।
কৃষ্ণকে ধাওয়া করে এসে কালযবনও ঢুকলেন সেই গুহায়। ঘুমন্ত মুচকুন্দকে কৃষ্ণ ভেবে কালযবন মুচকুন্দকে মারলেন এক লাথি। মুচকুন্দ ঘুম ভেঙে তাকাতেই, কালযবন ভস্ম হয়ে গেলেন।
কৃষ্ণ মুচকুন্দকে স্বর্গের সর্বসুখ ভোগের অনুমতি দিলেন।

মেঘনাদ (ইন্দ্রজিৎ): রাবণ এবং তাঁর প্রধানা মহিষী মন্দোদরীর বীরশ্রেষ্ঠ ছেলে মেঘনাদ।

জন্মের সময় মেঘের গর্জনের মতো শব্দ করে ইনি কেঁদেছিলেন। তাই 'মেঘনাদ' নাম। আবার, দেবরাজ ইন্দ্রকে যুদ্ধে হারিয়ে বন্দি করে লঙ্কায় নিয়ে এসেছিলেন। তাই 'ইন্দ্রজিৎ' নাম।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের তত্ত্বাবধানে নিকুম্ভিলা উপবনে সপ্তযজ্ঞ করে শিবের বরে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আর দিব্যরথ লাভ করেন। মহামায়ার আরাধনা করে, মায়াবল, লাভ করেন।

ইন্দ্রকে বন্দি করে লঙ্কায় নিয়ে আসার পর দেবতাদের সঙ্গে ব্রহ্মাও এলেন ইন্দ্রকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে। মেঘনাদ ইন্দ্রের মুক্তির বিনিময়ে ব্রহ্মার কাছে অমরত্বের বর চাইলেন। ব্রহ্মা এতে রাজি হলেন না।

মেঘনাদ বললেন, 'বেশ! তা হলে এই বর দিন, যে, যুদ্ধযাত্রার আগে আমি যখন অগ্নির উপাসনা করব, তখন অগ্নি থেকে এক দিব্যরথ বেরিয়ে আসবে। এবং সেই দিব্যরথে যতক্ষণ আমি অবস্থান করব, ততক্ষণ আমি অবধ্য থাকব।'

ব্রহ্মা দেখলেন, ইন্দ্রকে মুক্ত করতেই হবে। অগত্যা! রাজি হয়ে গেলেন এতেই।

অঙ্গদের হাতে সাময়িকভাবে পরাজিত হয়ে মেঘনাদ রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে বেঁধে ফেললে, গরুড় এসে দু'ভাইকে মুক্ত করেন। পরে আবার তাঁর বাণে রাম-লক্ষ্মণ চেতনা হারান। হনুমানের আনা ওষুধে তাঁদের চেতনা ফেরে।

'মায়া-সীতা'কে হত্যা করে রাম-লক্ষ্মণ সহ সমস্ত বানরসেনার মনোবল ভেঙে দেন মেঘনাদ। বিভীষণের পরামর্শে লক্ষ্মণ তাঁকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, যজ্ঞ শুরু করার আগেই, আক্রমণ এবং হত্যা করেন।

তাঁর রথের ধ্বজায় সিংহের ছবি আঁকা থাকত বলে ইন্দ্রজিৎকে কোথাও কোথাও 'মৃগরাজকেতু'ও বলা হয়েছে।

মেঘনাদ নিঃসন্দেহে বীরশ্রেষ্ঠ ছিলেন। নির্ভীক এই যোদ্ধাকে কৌশলে না মারলে, সামনাসামনি যুদ্ধে মারা কঠিন ছিল।

আরও তথ্যের জন্য ' রাম', 'লক্ষ্মণ' এবং ' রাবণ' দেখুন।

মৈথিলী: সীতার অন্য নাম। 'সীতা' দেখুন।

মৈন্দ: অঙ্গদের মামা।

রাম-রাবণের যুদ্ধে রামের হয়ে লড়াই করেছেন। রাম জাম্ববান, মৈন্দ আর দ্বিবিদকে কলিযুগ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে বলেছিলেন।

মৈনাক: মা মেনকার নাম অনুসারে তাঁর ছেলের নাম হয় 'মৈনাক'। বাবা হিমাবত।

কৈলাসের দক্ষিণ দিকের পর্বত। পুরাণ মতে, আগে পর্বতরা পাখির মতোই ডানা মেলে উড়ে বেড়াতেন। এবং বিশেষ করে ঋষিদের, ত্রাসের কারণ ছিলেন। ইন্দ্র সব পর্বতের ডানা কেটে দেন।

মৈনাক পবনদেবের কৃপায় সাগরে ঠাঁই পান। সেই কৃতজ্ঞতায়, পবনপুত্র হনুমানের সাগরলঙ্ঘনের সময়, হনুমানকে বিশ্রাম দিতে মৈনাক মাথা তুলে দাঁড়ান। হনুমান

অবশ্য বিশ্রাম নেননি। শুধু মৈনাকের মাথায় হাত ছুঁইয়ে চলে যান।
'হনুমান' দেখুন।

যক্ষ: ব্রহ্মার সন্তান। 'রাক্ষস' দেখুন।

যব: এক রাক্ষস। বিরাধের বাবা। শতহ্রদার স্বামী।

যাদবী: সগর রাজার মা। বাহুর স্ত্রী।
বাহুর মৃত্যুতে ইনি সহমরণে যাচ্ছিলেন। ঔর্ব মুনির বাধায় গর্ভবতী যাদবীর সহমরণে যাওয়া হল না। ঔর্ব মুনির আশ্রমেই জন্ম হয় সগরের।

যুধাজিৎ: কেকয় রাজপুত্র। কৈকেয়ীর দাদা। ভরতের মামা।
বিয়ের পর মিথিলা থেকে ফিরেই, ভরত মামা যুধাজিতের সঙ্গে কেকয়রাজ্যে দাদামশাইয়ের কাছে চলে যান। সঙ্গে নেন সৎ ভাই শত্রুঘ্নকে।

যূপাক্ষ: রাবণের সেনাপতি।
অশোকবন লণ্ডভণ্ড করার পর হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য যে-পাঁচ সেনাপতিকে রাবণ পাঠান, তাঁদের অন্যতম। হনুমানের হাতে হত।

রঘু: রঘু বংশের প্রতিষ্ঠাতা। দশরথের ঠাকুরদা। অজ-র বাবা। সুদক্ষিণা এবং দিলীপের ছেলে।
দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া চুরি করেছিলেন ইন্দ্র। রঘু ইন্দ্রকে হারিয়ে সে ঘোড়া উদ্ধার করেন। রঘু দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে প্রায় সব দেশ জয় করে ফেরেন। 'বিশ্বজিৎ' নামে এক বিশাল যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণদের সর্বস্ব দান করেন।
রঘুবংশে জন্মেছিলেন বলেই, রাম 'রঘুপতি' এবং 'রাঘব'।
আরও তথ্যের জন্য ' দিলীপ' এবং 'সুরভি' দেখুন।

রত্নাকর: বাল্মীকির অন্য নাম।
'বাল্মীকি' দেখুন।

রম্ভা: স্বর্গের এক ডাকসাইটে সুন্দরী অপ্সরা। দেবাসুরের সাগর-মন্থনের সময় উঠে আসেন।
একদিন। রাবণের দাদা কুবেরের ছেলে নলকুবেরের কাছে যাচ্ছিলেন। অভিসারে। পথে, কৈলাসে তাঁকে দেখতে পান নলকুবেরের কাকা রাবণ। কামার্ত রাবণের হাতে ধর্ষিতা হন রম্ভা। রম্ভার সব কাকুতি-মিনতি অগ্রাহ্য করে রাবণ তাঁকে ধর্ষণ করেন।
নলকুবের সব শুনে অভিশাপ দেন কাকাকে, 'ভবিষ্যতে কোনও মহিলার অনিচ্ছায় তাঁকে ভোগ করতে গেলেই, রাবণের মাথা সাত টুকরো হয়ে যাবে।'
তাই রাবণ সীতাকে হরণ করলেও, তাঁর সতীত্ব হরণ করতে পারেননি।
ইন্দ্রের আদেশে, রম্ভা বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভাঙতে গেলে, বিশ্বামিত্রের শাপে এক হাজার বছরের জন্য 'পাথর' হয়ে যান। 'শ্বেত' মুনি সেই পাথর-হয়ে-যাওয়া রম্ভাকে ছুড়ে মেরেছিলেন তাঁর তপস্যায় বিঘ্ন-সৃষ্টিকারিণী রাক্ষসী 'অঙ্গারিকা'র মাথায়।
অঙ্গারিকা ভয়ে ছুটে যান কপিতীর্থে। অঙ্গারিকার মৃত্যু হয়। কিন্তু কপিতীর্থে এসে

নিজের রূপ ফিরে পান রম্ভা। পাথর থেকে আবার অপ্সরায় পরিণত হন।

ইন্দ্রসভায় নাচতে নাচতে অন্যমনস্কা রম্ভার তালভঙ্গ হলে ইন্দ্রের শাপে তাঁকে মর্তে জন্মাতে হয়। নারদের পরামর্শে শিব পুজো করে আবার ফিরে যান স্বর্গে।

আর একবার। 'জাবালি' মুনির ধ্যান ভঙ্গ করেন রম্ভা। ইন্দ্রেরই আদেশে। এর ফলে 'ফলবতী' নামে এক মেয়ের জন্ম হয় রম্ভার গর্ভে।

'রাবণ' এবং 'নলকুবের' দেখুন।

রাক্ষস: রামায়ণের মতে, ব্রহ্মা প্রথমে জল সৃষ্টি করেন। তারপর নানারকম প্রাণী সৃষ্টি করে তাদের বললেন, 'তোমরা এ জলকে রক্ষা করো।'

প্রাণীদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, 'রক্ষামঃ', অর্থাৎ, 'আমরা রক্ষা করব।' তারা হল 'রাক্ষস'। আর কেউ কেউ বলল, 'যক্ষামঃ'। অর্থাৎ, 'আমরা পুজো করব'। তারা হল 'যক্ষ'।

বিষ্ণুপুরাণ মতে, কশ্যপের ঔরসে দক্ষের মেয়ে 'খসা'-র গর্ভে রাক্ষসদের জন্ম হয়েছে।

রাকা: সুমালী এবং কেতুমতীর মেয়ে। রাবণের মাসি। কৈকসীর বোন।

রাঘব: রঘুবংশজাত। সেই বিচারে দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, লব, কুশ ইত্যাদি সকলেই 'রাঘব'। বিশেষ ভাবে, রামের অন্য নাম।

'রাম' দেখুন।

রাম: রামায়ণের নায়ক। তথা প্রাণপুরুষ। ভগবান বিষ্ণুর অবতার। ইক্ষ্বাকু বংশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। অযোধ্যার রাজপুত্র। পরে রাজা।

বাবা অযোধ্যারাজ দশরথ। গর্ভধারিণী মা কৌশল্যা। ঠাকুরদা অজ। ঠাকুরমা ইন্দুমতী। স্ত্রী সীতা। শ্বশুরমশাই মিথিলারাজ জনক। দুই যমজ ছেলে—কুশ আর লব। নাতি (কুশের ছেলে) 'অতিথি'। চব্বিশতম বংশধর 'অগ্নিবর্ণ'। এঁর পরবর্তী আর কোনও বংশধরের নাম জানা যায় না।

চৈত্র মাসের (সৌর বৈশাখ মাসের) শুক্লা নবমী তিথিতে, পুনর্বসু নক্ষত্র যোগে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন দশরথের বড় আদরের, বড় সাধের, বড় আশার ছেলে রাম। কৌশল্যার গর্ভজাত দশরথের প্রথম পুত্র।

রামের কাঁধ উঁচু। হাত দুটো খুবই শক্তপোক্ত। গলায় শাঁখের মতো তিনটে দাগ কাটা। ভরাট মুখ। বিশাল চওড়া বুক। হাত হাঁটু ছাড়িয়ে গেছে। কপাল উঁচু। টানা টানা চোখ। নীল পদ্মের মতো। গায়ের রংও নীল পদ্মের মতো। হাঁটেন সিংহের মতো। দেখলেই সমীহ হয়। রূপগুণের এমন রাজযোটক সচরাচর দেখা যায় না।

রামের বয়স বারো ছাড়িয়ে তেরোয় পড়েছে। একদিন বিশ্বামিত্র মুনি এসে দশরথকে বললেন, 'রামকে চাই। মাত্র কয়েকদিনের জন্য। রাক্ষসদের অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। রাম তাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে আবার ফিরে আসবে।'

বশিষ্ঠ দশরথের কানে কানে বললেন, 'মহারাজ! বিশ্বামিত্রকে একদম চটাবেন না! তা হলে উনি কিন্তু শাপ দিয়ে আপনার সর্বনাশ করবেন। উনি যা চাইছেন, তা-ই করুন। নইলে ঘোর বিপদ।'

রাম চললেন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে। রাক্ষসদের সমূলে উৎখাত করতে। সঙ্গে চললেন, 'রামের ছায়া'। লক্ষ্মণ।

হাঁটিতে হাঁটিতে তাঁরা এলেন অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ থেকে ছ'ক্রোশ (প্রায় ১২ মাইল) দূরে। সরযূ নদীর তীরে। 'বলা' আর 'অতিবলা' নামে দুই অত্যন্ত শক্তিশালী মন্ত্র রামকে শিখিয়ে দিলেন বিশ্বামিত্র। এ মন্ত্র জপ করলে খিদে বা ক্লান্তি থাকে না। রাক্ষসরা কোনও ক্ষতি করতে পারে না।

রামের ধনুকের জ্যার টঙ্কার শুনে তেড়ে এল তাড়কা। ধুলোয় চারদিক ঢেকে দিয়ে ওপর থেকে বৃষ্টির মতো পাথর ছুড়তে লাগল। রাম তাড়কার দু'হাত কাটলেন। লক্ষ্মণ কাটলেন তার নাক আর কান। তাড়কা পালাল। রাম 'শব্দভেদী' বাণে তাড়কাকে আটকে 'নিশিত' বাণে তাকে বধ করলেন।

বিশ্বামিত্র খুশি হয়ে রামকে অনেক দিব্যাস্ত্র দিলেন। অনেক মন্ত্র শেখালেন।

বিশ্বামিত্র তাঁর 'সিদ্ধাশ্রমে' এসে যজ্ঞ শুরু করলেন। রাক্ষস মারীচ (তাড়কার ছেলে) আর সুবাহু যজ্ঞ বেদিতে রক্ত বৃষ্টি করতে লাগল। সদ্য মাতৃহারা মারীচকে প্রাণে না মেরে 'শীতেষু' বাণের সাহায্যে রাম ছুড়ে ফেললেন একশো যোজন (প্রায় ৮০০ মাইল) দূরের সমুদ্রে। সুবাহু আর অন্য রাক্ষসরা রামের হাতে প্রাণ দিল।

এবার বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে চললেন 'মিথিলা'য়। জনক রাজার যজ্ঞ-সভায়। পথে অহল্যাকে শাপমুক্ত করলেন রাম। (চরিত্রপঞ্জিতে 'অহল্যা' দেখুন)। তারপর সবাই এলেন মিথিলায়।

পরদিন। জনকের 'হরধনু'-তে (আসল নাম 'সুনাভ'। 'হরধনু' দেখুন।) জ্যা আরোপ করতে গিয়ে বিশাল হরধনু ভেঙে দু'টুকরো করে ফেললেন রাম। অন্য রাজারা, শত চেষ্টাতেও, হরধনুকে তুলতেই পারেননি। হরধনু ভাঙার বিকট শব্দে রাম, লক্ষ্মণ, বিশ্বামিত্র আর জনক ছাড়া উপস্থিত সকলেই জ্ঞান হারালেন।

জনকের ঘোষণা ছিল, যিনি হরধনুতে জ্যা আরোপ করতে পারবেন, তাঁর গলাতেই মালা দেবেন জনকের বীর্যশুল্কা মেয়ে 'সীতা'। জনক দশরথকে আনালেন অযোধ্যা থেকে। রামের গলায় মালা দিলেন সীতা। সীতার বয়স তখন ছয়। রাম তেরোয় পড়েছেন।

অযোধ্যায় ফেরার পথে পরশুরামের 'বিষ্ণুধনু'তে বাণ জুড়ে পরশুরামের দর্প চূর্ণ করলেন রাম। রাম-সীতার বিয়ের পর বারো বছর কেটে গেছে। রামের বয়স এখন পঁচিশ। সীতার আঠারো। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চাইলেন দশরথ। বাদ সাধলেন কৈকেয়ী। তাঁর বাপের বাড়ি থেকে পাঠানো কুব্জা দাসী মন্থরার কুপরামর্শে, বৃদ্ধ দশরথের কাছে, দশরথের দেওয়া পূর্বপ্রতিশ্রুতি মতো, দুই বর চেয়ে নিলেন কৈকেয়ী। এক বরে, রামের বদলে ভরতকে রাজা করতে হবে। দ্বিতীয় বরে, ভরতের রাজ-সিংহাসনকে নিষ্কণ্টক করতে, রামকে জটাচীরধারী হয়ে চোদ্দো বছরের জন্য বনবাসে যেতে হবে।

বিনামেঘে বজ্রাহত হলেন সীতা। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'আমিও যাব আপনার সঙ্গে!'

লক্ষ্মণ বললেন, 'আমিও যাব!'

কৈকেয়ীর আনানো বল্কল পরলেন দু'ভাই। সীতার পাটের শাড়ির ওপরেই চীর

(কাপড়ের/গাছের ছালের টুকরো) জড়িয়ে দিলেন রাম। কৌশল্যার যেন যত্নের ত্রুটি না হয়, সে দিকে দশরথকে নজর দিতে বললেন রাম।

কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা আর অন্য সাড়ে তিনশো সৎমার সঙ্গে অন্য গুরুজনদেরও চরণে প্রণাম জানিয়ে রথে উঠলেন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা।

রথ ছোটালেন সুমন্ত্র। রথের পেছন পেছন ছুটতে লাগলেন দশরথ, কৌশল্যা আর যত অযোধ্যাবাসীরা। রাম সুমন্ত্রকে আরও জোরে রথ ছোটাতে বললেন।

তমসার তীরে প্রথম রাত কাটালেন তাঁরা। নাছোড়বান্দা কিছু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে এসেছিলেন তমসার তীর পর্যন্ত। তাঁদের ঘুম ভাঙার আগেই, রামের নির্দেশে সুমন্ত্র রথ ছোটালেন। যাতে অনুগমনকারীরা আর অনুসরণ করতে না পারেন।

পরদিন। সুমন্ত্রের রথে চেপে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা উত্তর কোশল অতিক্রম করে বেদশ্রুতি গোমতী আর স্যন্দিকা নদী পার হয়ে, এলেন শৃঙ্গবেরপুরে (মির্জাপুরের কাছে)। পথে মা-বাবা আর অযোধ্যার উদ্দেশে তাঁরা হাত জোড় করে প্রণাম জনালেন।

শৃঙ্গবেরপুরের নিষাধরাজা গুহ (মতান্তরে গুহক/গুহকমিতা) ছিলেন রামের বন্ধু। খুব খাতির করলেন তিনি। সেখানে এক রাত কাটিয়ে গুহর নৌকায় গঙ্গা পার হলেন রাম। সুমন্ত্রকে রথ নিয়ে ফিরে যেতে বললেন অযোধ্যায়। গুহের আনা বটের আঠায় মাথায় জটা তৈরি করলেন দু'ভাই। কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন দশরথের একান্ত বিশ্বস্ত অমাত্য এবং সারথি সুমন্ত্র।

এবার শুরু হল বনের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে পথ চলা। লক্ষ্মণ আগে। মাঝে সীতা। সবার পেছনে রাম।

বৎস দেশে (যমুনার তীরে, প্রয়াগের কাছে) এসে তাঁরা বরাহ, ঋষ্য, পৃষত আর মহারুরু নামে চারটে পশু শিকার করলেন। আগের তিন দিন শুধু জল খেয়ে কেটেছে। আজ এই সব পশুর মাংস খাবেন।

পরদিন তাঁরা এসেছেন প্রয়াগে। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে। ভরদ্বাজ রামকে তাঁর আশ্রমেই চোদ্দো বছর কাটাতে বললেন।

রাজি হলেন না রাম। বললেন, 'অযোধ্যার এত কাছে থাকলে অযোধ্যা থেকে ঘন ঘন লোকজন আসবেন। দেখা করতে। সেটা আমার একেবারেই পছন্দ নয়।'

ভরদ্বাজ রামকে চিত্রকূট পর্বতে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

পরদিন। অর্থাৎ বনবাসের পঞ্চম দিনে, কাঠের ভেলায় যমুনা পার হলেন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা। হরিণের মাংস খেয়ে সে রাত যমুনার তীরেই কাটালেন তাঁরা।

পরদিন। এলেন চিত্রকূটে। মহর্ষি বাল্মীকির (ইনি রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকি নন) আশ্রমের কাছেই এক পর্ণকুটির তৈরি করলেন লক্ষ্মণ। কৃষ্ণ-মৃগ আগুনে পুড়িয়ে, যজ্ঞ করে, গৃহপ্রবেশ করলেন তিনজন।

বনবাসের পাঁচ সপ্তাহ কেটে গেছে। একদিন। দূরে খুব চিৎকার শুনে আর ধুলো-ওড়া দেখে, রামের নির্দেশে এক শালগাছে উঠে লক্ষ্মণ দেখলেন, ভরত আসছেন। সঙ্গে বিশাল এক সেনাবাহিনী।

লক্ষ্মণ ধরেই নিলেন, যে, ভরত নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগের জন্যই, তাঁদের বধ করতে আসছেন। রাম বুঝিয়ে সুঝিয়ে লক্ষ্মণের ভুল ভাঙালেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে

অত্যন্ত লজ্জিত হলেন লক্ষ্মণ।

জটাবল্কলধারী ভরত কাঁদতে কাঁদতে এসে রামের পা জড়িয়ে ধরলেন। ভরতের মুখে দশরথের মৃত্যুসংবাদ শুনলেন রাম। জ্ঞান হারালেন। পরে 'মন্দাকিনী' (বা 'মাল্যবতী') নদীতে বাবার আত্মার উদ্দেশে তর্পণ করলেন।

মহর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে কৌশল্যাসহ রামের মায়েরাও এসে উপস্থিত হলেন চিত্রকূটে।

রামকে ফেরাতে ভরত রামের পর্ণকুটিরের দরজায় ধরনা দিতে চাইলেন। রাম আটকালেন তাঁকে। (বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম 'ধরনা'।)

ভরত বললেন, 'দাদা! আপনার প্রতিনিধি হয়ে আমি চোদ্দো বছর বনবাসে থাকব। আপনি ফিরে গিয়ে অযোধ্যা শাসন করুন।!'

রাম সবিনয় ভরতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। অগত্যা! ভরত কাঁদতে কাঁদতে রামের পাদুকা মাথায় নিয়ে বিদায় নিলেন।

গন্ধর্ব তুম্বুরু শাপগ্রস্ত হয়ে রাক্ষস বিরাধের রূপ ধরে এসে সীতাকে হরণ করার চেষ্টা করলে, রাম-লক্ষ্মণ বিরাধকে বধ করেছেন।

শাপমুক্ত হয়েছেন বিরাধ। শাপমুক্ত বিরাধের কথা মতো রাম এসেছেন মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমে। রাম-দর্শনে তৃপ্ত শরভঙ্গ রামকে সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে দেহত্যাগ করেছেন।

সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে এক রাত কাটিয়ে দণ্ডকারণ্যের এ আশ্রম সে আশ্রম করে ঘুরে বেড়িয়েছেন রাম। এ ভাবেই কেটে গেছে বনবাসের দশ বছর। আবার ফিরে গেছেন সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে।

সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে এবার বছর দুয়েক কাটিয়ে, চললেন অগস্ত্য-দর্শনে। পথে অগস্ত্যের ভাই তপস্বীর আশ্রমে এক রাত কাটিয়ে, এলেন অগস্ত্যের আশ্রমে। অগস্ত্য রামকে বৈষ্ণব-ধনুসহ অনেক অস্ত্রশস্ত্র দিলেন।

অগস্ত্যের পরামর্শে রাম চললেন পঞ্চবটী। পথে জটায়ুর সঙ্গে দেখা। জটায়ু তাঁদের নিয়ে এলেন পঞ্চবটীতে। লক্ষ্মণের তৈরি পর্ণকুটিরে পরমানন্দে দিন কাটাতে লাগলেন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা।

রাবণের বিধবা বোন শূর্পণখা একদিন হঠাৎ এসে রামকে বিয়ে করতে চাইলেন। রাম মজা দেখার জন্য শূর্পণখাকে পাঠালেন লক্ষ্মণের কাছে। লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক কান কাটলেন। ('শূর্পণখা' দেখুন।)

শূর্পণখার মাসতুতো ভাই খর বোনের অপমানের প্রতিশোধ নিতে চোদ্দো জন বীর রাক্ষসকে পাঠালে, রাম সকলকেই যমালয়ে পাঠিয়েছেন। চোদ্দো হাজার রাক্ষস সেনা নিয়ে ছুটে এসেছেন তিন মহাবীর। খর, দূষণ আর ত্রিশিরা। মাত্র তিন দণ্ডের (১ ঘণ্টা ১২ মিনিট) মধ্যে খর, দূষণ আর ত্রিশিরাসহ চোদ্দো হাজার রাক্ষসকেই যমালয়ে পাঠিয়েছেন রাম।

রাবণের ক্রোধের আগুনে ঘি পড়ল। ডেকে পাঠালেন তাড়কার ছেলে মারীচকে। বললেন, 'মায়া-হরিণ' সেজে সীতাকে ভোলাতে হবে। মারীচ প্রথমে রাজি হননি। কিন্তু রাবণের ভয়ে মারীচকে হরিণ সাজতেই হল।

'মায়ামৃগ' দেখে বিভ্রান্ত হলেন সীতা। বললেন, 'আমার সোনার হরিণ চাই। ও

হরিণ না পেলে আমি বাঁচব না।'

অগত্যা! রাম ছুটলেন হরিণ ধরতে। সীতার পাহারায় রইলেন লক্ষ্মণ। মারীচ রামের গলা নকল করে 'হা লক্ষ্মণ! হা সীতা!' বলে চেঁচাতে লাগলেন। সীতার গঞ্জনায় লক্ষ্মণ ছুটলেন রামের খোঁজে। রাবণের চক্রান্ত সিদ্ধ হল। রাম-লক্ষ্মণের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সাধুর ছদ্মবেশে এসে সীতাকে নিয়ে পালালেন রাবণ। পালালেন বনে-লুকিয়ে-রাখা পুষ্পক বিমানে চড়ে।

ফিরে এসে সীতাকে খুঁজে না পেয়ে শোকে পাগলের মতো হয়ে গেলেন রাম। খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেলেন রক্তাক্ত এবং মুমূর্ষু জটায়ুকে। জটায়ু বললেন, 'লঙ্কেশ্বর রাবণ সীতাকে হরণ করেছেন।' খবরটা দিয়েই মারা গেলেন জটায়ু।

পিতৃবন্ধু জটায়ুর শব দাহ করে এবং তাঁর উদ্দেশে তর্পণ করে, ক্রৌঞ্চ অরণ্যে এলেন রাম-লক্ষ্মণ। সেখানে রাক্ষসী অয়োমুখী লক্ষ্মণকে বিয়ে করতে চাইলে, লক্ষ্মণ তাঁর নাক, কান আর স্তন কেটে ফেললেন।

শাপগ্রস্ত রাক্ষস কবন্ধ রামের হাতে প্রাণ দিয়ে শাপমুক্ত হয়ে রামকে ঋষ্যমূক পর্বতে বানররাজ সুগ্রীবের সাহায্যপ্রার্থী হতে বললেন।

বৃদ্ধা তাপসী শবরী ছিলেন রামের প্রতীক্ষায়। তাঁকে দেখা দিয়ে রাম চললেন ঋষ্যমূকে। শবরী আগুনে আত্মাহুতি দিলেন।

ঋষ্যমূক পর্বতে এসে পৌঁছতেই, রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় এবং সেখানে আসার কারণ জানতে, হনুমানকে দূত হিসেবে পাঠালেন সুগ্রীব। পরে সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল রামের। সুগ্রীব সীতা উদ্ধারে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। রামও দিলেন সুগ্রীবের দাদা বালীকে বধ করে সুগ্রীবকে রাজ্য আর তাঁর স্ত্রী রুমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি।

আড়ালে লুকিয়ে থেকে কৌশলে বালীকে মেরেছেন রাম। সুগ্রীব রাজা হয়ে সীতা উদ্ধারের কথা ভুলে গেলেন। লক্ষ্মণের ধমকে সুগ্রীবের চেতনা ফিরল। বানরবাহিনীকে সীতার সন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন সুগ্রীব।

সাগর লঙ্ঘন করে লঙ্কা থেকে সীতার খবর নিয়ে এলেন হনুমান। রাবণের ছোট ভাই বিভীষণ রাবণকে ত্যাগ করে রামের চরণে এসে আশ্রয় নিলেন।

বিশ্বকর্মার ছেলে নলের তৈরি সেতুর ওপর দিয়ে বিশাল বানর-ভল্লুক বাহিনী নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ চললেন লঙ্কায়। সীতা উদ্ধারে। রাবণের দুই চর শুক এবং সারণ খবর সংগ্রহ করতে এসে ধরা পড়লেন বানরদের হাতে। রাম তাঁদের মুক্তি দিলেন। সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে রাম বালীর ছেলে অঙ্গদকে পাঠালেন রাবণের কাছে। রাবণের দম্ভে সে চেষ্টা ব্যর্থ হল।

শুরু হল যুদ্ধ। রাবণের বীর ছেলে ইন্দ্রজিতের ছোড়া নাগপাশে বদ্ধ হলেন রাম-লক্ষ্মণ। সাপের যম গরুড় ছুটে এলেন। পালাল সব সাপ। জ্ঞান ফিরে পেলেন রাম-লক্ষ্মণ। রাম-লক্ষ্মণ আর বানরদের হাতে একে একে প্রাণ দিলেন ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, প্রহস্তের মতো রথী-মহারথীরা।

রাবণ নিজেই এলেন যুদ্ধে। সঙ্গে নিলেন ইন্দ্রজিৎ, অতিকায়, মহোদর, কুম্ভ, নিকুম্ভ ইত্যাদি রাক্ষসবীরকে। হনুমানের এক ঘুষিতে অচেতন হলেন রাবণ। চেতনা ফিরলে, ছুড়লেন 'শক্তিশেল'। সেই শেলের ঘায়ে চেতনা হারালেন লক্ষ্মণ। হনুমান লক্ষ্মণকে

রামের কাছে আনতেই, লক্ষ্মণের জ্ঞান ফিরে এল। শক্তিশেল ফিরে গেল রাবণের কাছে।

রামের হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে, রামের দয়ায় প্রাণভিক্ষা পেয়ে, ফিরে গেলেন রাবণ। অসময়ে ঘুম থেকে তুলে ভাই কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধে পাঠালেন রাবণ। কুম্ভকর্ণ বীরের মতো যুদ্ধ করে প্রাণ দিলেন রামের হাতে।

আবার ইন্দ্রজিৎ মায়াযুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণকে অচেতন করে ফেললেন। 'ঔষধি' এনে রাম-লক্ষ্মণের প্রাণ বাঁচালেন হনুমান।

ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতাকে যুদ্ধক্ষেত্রে এনে হত্যা করলেন। রাম-সত্যিই সীতা আর বেঁচে নেই, ভেবে একেবারেই ভেঙে পড়লেন। বিভীষণ রামকে বোঝালেন, "এ সীতা 'মায়া-সীতা'! সত্যি নয়।"

বিভীষণের পরামর্শে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে অসহায় ইন্দ্রজিৎকে বধ করলেন লক্ষ্মণ।

রাবণ এলেন যুদ্ধে। তাঁর ছোড়া শক্তিশেলে নিস্পন্দ হয়ে গেলেন লক্ষ্মণ। রাম কাঁদতে লাগলেন। হনুমান আবার ছুটলেন ঔষধি আনতে। ঔষধির গন্ধ নাকে যেতেই, চেতনা ফিরে পেলেন লক্ষ্মণ।

এবার শুরু হল রাম-রাবণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। ইন্দ্রের পাঠানো রথে চেপে মাতলিকে সারথি করে মহাবীর রাবণকে বধ করলেন রাম।

যথাযথ মর্যাদায় রাবণের সৎকারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন রাম। বিভীষণের অভিষেক হয়ে গেল। হনুমান সীতাকে রাবণবধের খবর দিলেন। রামের নির্দেশে সীতাকে স্নান করিয়ে দামি কাপড়চোপড় আর অলঙ্কারে সাজিয়ে, রাজরানির বেশে রামের সামনে আনা হল।

রাম সবার সামনে সীতাকে বললেন, 'আমি যা করেছি, তা আত্মমর্যাদার কথা ভেবেই করেছি। তোমাকে ফিরে পাওয়ার জন্য নয়। তুমি পরগৃহে এতকাল কাটিয়েছ। তোমার চরিত্রের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে! আমি তোমাকে আবার গ্রহণ করতে অপারগ! ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব বা বিভীষণ—এদের মধ্যে যার সঙ্গে ইচ্ছে, তার সঙ্গেই তুমি থাকতে পারো! রাবণ তোমায় হাতের কাছে পেয়েও ছেড়ে কথা বলেছে—এ আমি বিশ্বাস করি না!'

বিস্মিতা, হতচকিতা, অপমানিতা, ক্ষুব্ধা সীতা, নিজেকে একটু সামলে নিয়ে, রামকে অত্যন্ত রুচিসম্পন্ন ভাষায় যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়ে, লক্ষ্মণকে চিতা সাজাতে বললেন। রামের ইঙ্গিতে লক্ষ্মণ চিতা সাজালে, সীতা শান্তভাবে প্রবেশ করলেন সেই চিতায়। আগুন স্পর্শ করল না অপাপবিদ্ধা সীতাকে। অগ্নিদেব সীতাকে কোলে নিয়ে উঠে এলেন চিতা থেকে। রামের কাছে ফিরিয়ে দিলেন রামের সীতাকে।

রাম অগ্নিদেবকে বললেন, 'সীতার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে আমার নিজের মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু, উপস্থিত সবার মনের সন্দেহ নিরসনের জন্যই এই অভিনয় আমাকে করতে হল।'

শিবকৃপায় দশরথ এসে পুত্র-পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করলেন এই সময়ে। রাম দশরথের কাছে প্রার্থনা করলেন, দশরথ যেন কৈকেয়ী আর ভরতকে ক্ষমা করেন। দশরথ রামের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

ইন্দ্রের বরে রামের হয়ে যুদ্ধ করে যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই আবার

প্রাণ ফিরে পেলেন।

বিভীষণের দেওয়া পুষ্পকে করে লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় ফিরলেন রাম। বিমানে জানালার ধারে সীতাকে কোলে নিয়ে বসলেন রাম। সীতাকে সব দেখাতে দেখাতে এলেন অযোধ্যায়। রামের সঙ্গে অযোধ্যায় এলেন সুগ্রীব, হনুমান, বিভীষণ ইত্যাদি।

ভরদ্বাজের আশ্রমে নেমে হনুমানকে রাম দূত হিসেবে পাঠালেন ভরতের কাছে। ভরতের মন বুঝতে। ভরত সম্বন্ধে তখনও মনে বুঝি একটু সন্দেহ ছিল রামের। সে কথা প্রকাশও করেছেন তাঁর কথায়।

অভিষেকের পরে রাম ভরতকে যুবরাজ করতে চাননি। চেয়েছেন লক্ষ্মণকে যুবরাজের আসনে বসাতে। লক্ষ্মণ তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। অগত্যা! ভরতকেই যুবরাজ করতে হয়েছে।

একদিন। ভদ্র, বিজয়, মধুমত্ত, কাশ্যপ ইত্যাদি বন্ধুদের মুখে সীতার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কানাঘুষোর কথা শুনে সীতাকে ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন রাম। রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ গর্ভবতী সীতাকে রেখে এলেন মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমের কাছে। বাল্মীকি সীতাকে পরম সমাদরে এবং শ্রদ্ধায় গ্রহণ করলেন।

সীতা-বিসর্জনের চারদিন পরেই, রাম নিজেকে সামলে নিয়েছেন। রাজকার্যে মনোযোগী হয়েছেন। মানুষ, পশু, পাখি সকলেই সরাসরি তাঁর কাছে বিচারপ্রার্থী হতে পারতেন। চ্যবন এবং অন্য মুনিরা একদিন এসে লবণাসুরের অত্যাচারের প্রতিকার চাইলেন। রাম শত্রুঘ্নকে পাঠালেন লবণকে বধ করে লবণের রাজ্য অধিকার করতে।

এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একদিন তাঁর চোদ্দো বছর বয়সী মৃতপুত্রকে কোলে করে রামের কাছে এসে বললেন, 'রাজার পাপেই দেশে অকালমৃত্যু ঘটেছে।'

নারদের কথা মতো, রাম পুষ্পকে চড়ে খোঁজ করে দেখলেন, শম্বুক নামে এক শূদ্র-তপস্বী স্বর্গে যাওয়ার জন্য 'হেঁট-মুণ্ড-ঊর্ধ্ব-পদ' হয়ে কঠোর তপস্যা করছে। ত্রেতায় শূদ্রের সে অধিকার ছিল না। রাম কালবিলম্ব না করে, শম্বুকের মাথা কেটে ফেললেন। দেবতাদের বরে ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র প্রাণ ফিরে পেল।

সীতা-বিসর্জনের পর বারো বছর কেটে গেছে। রাজসূয় যজ্ঞ করতে চাইলেন রাম। লোকক্ষয়ের ভয়ে ভরত নিষেধ করলেন। লক্ষ্মণের প্রস্তাবে অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন রাম। সোনার সীতাকে পাশে রাখলেন যজ্ঞভূমিতে।

বাল্মীকির আশ্রমে সীতার দুই যমজ ছেলে হয়েছিল। কুশ আর লব। তারা এতদিনে বড় হয়েছে। বাল্মীকি দুই বালককে রামায়ণ গান শিখিয়েছেন। লব-কুশকে নিয়ে বাল্মীকিও আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন রামের যজ্ঞসভায়। লব-কুশের গান শুনে তো রাম মুগ্ধ! তাদের পরিচয় জানতে চাইলেন বাল্মীকির কাছে। বাল্মীকি জানালেন সেই পরিচয়।

রামের অনুরোধে বাল্মীকি সীতাকে নিয়ে এলেন যজ্ঞসভায়। রামের প্রস্তাব মতো, বিশুদ্ধতার পরীক্ষা দেওয়ার বদলে, সীতা তাঁর গর্ভধারিণী মা ধরিত্রীর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, 'মা! আমি যদি রাম ছাড়া আর অন্য কোনও পুরুষকে মনে স্থান না দিয়ে থাকি, তবে তুমি দ্বিধাবিভক্ত হও! আমি তোমার কোলে ফিরে যাই!' ধরিত্রী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে তাঁর জনমদুখিনী কন্যাকে সাদরে কোলে নিয়ে ফিরে গেছেন

পাতালে।

সীতার বিরহে অধীর হয়েছেন রাম। তাঁর কৌশল্যা প্রমুখ মায়েরাও একে একে গত হয়েছেন। বহু যজ্ঞ করে এবার মর্তলীলা সংবরণ করতে চান রাম। ভাইপোদের বিভিন্ন প্রদেশের রাজা করে দিলেন।

সাধুর বেশে 'কাল' এলেন একদিন। রামকে বললেন, 'যতক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বলব, ততক্ষণ যেন কেউ না আসে এখানে। আসলে, তাকে মরতে হবে।' লক্ষ্মণ পাহারায় রইলেন দরজায়। ঠিক তখনই এলেন 'দুর্বাসা'। বললেন, তক্ষুনি রামকে তাঁর আসার খবর না দিলে তিনি রামসহ গোটা অযোধ্যাই ধ্বংস করবেন। অগত্যা! খবর দিলেন লক্ষ্মণ। শর্ত মতো সরযূর তীরে দেহত্যাগ করতে হল লক্ষ্মণকে। রামের কোনও নিষেধই শুনলেন না রাম-গত-প্রাণ ভাই। সত্যরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করলেন।

লবকে 'উত্তর কোশল' আর কুশকে 'দক্ষিণ কোশলের' রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করে রামও সরযূর জলে নেমে বিষ্ণুদেহে মিশে গেলেন। ভরত-শত্রুঘ্নও সশরীর প্রবেশ করেছেন বিষ্ণুদেহে। লক্ষ্মণ তো আগেই করেছেন।

রামের নির্দেশে ব্রহ্মা অন্যদেরও গন্তব্য 'লোক' নির্দেশ করে দিয়েছেন। ভরত, শত্রুঘ্নসহ অসংখ্য অযোধ্যাবাসী এবং কিষ্কিন্ধ্যাবাসী বানর তাঁর অনুগমন করলেন।

রাম-সীতার বিয়ের সময় রামের বয়স ১২ বছর পূর্ণ হয়ে ১৩ বছর চলছিল। অযোধ্যায় সীতাকে নিয়ে ১২ বছর সুখে কাটাবার পর ২৫ বছর বয়স চলাকালীন রাম বনবাসে গেছেন। ১৪ বছর বনবাসে কাটিয়ে এসে ৩৯ বছর বয়সে রাম অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বসেছেন। এর কিছুদিন পরেই, সীতাকে ত্যাগ করেছেন।

প্রায় ৩০ বছর রাজত্ব করেছেন রাম। যদিও, রামায়ণ মতে, তাঁর রাজত্বকাল ১১,০০০ বছর! ১১০০০ বছরকে ১১০০০ দিন ধরলে, তা ৩০ বছর ১ মাস ২০ দিন হয়। যা আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। আমরা এই হিসেবই গ্রহণ করলাম এখানে।

এই হিসেব মতো রাম নরদেহে ছিলেন ৬৯ বছর ১ মাস ২০ দিন।

রামের চরিত্র একটি অসাধারণ ঋজু চরিত্র। তাঁর সত্যনিষ্ঠা, তাঁর পিতৃসত্যপালনের জন্য মহৎ স্বার্থত্যাগ, মা কৈকেয়ীকে ক্ষমা করা, ভাইদের জন্য প্রাণঢালা ভালবাসা উজাড় করে দেওয়া এবং সর্বোপরি প্রজাদের সন্তুষ্টির জন্য এবং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে একজন আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর প্রাণসমা প্রিয়া স্ত্রী সীতাকে পর্যন্ত ত্যাগ করা, তাঁর অতুলনীয় বীরত্বকেও ছাপিয়ে গেছে। এ কালের রাষ্ট্রনায়ককে স্ত্রীকে ত্যাগ করার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয় না। কিন্তু, সে কালে নিশ্চয়ই এর প্রয়োজন ছিল। এবং সমগ্র ব্যাপারটাকে বিচার করতে হবে সে কালেরই প্রেক্ষাপটে। একালের নয়। যদিও, সীতা-বিসর্জনের কথা আছে উত্তরকাণ্ডে—যা প্রক্ষিপ্ত বলেই পণ্ডিতদের ধারণা।

সীতা-বিসর্জন, বালী-বধ, শম্বুক-বধ ইত্যাদি অনেক কাজের জন্যই, রামকে বহু প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করানো যায়। কিন্তু, রামায়ণের মননশীল পাঠকমাত্রই জানেন, যে, এই সমস্ত প্রশ্নবাণকেই ফিরিয়ে দেওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী বাণ রামের তূণীরে আছে।

শ্রেষ্ঠ মানুষই ভগবান। রাম নিঃসন্দেহে নরশ্রেষ্ঠ। তাঁর চরণে শতকোটি প্রণাম!

আরও তথ্যের জন্য 'সীতা', 'রাবণ', 'লক্ষ্মণ', 'ভরত', ' শত্রুঘ্ন', 'দশরথ', 'হনুমান', 'কৌশল্যা', 'কৈকেয়ী' ইত্যাদি রামের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত চরিত্রগুলো দেখুন।

রাবণ: লঙ্কার রাজা। বিশ্রবা (বিশ্বশ্রবা) এবং নিকষার (কৈকসী) ছেলে। মন্দোদরী, চিত্রাঙ্গদা, ধান্যমালিনী ইত্যাদি অসংখ্য নারীর স্বামী। মেঘনাদ, অক্ষ, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা, বীরবাহু ইত্যাদি অসংখ্য ছেলের বাবা।

ব্রহ্মার মানসপুত্র পুলস্ত্যের ছেলে বিশ্রবা। সে হিসেবে ব্রহ্মার নাতির ছেলে রাবণ। অর্থাৎ প্রপৌত্র। রাবণের সৎ মা দেববর্ণিনীর ছেলে কুবের। অর্থাৎ, কুবের রাবণের সৎ দাদা। নিজের ভাই কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণ। নিজের বোন শূর্পণখা।

দশটা মাথা ছিল বলে নাম 'দশানন' বা 'দশগ্রীব'। লঙ্কার রাজা। তাই নাম 'লঙ্কেশ' বা 'লঙ্কেশ্বর'। পুলস্ত্যের বংশধর সকলেই পৌলস্ত্য। সেই হিসেবে রাবণও 'পৌলস্ত্য'। বিশ্রবার ছেলে। তাই 'বৈশ্রবণ'।

বড় বড় দাঁত, দশটা মাথা, কুড়িটা হাত, বিশাল চওড়া বুক আর বিশাল দেহ ছিল রাবণের। গায়ের রং ছিল নীল মেঘের মতো। সাদা, হলুদ আর রক্তের মতো টুকটুকে লাল পোশাক রাবণকে দারুণ মানাত।

কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে বর চাইলেন রাবণ। বললেন, 'আমি যেন সুপর্ণ (গরুড় এবং সমগোত্রীয় পাখি), নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব আর রাক্ষসদের অবধ্য হই। অন্যদের আমি ভয় পাই না।'

ব্রহ্মা বললেন, 'তথাস্তু। এ ছাড়া, আরও একটা বর দিচ্ছি তোমায়। তুমি যখন যেমন ইচ্ছে, তোমার পছন্দ মতো রূপ ধরতে পারবে।'

শাস্ত্র এবং শস্ত্র, দুই বিদ্যাতেই অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন রাবণ। অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না। কুবেরের থেকে লঙ্কা কেড়ে নিয়েছেন। স্রেফ ভয় দেখিয়ে।

মামা প্রহস্ত, সৎ ভাই মহাপার্শ্ব, ভাইপো নিকুম্ভ ইত্যাদি বীররা ছিলেন রাবণের ডান হাত। দশ হাজার কোটি সৈন্য ছিল রাবণের।

(১৯৯৬-তে পৃথিবীর জনসংখ্যা যা, তার প্রায় ২০ গুণ! ভাবা যায়!)

রাবণের দশ মাথা আর কুড়ি হাতের ব্যাপারে অন্য মত হল, আসলে তাঁর স্বাভাবিক মতো একটা মাথা আর দুটো হাতই ছিল। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য আর দোর্দণ্ডপ্রতাপের তুলনা দিতে গিয়ে, তাঁকে দশ জন জ্ঞানী এবং বীরের সমান বলা হয়েছে।

কুবের দূত পাঠিয়ে ছোট ভাই রাবণকে সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার উপদেশ দিলেন। রাবণ সেই দূতকে কেটে ফেলে তাঁর দেহ রাক্ষসদের খাওয়ার জন্য দিলেন। এরপর, কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধে কুবেরকে হারিয়ে তাঁর পুষ্পক রথ কেড়ে নিলেন।

ফেরার পথে কৈলাসে মহাদেবের সেবক নন্দীকে অপমান করেন। নন্দীর মুখ ছিল বানরের মতো। তাই দেখে রাবণ বিদ্রুপের হাসি হেসেছিলেন। নন্দী অভিশাপ দেন, 'বানরমুখী বানররাই তোমাকে ধ্বংস করবে।'

মহাদেবকে অগ্রাহ্য করতে কৈলাসকে উপড়ে ফেলতে চাইলেন রাবণ। মহাদেব কৈলাসে চাপ দিলেন। পায়ের আঙুল দিয়ে। রাবণের হাত চাপা পড়ল। রাবণের

চিৎকারে ত্রিভুবন কেঁপে উঠল। মহাদেবের স্তব করলেন রাবণ। মহাদেব খুশি হয়ে বললেন, 'তোমার রব-এ (চিৎকারে) ত্রিভুবন রাবিত (শব্দে পূর্ণ) হয়েছে। তাই আজ থেকে তোমার নাম হল 'রাবণ'। এ ছাড়াও, মহাদেব রাবণকে দীর্ঘায়ু হওয়ার বর আর 'চন্দ্রহাস' নামে এক খড়্গ দিলেন।

হিমালয়ে ঘুরতে ঘুরতে রাবণ একবার বৃহস্পতির নাতনি, কুশধ্বজের মেয়ে, রূপসী তপস্বিনী বেদবতীকে দেখে কামার্ত হন। বেদবতী অগ্নিতে আত্মাহুতি দেওয়ার সময় রাবণকে শাসান, 'আমি তোমার ধ্বংসের জন্য আবার জন্মাব।'

পরজন্মে এক পদ্মফুল থেকে জন্ম হল বেদবতীর। সুন্দরী বেদবতীকে রাবণ আবার বাড়ি নিয়ে গেলে, রাবণের এক ভবিষ্যৎ-দর্শী মন্ত্রী বললেন, 'এঁকে ঘরে রাখলে আপনার মৃত্যু অনিবার্য।'

রাবণ বেদবতীকে সাগরে ফেলে দিলেন। সেই বেদবতীই সাগরে ভাসতে ভাসতে এক সময়, যে কোনও ভাবেই হোক, মিথিলায় জনকের লাঙলের ফলার দাগে (সীতায়) এসে শিশুকন্যার রূপ ধরে শুয়ে ছিলেন। সেই শিশুকন্যাই সীতা।

পাতাল জয়ের সময় 'কালকেয়' দৈত্যদের মারতে গিয়ে, ভুল করে শূর্পণখার বর 'বিদ্যুজ্জিহ্ব'কে মেরে ফেলেন রাবণ। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ শূর্পণখাকে দণ্ডকারণ্যে যথেচ্ছভাবে বিচরণের অনুমতি দেন। শূর্পণখার দেখাশোনার জন্য রাবণ সেখানে পাঠিয়ে দেন খর আর দূষণ নামে তাঁর দুই জাঁদরেল, বিশ্বস্ত সেনাপতিকে।

স্বর্গের অপ্সরা রম্ভা যাচ্ছিলেন অভিসারে। নলকুবেরের কাছে। কৈলাসে চাঁদের আলোয় রাবণ তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে রম্ভাকে ভোগ করলেন। নলকুবের রম্ভার মুখে কাকার কীর্তির কথা সব শুনলেন। অভিশাপ দিলেন, 'আজ থেকে কোনও নারীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে রাবণ তাঁকে ভোগ করার চেষ্টা করলেই, রাবণের মাথা সাত টুকরো হবে।'

রাবণের কানে গেল সে কথা। সতর্ক হলেন রাবণ। সীতাকে হরণ করলেও, ভোগ করার দুঃসাহস দেখাননি।

অর্জুনের সঙ্গে (সহস্রবাহু রাজা কার্তবীর্যার্জুনের অন্য নাম ছিল অর্জুন) রাবণের একবার লড়াই হয়। অর্জুন পিটিয়ে ছাতু করে দেন রাবণকে। শেষে, রাবণের দাদু পুলস্ত্যের অনুরোধে, রাবণকে ছেড়ে দেন।

বালীও, রাবণকে একবার বগলে চেপে রেখে তাঁর দর্প চূর্ণ করে দিয়েছিলেন। পরে বালীর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতান রাবণ।

শূর্পণখার অপমানের প্রতিশোধ নিতে রাবণ মারীচকে পাঠিয়েছেন। সীতাকে চোরের মতো সাধুর ছদ্মবেশে চুরি করে এনে অশোক বনে রেখেছেন। পথে জটায়ুর হাতে নাস্তানাবুদ হয়েছেন। সীতাকে বিয়েতে রাজি করাতে অনেক কৌশল করেছেন। রামের মায়ামুণ্ড দেখিয়েছেন। অনেক প্রলোভন দেখিয়েছেন। ইন্দ্রজিতের মায়াবাণে অচেতন রাম-লক্ষ্মণকে দেখতে সীতাকে পাঠিয়েছেন। পুষ্পক বিমানে চড়িয়ে। ইন্দ্রজিতের মৃত্যু হলে, সীতাকে কাটতে এসেছেন।

হনুমান এবং অঙ্গদ তাঁর সভায় এসে তাঁকে যৎপরোনাস্তি অপমান করে গেছেন। বিভীষণ অন্যায় নীতির জন্য তাঁকে ত্যাগ করে রামের পক্ষে যোগ দিয়েছেন। একে একে তাঁর পক্ষের সব বীরেরা নিহত হয়েছেন।

রাবণ প্রথমবার রামের মুখোমুখি হয়ে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন। পরে, লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে অচেতন করেছেন। শেষে রামের ছোড়া ব্রহ্মাস্ত্রে প্রাণ দিয়েছেন। বীরের মতো।

অহঙ্কারের ফল যে অনিবার্যভাবেই পতন, তা রাবণকে দেখলেই বোঝা যায়। তিনি নিঃসন্দেহে মস্ত বীর এবং দুঃসাহসী ছিলেন। জ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু, অহঙ্কারই তাঁকে শেষ করে দিল।

আরও তথ্যের জন্য 'রাম', 'সীতা', 'বেদবতী', 'বিশ্রবা', 'রম্ভা', 'মধু', 'শূর্পণখা', 'মন্দোদরী' এবং 'লঙ্কা' দেখুন।

রুমা: সুগ্রীবের স্ত্রী।

সুগ্রীব বালীর ভয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে আশ্রয় নিলে, বালী রুমাকে বিয়ে করেন। পরে, রামের সাহায্যে রাজ্যের সঙ্গে রুমাকেও ফিরে পান সুগ্রীব।

'বালী' এবং 'সুগ্রীব' দেখুন।

রেণুকা: জমদগ্নির স্ত্রী। বিদর্ভের রাজা প্রসেনজিতের মেয়ে। রুষণ্বান, সুষেন, বসু, বিশ্বাবসু এবং পরশুরামের মা।

নদীতে স্নান করতে গিয়ে, রাজা চিত্ররথ, তাঁর স্ত্রী আর অপ্সরাদের জলকেলি দেখে, কামার্ত হয়ে পড়েন রেণুকা। ধ্যানে সে কথা জানতে পারেন জমদগ্নি। ছেলেদের বলেন, মার মাথা কেটে ফেলতে। প্রথম চার ছেলে রাজি হন না। পরশুরাম বাবার আদেশ পালন করেন। কেটে ফেলেন রেণুকার মাথা।

জমদগ্নি বর দিতে চান পরশুরামকে। পরশুরাম বলেন, 'আমার মা যেন জীবন ফিরে পান। আর মাতৃহত্যার এই পাপ যেন আমাকে স্পর্শ না করে।'

(পরশুরাম কি জানতেন, যে বাবা তাঁকে বর দেবেন?)

জমদগ্নি বললেন, 'তথাস্তু'।

একবার জমদগ্নি তীর ছুড়ে খেলছিলেন। রেণুকা ছোড়া তীরগুলো কুড়িয়ে এনে রাখছিলেন। রোদের তাপে পা আর মাথা তেতে যাওয়ায়, গাছের তলায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন রেণুকা। রেণুকার ফিরতে দেরি হওয়ায়, জমদগ্নি খেপে গেলেন। রেণুকা বললেন সূর্যের তাপের কথা। জমদগ্নি সূর্যকেই তীর মারতে গেলেন। সূর্য ভয়ে ছাতা আর জুতো দিলেন জমদগ্নিকে। সেই থেকেই চালু হল ছাতা আর জুতোর ব্যবহার।

কার্তবীর্যার্জুনের হাতে প্রাণ দিলেন জমদগ্নি। পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করার প্রতিজ্ঞা করলেন। রেণুকা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেলেন।

আরও তথ্যের জন্য 'জমদগ্নি' এবং 'পরশুরাম' দেখুন।

রোহিতাশ্ব: হরিশ্চন্দ্র এবং শৈব্যার ছেলে। 'হরিশ্চন্দ্র' দেখুন।

লক্ষ্মণ: ভগবান বিষ্ণুর অংশ-অবতার। বিষ্ণুর চার ভাগের এক ভাগ শক্তির অধিকারী ছিলেন ইনি।

দশরথ আর সুমিত্রার দুই যমজ ছেলে লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন। বয়সে এঁরা রামের থেকে মাত্র দু'দিনের, আর ভরতের থেকে মাত্র এক দিনের, ছোট।

অসাধারণ সুদর্শন ছিলেন লক্ষ্মণ। কাঁচা সোনার মতো গায়ের রং। সুবিশাল চওড়া

বুক। মাথা ভর্তি কোঁচকানো চুল।

রাম যদি কায়া, লক্ষ্মণ তবে তাঁর ছায়া। ছোটবেলা থেকেই।

বিশ্বামিত্র মুনির আশ্রমে রাক্ষসদের উৎপাত বন্ধ করতে রামের সঙ্গে লক্ষ্মণও গেছেন।

লক্ষ্মণ তাড়কার নাক-কান কেটে দিয়েছেন।

মিথিলায় হরধনু-ভঙ্গের সময় জনকের নিজের মেয়ে ঊর্মিলার সঙ্গে বিয়ে হয় লক্ষ্মণের। ঊর্মিলার গর্ভে দুই ছেলে হয় লক্ষ্মণের। 'অঙ্গদ' আর 'চন্দ্রকেতু'।

কৈকেয়ীর চক্রান্তে রামকে বনে যেতে হবে শুনে ক্ষিপ্ত লক্ষ্মণ রামকে বললেন, 'দাদা! আমি আপনার পাশে আছি। আপনি সিংহাসন অধিকার করুন। যে ভরতের পক্ষ নেবে, তাকেই আমি বধ করব। এমন কী বাবাও যদি ভরতের পক্ষ নেন, তবে তাঁকেও হয় বধ, নয় বন্দি করব।' রাম অনেক বুঝিয়ে লক্ষ্মণকে শান্ত করলেন।

রাম-সীতার সঙ্গে লক্ষ্মণও জটা-বল্কল ধারণ করে চোদ্দো বছর বনবাসে অশেষ কষ্ট ভোগ করেছেন। রাম-সীতাকে সর্বদা আগলে আগলে রেখেছেন লক্ষ্মণ।

সসৈন্য ভরতকে চিত্রকূটে আসতে দেখে, লক্ষ্মণ ভেবেছেন, নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করতেই বুঝি ভরত আসছেন। রামকে হত্যা করতে। লক্ষ্মণ রামকে বলেছেন, 'আজ আমি ভরতকে হত্যা করব। তারপর কৈকেয়ী আর মন্থরাকে বধ করে পৃথিবীকে পাপমুক্ত করব।'

রাম লক্ষ্মণকে নানাভাবে বুঝিয়ে শান্ত করেছেন। নিজের আচরণে লজ্জিত হয়েছেন লক্ষ্মণ।

শূর্পণখা রামের কাছে প্রত্যাখ্যাতা হয়ে লক্ষ্মণকে প্রেম নিবেদন করেছেন। লক্ষ্মণ তাঁর নাক-কান কেটে দিয়েছেন। 'মায়ামৃগ'কে 'মারীচ' বলে চিনতে পেরেছিলেন লক্ষ্মণ।

সীতার বায়না মেটাতে, লক্ষ্মণের ওপর সীতাকে রক্ষা করার ভার দিয়ে, রাম নিজেই মায়ামৃগের পেছনে ছুটেছেন।

মারীচের মায়াকণ্ঠের আর্তনাদে বিভ্রান্ত হয়ে, সীতা রামকে বাঁচাতে লক্ষ্মণকে ছুটে যেতে বলেছেন। দাদাকে বাঁচাতে সীতাকে ছেড়ে যেতে রাজি হননি লক্ষ্মণ। ক্রুদ্ধা সীতা লক্ষ্মণকে সন্দেহ করেছেন। তাঁর চরিত্রকে কটাক্ষ করেছেন সীতা। শেষে, সীতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও রামের সন্ধানে গেছেন লক্ষ্মণ।

(সীতাকে গণ্ডি কেটে তার মধ্যে থাকতে লক্ষ্মণের অনুরোধ করার কথা বাল্মীকি রামায়ণে নেই। আছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে।)

সীতাকে ছেড়ে আসার জন্য রাম তিরস্কার করেছেন লক্ষ্মণকে। লক্ষ্মণ নীরব থেকেছেন। দু' ভাইয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন সীতাকে।

মতঙ্গ মুনির আশ্রমে লক্ষ্মণের রূপে মুগ্ধা রাক্ষসী অয়োমুখী লক্ষ্মণকে জড়িয়ে ধরে বিয়ে করতে চেয়েছেন। লক্ষ্মণ রাক্ষসীর নাক-কান-স্তন কেটে দিয়েছেন।

সুগ্রীব প্রতিশ্রুতি মতো সীতা উদ্ধারের উদ্যোগ না নিলে, রামের আদেশে লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে শানিত ভাষায় ভর্ৎসনা করেছেন। এমন কী সুগ্রীবকে বধ করতেও চেয়েছিলেন।

ইন্দ্রজিতের সর্পবাণে সংজ্ঞাহীন হয়েছেন রাম-লক্ষ্মণ। গরুড় আসতেই, ভয়ে সব

সাপ পালিয়েছে। ইন্দ্রজিতের ছোড়া ব্রহ্মাস্ত্রয় আবার একদিন সংজ্ঞালোপ হল দুই ভাইয়ের। হনুমানের আনা ঔষধির গন্ধে সংজ্ঞা ফিরেছে দু'জনের।

বিভীষণের পরামর্শে, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞে বসার আগেই, ইন্দ্রজিৎকে বধ করেন লক্ষ্মণ। প্রতিশোধ নিতে রাবণ 'শক্তিশেল' ছুড়ে মারলেন লক্ষ্মণের বুকে। মৃতবৎ পড়ে রইলেন লক্ষ্মণ। রাম কাঁদছেন। হনুমানের আনা চার মহৌষধির গন্ধে লক্ষ্মণ আবার উঠে বসলেন।

লঙ্কার যুদ্ধে বীর বিক্রমে লড়াই করেছেন লক্ষ্মণ। বিরূপাক্ষ অতিকায় এবং সর্বোপরি ইন্দ্রজিতের মতো বীররা তাঁর হাতে প্রাণ দিয়েছেন।

সীতা উদ্ধারের পর, রাম স্বয়ং সীতার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুললে সীতার অনুরোধে, এবং রামের অনুমতি তথা সম্মতিক্রমে, লক্ষ্মণ চিতা তৈরি করেছেন।

রাম অযোধ্যায় ফিরে লক্ষ্মণকে যুবরাজ করতে চাইলেও, লক্ষ্মণ তা প্রত্যাখ্যান করে ভরতকে যুবরাজ করতে বলেছেন। লক্ষ্মণের স্বার্থত্যাগের সত্যিই কোনও তুলনা হয় না।

রাম সীতাকে নির্বাসনে পাঠালে, লক্ষ্মণকেই সেই মহা অপ্রিয় কাজটি করতে হয়েছে। দুই ছেলেকে দুই রাজ্যের রাজা করে লক্ষ্মণ রামের পদসেবায় মন দিয়েছেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াকে অনুসরণ করেছেন লক্ষ্মণ।

কালপুরুষের কৌশলে, দুর্বাসা মুনির আগমন বার্তা রামকে জানাতে গিয়ে, পূর্বশর্ত মতো লক্ষ্মণকে প্রাণ দিতে হয়েছে সরযূর তীরে। এর কয়েক দিনের মধ্যেই, বাকি তিন ভাইও লক্ষ্মণের অনুগামী হয়েছেন। দেহ রক্ষার সময় লক্ষ্মণের বয়স হয়েছিল উনসত্তর বছর এক মাসের মতো।

লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তির তুলনা নেই। তাঁর বীরত্ব এবং ব্যক্তিত্বকে ছাপিয়ে গেছে রামের প্রতি তাঁর আনুগত্য। বয়সে ছ'বছরের ছোট সীতাকে মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করতেন লক্ষ্মণ। সীতার চরণ দুটিকেই পুজো করেছেন তিনি চিরকাল। কোনও দিনও মুখের দিকে তাকাননি।

রাম বা সীতার কোনও কটুবাক্যের কোনও প্রতিবাদ করেননি লক্ষ্মণ। যেটুকু বলেছেন, খুব বিনীত ভাবে বলেছেন। লক্ষ্মণের মতো ভাই আর দেওর পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা।

আরও তথ্যের জন্য 'রাম', 'সীতা' এবং 'মেঘনাদ' দেখুন।

লঙ্কা: রাবণের রাজ্য এবং রাজধানী। সোনায় মোড়া বলে অন্য নাম 'স্বর্ণলঙ্কা'। বিশ্বকর্মা নিজে তৈরি করেছিলেন লঙ্কাকে। ত্রিকূট পর্বতের মাথায় অবস্থিত লঙ্কার শোভা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন হনুমান। কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা দেখে হতাশ হয়েছেন। ভেবেছেন, দেবতাদেরও অসাধ্য একে আক্রমণ করা। সামান্য বানররা কী করবে?

লঙ্কার বাড়ি-ঘর-রাস্তা-ঘাট ছিল দেখবার মতো। দরজাগুলো ছিল সোনা দিয়ে মোড়া। পথে পথে এত আলো ছিল, যে, রাতে মনে হত জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে পথ-ঘাট।

লঙ্কা দৈর্ঘ্যে একশো যোজন (৮০০ মাইল) আর প্রস্থে তিরিশ যোজন (২৪০ মাইল) ছিল।

আরও তথ্যের জন্য 'রাবণ', 'হনুমান' এবং 'রাম' দেখুন।

লব-কুশ: রাম-সীতার দুই যমজ ছেলে।

নির্বাসিতা সীতা মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে দুই যমজ ছেলে লব আর কুশের জন্ম দেন। বাল্মীকির স্নেহে এবং শিক্ষায় লব-কুশ সর্বশাস্ত্রে অসামান্য পারদর্শী হয়ে ওঠেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে বাল্মীকির সঙ্গে এঁরাও আসেন। বাল্মীকির শেখানো রামায়ণ গান শুনিয়ে এঁরা সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করে দেন।

রাম নিজের দুই যমজ ছেলেকে চিনতে পেরে বুকে জড়িয়ে ধরেন। সীতাকে আনান। কিন্তু আবার চরিত্রের বিশুদ্ধতার প্রমাণ দিতে বলায়, সীতা মা ধরিত্রীর কোলে ফিরে যান।

রাম কুশকে 'দক্ষিণ কোশল' আর লবকে 'উত্তর কোশল'-এর রাজা করেন। কুশের জন্য 'কুশাবতী' আর লবের জন্য 'শ্রাবস্তী' নগরী তৈরি করান রাম।

কুশের স্ত্রী কুমুদ্বতী। ছেলে অতিথি।

আরও তথ্যের জন্য 'রাম', 'সীতা' এবং 'বাল্মীকি' দেখুন।

লবণাসুর: রাবণের ভাগ্নে। মা কুম্ভীনসী। বাবা মধু। ঠাকুরদা লোলা।

মধুকে মহাদেব এক শূল দিয়েছিলেন। এই শূল দিয়ে শককে ভস্ম করা যাবে। তবে দেবতা আর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করলে শূল, ফিরে যাবে মহাদেবের কাছে। মহাদেবের বরে, মধুর ছেলে লবণও এই শূলের অধিকারী হলেন। বাবা মারা যাওয়ার পরে।

শূলবলে বলীয়ান লবণ ঋষিদের ওপর শুরু করলেন অকথ্য অত্যাচার। চ্যবন এবং আরও অনেক ঋষি রামের শরণাপন্ন হলেন। রাম বিষ্ণুর তৈরি বিষ্ণুশর আর আরও অনেক বাণ দিয়ে পাঠালেন শত্রুঘ্নকে। শত্রুঘ্নের অতর্কিত আক্রমণের সময়, সঙ্গে শূল না থাকায়, মধুবনে শত্রুঘ্নের হাতে প্রাণ দিতে হল লবণকে।

আরও তথ্যের জন্য 'কুম্ভীনসী', 'মধু' এবং 'শত্রুঘ্ন' দেখুন।

লোমপাদ: দশরথের বন্ধু। অঙ্গরাজ।

দশরথের একমাত্র মেয়ে শান্তাকে ইনি দশরথের কাছ থেকে নিয়ে নিজের মেয়ের মতো করে পালন করেন। পরে মহাধুমধাম করে তাঁর বিয়ে দেন ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে।

আরও তথ্যের জন্য 'ঋষ্যশৃঙ্গ' দেখুন।

লোলা: এক দৈত্যরাজ। মধুর বাবা। লবণের ঠাকুরদাদা।

শক্তিশেল: বজ্রের মতো শক্তি সম্পন্ন আটটা ঘণ্টা লাগানো এক সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র। রক্ত শুষে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল শক্তিশেলের। ময়দানবের তৈরি। রাবণ এই অস্ত্রেই চেতনা লোপ করেছিলেন লক্ষ্মণের। হনুমানের আনা চার মহৌষধির গন্ধে জ্ঞান ফিরে পান লক্ষ্মণ।

'লক্ষ্মণ' 'হনুমান' 'রাবণ' এবং 'রাম' দেখুন।

শতহ্রদা: রাক্ষস বিরাধের মা। যবের স্ত্রী।

শতানন্দ: জনকের কুলপুরোহিত। গৌতম এবং অহল্যার ছেলে।

একবার গৌতমের অনুপস্থিতির সুযোগে ইন্দ্র গৌতমের বেশ ধরে এসে অহল্যাকে

ভোগ করেন। অহল্যা ইন্দ্রকে চিনতে পেরেও বাধা দেননি।

গৌতম ফিরে এসে সব জানতে পেরে শতানন্দকে মাতৃহত্যা করার আদেশ দিয়ে তপস্যায় চলে যান। শতানন্দ কিন্তু পরশুরামের মতো বাবার আদেশে মার মাথা কাটেননি।

গৌতমের শাপে হাজার বছর পাষাণী হয়ে থাকেন অহল্যা। পরে রামের স্পর্শে তাঁর শাপমুক্তি হলে গৌতম আবার তাঁকে গ্রহণ করেন। তাঁর রাগের মাথায় দেওয়া আদেশ পালন না করার জন্য শতানন্দকে আশীর্বাদ করেন।

আরও তথ্যের জন্য 'অহল্যা' দেখুন।

শত্রুঘ্ন: ভগবান বিষ্ণুর অংশ-অবতার। বিষ্ণুর চার ভাগের এক ভাগ ছিল এঁর মধ্যে।

দশরথের ছোট ছেলে। সুমিত্রার গর্ভজাত। লক্ষ্মণের সহোদর এবং যমজ ভাই।

লক্ষ্মণ যেমন রামের, শত্রুঘ্নও তেমনি ভরতের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন।

রামের বনে যাওয়ার সময় ভরত মামার বাড়িতে ছিলেন। শত্রুঘ্নও ভরতের ছায়ার মতো তাঁর সঙ্গে দাদার মামার বাড়িতে গিয়ে বারো বছর থেকে এলেন।

ভরতের মামার বাড়ি থেকে দুই ভাই অযোধ্যায় ফিরে এসে যখন সব শুনলেন, রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন শত্রুঘ্ন। ভরত বাধা না দিলে মন্থরাকে মেরেই ফেলতেন। কৈকেয়ীর শ্রাদ্ধ করে ছাড়লেন। লক্ষ্মণকেও এক হাত নিলেন। বললেন, 'লক্ষ্মণ কী করছিল? সে তো মস্ত বীর! সে কেন মতিভ্রষ্ট বাবাকে নিগৃহীত করে দাদাকে ফেরাল না?'

রামকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে ভরত বলেছেন, রাম অযোধ্যায় ফিরে গেলে তিনি শত্রুঘ্নকে নিয়ে চোদ্দো বছর বনবাসে থাকবেন। শত্রুঘ্নের প্রতি তাঁর ভালবাসাই এতে ফুটিয়ে তুলেছেন ভরত।

লবণাসুরকে বধ করেছেন শত্রুঘ্ন। শত্রুঘ্নের অতর্কিত আক্রমণে শিবশূলকে কাজে লাগাতে পারেননি লবণ। রামের আদেশে শত্রুঘ্নকে লবণের রাজ্যের রাজ-সিংহাসনে বসতে হয়েছে। অত্যন্ত অনিচ্ছায়, কিন্তু সম্ভ্রমের সঙ্গে, তিনি সে আদেশ মাথা পেতে নিয়েছেন।

লবণবধের জন্য লবণের রাজ্য মধুবনে যাওয়ার পথে, মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে সসৈন্য আশ্রয় নিলেন শত্রুঘ্ন। সেই রাতেই লব-কুশের জন্ম দিলেন সীতা। খবর পেয়ে ছুটে গেলেন শত্রুঘ্ন। দেখলেন লব-কুশকে। দেখলেন তাঁর মাতৃস্থানীয়া সীতাকে। কিন্তু রামের আদর্শকে মান্য করতে সে খবর গোপন রাখলেন।

মধুবনের রাজধানী 'মধুরা'তে বারো বছর কাটিয়ে, রামকে দেখার জন্য অযোধ্যায় ছুটে এলেন শত্রুঘ্ন। পথে বাল্মীকির আশ্রমে রামায়ণ গান শুনে মুগ্ধ হলেন। কিন্তু রামের আদেশে, সে যাত্রায় মাত্র সাত দিন থেকেই, আবার মধুরাতে ফিরে যেতে হয়েছে শত্রুঘ্নকে।

শত্রুঘ্ন বিয়ে করেছিলেন সীতার খুড়তুতো বোন (কুশধ্বজের মেয়ে) শ্রুতকীর্তিকে। দুই ছেলে সুবাহু আর শত্রুঘাতীর মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দিয়ে, অযোধ্যায় এসে রামের সঙ্গে একসঙ্গে সরযূর জলে নেমে ভবলীলা সাঙ্গ করেছেন শত্রুঘ্ন। রামের মতোই, সশরীর স্বর্গে গেছেন।

শত্রুঘ্ন রামায়ণে যেন একটু আড়ালে পড়ে গেছেন। অথচ, তিনিও ছিলেন বিষ্ণুর অংশ-অবতার। বিষ্ণুর চার ভাগের এক ভাগ ছিল তাঁর মধ্যে।

বিদ্যা, বুদ্ধি বা বীরত্ব কোনওটাই কম ছিল না শত্রুঘ্নর। সীতা এবং লব-কুশকে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে দেখেও, রামের বিরক্তির ভয়ে, সে কথা তিনি কাউকেই বলেননি। অসামান্য ছিল তাঁর সংযম। অসামান্য ছিল তাঁর রাম আর ভরতের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা আর আনুগত্য।

আরও তথ্যের জন্য 'রাম' এবং 'লবণাসুর' দেখুন।

শবরী: রামগতপ্রাণা ব্রহ্মচারিণী। পম্পা সরোবরের তীরে মতঙ্গ ঋষির আশ্রমে মুনিদের পরিচারিকা ছিলেন।

'রামের দর্শন পেলে দিব্যলোকে যেতে পারবেন', মুনিদের কাছ থেকে এ আশ্বাস পেয়ে, শবরী রামের প্রতীক্ষায় দিন গুনতে লাগলেন। কবে রাম আসেন! রামের জন্য রোজ বন থেকে ফুল তুলে আনতেন। কিন্তু কোথায় রাম?

শেষে, সীতার খোঁজে একদিন সত্যিই রাম এসে উপস্থিত হলেন মতঙ্গ-আশ্রমে। রামের চরণে সাষ্টাঙ্গ হলেন শবরী। 'শবরীর প্রতীক্ষা' শেষ হল। রামের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে তিনি আগুনে আত্মাহুতি দিলেন।

আরও তথ্যের জন্য 'রাম' দেখুন।

শম্বুক: রামের সমসাময়িক এক শূদ্র-তপস্বী।

রাম রাজা হয়েছেন। একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর কিশোর ছেলের মৃতদেহ কোলে করে কাঁদতে কাঁদতে এলেন রামের রাজসভায়। বললেন, 'হে রাম! আমি কখনও মিথ্যে বলিনি। কারও প্রতি হিংসা দেখাইনি। কোনও পাপ করিনি। তবে কেন আমার কপালে এই পুত্রশোক এসে জুটল?'

ব্রাহ্মণ বলে চললেন, 'নিশ্চয়ই রাজার কোনও পাপে আমাকে পুত্রহারা হতে হয়েছে। নইলে অন্য কেউ এই রাজ্যে পাপ কাজ করছে। কিন্তু রাজা তাঁকে শাসন করছেন না। তাই এমন হচ্ছে। কই অন্য কোনও রাজ্যে তো এমন অকালমৃত্যু হয় না?

'হে রাম! আপনি যদি আমার ছেলের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে না পারেন, তবে আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে এই রাজবাড়ির দ্বারেই আত্মহত্যা করব। আর তার ফল ভোগ করতে হবে আপনাকে। ব্রহ্মহত্যার পাপের ভাগী হয়ে আপনি ভাইদের নিয়ে সুখে থাকুন।'

নারদ রামকে বললেন, 'মহারাজ! এ যুগে শূদ্রের তপস্যা নিষিদ্ধ। নিশ্চয়ই কোনও শূদ্র তপস্যা করছে। সেই পাপেই এই অঘটন।'

রামের আদেশে, লক্ষ্মণ সেই হতভাগ্য ছেলেটির মৃতদেহ ডুবিয়ে রাখলেন তেলে। যাতে নষ্ট না হয়।

রাম নিজেই পুষ্পক রথ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শূদ্র-তপস্বীর খোঁজে। অনেক অনুসন্ধানের পর শৈবাল পর্বতের ওপরে এক সরোবরের তীরে দেখতে পেলেন এক তপস্বীকে। 'হেঁটমুণ্ড-ঊর্ধ্বপদ' হয়ে তপস্যা করছেন।

'তুমি এমন কঠোর তপস্যা করছ কেন? তোমার জাতিই বা কী?' রাম জানতে চাইলেন।

তপস্বী বললেন, 'সশরীর স্বর্গে গিয়ে দেবলোক জয় করব বলে এই তপস্যা করছি। আমার নাম শম্বুক। মিথ্যে বলব না। আমি শূদ্র।'

রাম কালবিলম্ব না করে শম্বুকের মাথা কাটলেন। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করে বর দিতে চাইলেন রামকে।

রাম বললেন, 'সেই ব্রাহ্মণ বালকটিকে বাঁচিয়ে দিন।'

ইন্দ্র বললেন, 'সে বেঁচে উঠে তার নিজের লোকের কাছে ফিরে গেছে।'

এরপর দেবতারা রামকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন অগস্ত্যের আশ্রমে। অগস্ত্য শম্বুকবধের জন্য রামকে অনেক উপহার দিলেন।

আরও তথ্যের জন্য 'রাম' দেখুন।

শরভঙ্গ: দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষি।

রাক্ষস 'বিরাধের' পরামর্শ মতো রাম-লক্ষ্মণ-সীতা শরভঙ্গের আশ্রমে আসেন। এখানে তাঁরা এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখে বিস্মিত হন। আকাশে ভাসমান এক রথ (বিমান?) থেকে এক দিব্যপুরুষ শরভঙ্গের সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁরা কাছে যেতেই, রথ শূন্যে মিলিয়ে যায়।

কৌতূহলী রামকে শরভঙ্গ বলেন, 'ইন্দ্র এসেছিলেন। উগ্র তপস্যায় আমি ব্রহ্মলোক অধিকার করেছি। তাই আমাকে সেখানে নিয়ে যেতেই ইন্দ্রের আর্বিভাব। আমি ব্রহ্মলোকেই চলে যেতাম। শুধু তোমাকে দেখব বলে এখানে বসে আছি।'

শরভঙ্গ রামকে বাসোপযোগী জায়গা নির্বাচনের জন্য সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রমে যেতে পরামর্শ দেন। তারপর পবিত্র আগুনে প্রবেশ করে ব্রহ্মলোকে যান।

আরও তথ্যের জন্য ' রাম' দেখুন।

শান্তা: রামের দিদি। দশরথের মেয়ে। দশরথ তাঁর বন্ধু লোমপাদকে এঁর পালনভার দেন। 'কশ্যপ' মুনির নাতি এবং 'বিভাণ্ডক' মুনির ছেলে 'ঋষ্যশৃঙ্গের' সঙ্গে এঁর বিয়ে দেন এঁর পালক পিতা লোমপাদ।

আরও তথ্যের জন্য 'দশরথ' এবং 'ঋষ্যশৃঙ্গ' দেখুন।

শুক: রাবণের এক মন্ত্রী।

রাবণ এঁকে দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন সুগ্রীবের কাছে।

শুক এক 'শুক পাখির' রূপ ধরে গেলেন সুগ্রীবের কাছে। শুক সুগ্রীবকে রাবণের বার্তা জানালেন। বললেন, 'হে সুগ্রীব! আপনি একজন মহাবীর! রাবণের ভাইয়ের মতো। রাবণ যদি সীতাকে হরণ করেই থাকেন, তাতে আপনার কী? এ যুদ্ধে আপনার তো কোনও লাভ বা লোকসান কিছুই হচ্ছে না। কাজেই, আপনি বরং কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে যান। লঙ্কেশ্বর রাবণের এই অনুরোধ আপনার কাছে।'

বানররা শুকের কথায় উত্তেজিত হয়ে তাঁকে বেদম প্রহার করল। রাম শুককে ছেড়ে দিতে বললেন। বানররা প্রথমে ছেড়ে দিয়ে, পরে চর সন্দেহে আকাশ থেকে তাঁকে টেনে নামিয়ে আবার মারতে লাগল।

শুক বললেন, 'হে রাম! দূত অবধ্য। এরা যদি আমায় বধ করে, তবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমি যত পাপ করেছি, সব পাপের ভার তোমাকেই নিতে হবে।'

শুকের এ কথায় কাজ হল। রামের অনুরোধে বানররা শুককে ছেড়ে দিল।
আরও তথ্যের জন্য 'রাম' দেখুন।

শুকদেব: ব্যাসদেব-ঘৃতাচীর ছেলে।
কামজিৎ। আকুমার ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মজ্ঞানী।
অপ্সরা 'ঘৃতাচী'-কে দেখে কামার্ত ব্যাসদেবের বীর্যপাত হয়। ভীতা ঘৃতাচী শুক পাখির রূপ ধরে পালিয়ে যান। যে যজ্ঞ-কাঠে বীর্যপতন হয়েছিল, সেই কাঠকে প্রবলভাবে ঘষতে থাকেন ব্যাসদেব। জ্বলে ওঠে আগুন। তার শিখা থেকে দেবদ্যুতি নিয়ে বেরিয়ে আসেন শুকদেব। মা শুকপাখির রূপ ধরেছিলেন বলে তাঁর নাম হল 'শুক'। শুকই পরিক্ষিৎকে ভাগবত শোনান।
আরও তথ্যের জন্য 'ঘৃতাচী' দেখুন।

শুনঃশেফ (শুনঃশেপ): একজন মুনিকুমার।
ঋচীক এবং সত্যবতীর ছেলে। ভৃগুর নাতি। গাধির দৌহিত্র। জমদগ্নি এবং শুনঃপুচ্ছের ভাই। পরশুরামের কাকা। বিশ্বামিত্রর ভাগ্নে।
অযোধ্যার রাজা অম্বরীষের যজ্ঞের পশু চুরি করে নিয়ে পালালেন ইন্দ্র। পুরোহিত বললেন, 'মহাপাপ! সুতরাং, নরবলি দিতে হবে।'
ঋচীকের মেজ ছেলে শুনঃশেফকে অনেক দাম দিয়ে কিনে নিলেন অম্বরীষ। অম্বরীষের সঙ্গে যাওয়ার সময়, পথে মামা বিশ্বামিত্রকে দেখতে পেয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন শুনঃশেফ।
বিশ্বামিত্র নিজের ছেলেদের প্রত্যেককে ডেকে বললেন, যজ্ঞে নিজেকে বলির জন্য উৎসর্গ করে শুনঃশেফকে বাঁচাতে। ছেলেরা কেউই রাজি হলেন না।
তাঁরা বললেন, 'নিজের ছেলেদের প্রাণের বিনিময়ে আপনি অন্যের ছেলেকে বাঁচাতে চান? এ তো জঘন্য কাজ! কুকুরের মাংস খাওয়ার মতোই খারাপ কাজ!'
বিশ্বামিত্র শাপ দিলেন। 'তোরা হাজার বছর কুকুরের মাংস খেয়ে বেঁচে থাক।'
বিশ্বামিত্র তখন ভাগ্নেকে বলির আগে অগ্নির স্তব করার পরামর্শ দিলেন। দুটি স্তব শিখিয়েও দিলেন। শুনঃশেফ স্তব করে অগ্নি, ইন্দ্র আর বিষ্ণুকে খুশি করে, বলির হাত থেকে বাঁচলেন। এবং দীর্ঘজীবনের বর পেলেন। অম্বরীষও ইন্দ্রের আশীর্বাদে যজ্ঞ শেষ করলেন।
রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে বিশ্বামিত্র মিথিলায় এসে পৌঁছলে, জনকের পুরোহিত শতানন্দ রামকে এই উপাখ্যান শুনিয়েছিলেন।
ঐতরেয় এবং কৌষীতকি ব্রাহ্মণে শুনঃশেফের উপাখ্যান অন্য রকম ভাবে দেওয়া আছে।

শূর্পণখা: রাবণ আর কুম্ভকর্ণের ছোট বোন। বিভীষণের দিদি। কুবেরের সৎ বোন। বাবা বিশ্রবা। মা কৈকসী। রাক্ষসরাজ বিদ্যুজ্জিহ্বের স্ত্রী।
কালকেয়দের বধ করার সময়, রাবণের ভুলে তাঁর নিজের হাতেই বিদ্যুজ্জিহ্ব মারা যান। বিধবা বোনকে রাবণ দণ্ডকারণ্যে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করার অনুমতি দেন।
বনবাসের সময় ছদ্মবেশে রাম আর লক্ষ্মণকে বিয়ে করতে চান শূর্পণখা। দু'ভাই-ই

তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। শূর্পণখা প্রচণ্ড রেগে গিয়ে সীতাকে খেতে যান। লক্ষ্মণ তখন খড়্গ দিয়ে শূর্পণখার নাক-কান কেটে দেন।

'খর' আর 'দূষণ' ছিলেন শূর্পণখার পাহারায়। তাঁরা যুদ্ধ করতে গিয়ে রামের হাতে প্রাণ দিলেন। শূর্পণখা তখন কাঁদতে কাঁদতে সোজা দাদা রাবণের কাছে গেলেন। আর রাবণকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, সীতাকে হরণ করে এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।

'শূর্প' অর্থাৎ 'কুলোর মতো' নখের অধিকারিণী ছিলেন। তাই 'শূর্পণখা' নাম।

আরও তথ্যের জন্য 'রাম' এবং 'রাবণ' দেখুন।

শৃঙ্গবেরপুর: নিষাদরাজ গুহর দেশ। গঙ্গার তীরে। এখনকার মির্জাপুরের কাছাকাছি।

বনবাসে যাওয়ার পথে রাম এখানে এক রাত বাস করেন। এখান থেকেই সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়ে গুহর নৌকায় করে গঙ্গা পার হন রাম।

আরও তথ্যের জন্য 'রাম' এবং 'গুহ (গুহক/গুহকমিতা)' দেখুন।

শোণিতাক্ষ: রাবণের অনুচর। যুদ্ধে অঙ্গদের মামা দ্বিবিদের হাতে প্রাণ দেন।

শৈলূষ: গান্ধারের গন্ধর্ব রাজা।

বিভীষণের শ্বশুর। সরমার বাবা।

শৈব্যা:রাজা হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী। রোহিতাশ্বের মা। 'হরিশচন্দ্র' দেখুন।

শ্রী: দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষস কবন্ধের বাবা।

শ্রুতকীর্তি: শত্রুঘ্নের স্ত্রী। জনকের ছোট ভাই কুশধ্বজের মেয়ে। এঁর গর্ভে শত্রুঘ্নের সুবাহু আর শত্রুঘাতী নামে দুই ছেলে হয়। রামায়ণে বড়ই উপেক্ষিতা চরিত্র।

'শত্রুঘ্ন' এবং 'রাম' দেখুন।

শ্যেনী: জটায়ু এবং সম্পাতির মা। অরুণের স্ত্রী। কশ্যপ এবং বিনতার পুত্রবধূ।

সংহ্লাদ: রাবণের এক সেনাপতি। লঙ্কার যুদ্ধে নিহত।

সগর: ইক্ষ্বাকু বংশের বিখ্যাত রাজা।

বাহু এবং যাদবীর ছেলে। বিদর্ভরাজার মেয়ে কেশিনী এবং কশ্যপের মেয়ে সুমতির স্বামী। কেশিনীর গর্ভজাত ছেলে অসমঞ্জ এবং সুমতির গর্ভজাত ষাট হাজার ছেলের বাবা। রামের সপ্তম পূর্বপুরুষ।

আরও তথ্যের জন্য 'ভগীরথ', 'সুমতি' এবং 'গঙ্গার মর্তে অবতরণ' দেখুন।

সন্ধ্যা: লঙ্কার এক রাক্ষসী। সালকটঙ্কটার মা। বিদ্যুৎকেশের শাশুড়ি।

সম্পাতি: বিষ্ণুর বাহন গরুড়। গরুড়ের ভাই অরুণ। অরুণের ছেলে সম্পাতি। মা শ্যেনী। জটায়ুর দাদা। সুপার্শ্বের বাবা। দশরথের বন্ধু।

জটায়ু আর সম্পাতি দুই ভাই মিলে ইন্দ্রকে জয় করার উদ্দেশ্যে আকাশে যাত্রা করেন। সূর্যের খরতাপে নিস্তেজ হয়ে পড়েন জটায়ু। দাদা সম্পাতি ভাইয়ের কষ্ট

দেখে, তাঁর ডানা মেলে ছায়ায় ঢেকে রাখেন ভাইকে। সূর্যের তাপে ডানা পুড়ে যায় সম্পাতির। পড়ে যান তিনি। বাস করতে থাকেন বিন্ধ্য পর্বতে। 'চিরজীবী' বলে প্রাণে বেঁচে যান।

উগ্রতপা নামে এক ঋষি তাঁকে আশ্বাস দেন, 'আবার তোমার ডানা গজাবে।'

ছেলে সুপার্শ্ব সম্পাতিকে রোজ খাবার এনে দিতেন। তাঁর কাছেই সম্পাতি শোনেন সীতাহরণ আর ভাই জটায়ুর মৃত্যুর কথা। সমুদ্র-জলে তর্পণ করেন ভাইয়ের।

অঙ্গদ সম্পাতির কাছেই খবর পান, যে, সীতা লঙ্কায় আছেন। সম্পাতি বানরদের সাগর-লঙ্ঘনের পরামর্শ দেন। সীতার সন্ধান দেওয়ার মতো সৎকর্ম করার পুরস্কারস্বরূপ, ঋষি-বাক্য মতো, সম্পাতি ফিরে পান তাঁর হারানো ডানা জোড়া।

আরও তথ্যের জন্য 'সুপার্শ্ব' এবং 'জটায়ু' দেখুন।

সরমা: গন্ধর্বরাজ শৈলূষের মেয়ে। বিভীষণের স্ত্রী। তরণীসেনের মা।

রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্ব সীতাকে রামের মায়ামুণ্ড এনে দেখালে, সরমাই সীতাকে রামের কুশল সংবাদ দিয়ে আশ্বস্ত করেন। সরমা সীতার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন।

আরও তথ্যের জন্য 'সীতা' দেখুন।

সরযূ: পুণ্যসলিলা পৌরাণিক নদী।

'সর' অর্থাৎ 'মানস সরোবর' থেকে এর উৎপত্তি বলে এই নাম।

এই পুণ্যসলিলা সরযূর তীরেই অযোধ্যা। প্রথমে লক্ষ্মণ সরযূর তীরে এবং পরে রাম, ভরত আর শত্রুঘ্ন এই সরযূর জলেই ভবলীলা সাঙ্গ করে স্বর্গারোহণ করেন।

সর্বার্থসিদ্ধ: রামের এক ব্রাহ্মণ প্রজা।

একদিন। দরজায় কোনও বিচারপ্রার্থী নেই শুনে রাম খুশি হলেন। ভাবলেন, তাঁর রাজত্বে কোথাও কোনও অধর্মাচরণ নেই। তাই কোনও বিচারপ্রার্থীও নেই।

রাম লক্ষ্মণকে বললেন, 'তবু আর একবার দেখে এসো তুমি, কেউ বিচারপ্রার্থী হয়ে এলেন কিনা।'

লক্ষ্মণ এবার গিয়ে দেখেন, এক কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। দরজায়।

লক্ষ্মণ কুকুরকে বললেন, 'তোমার যদি কিছু বলার থাকে, তো ভেতরে গিয়ে মহারাজকে বলো।'

কুকুর বলল, 'দেবতার মন্দিরে, রাজার প্রাসাদে আর ব্রাহ্মণের ঘরে অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য, আর বায়ু থাকেন। সব প্রার্থীদের মধ্যে অধম কুকুরের সেখানে প্রবেশের অধিকার নেই।'

লক্ষ্মণ রামকে জানালেন সব। রামের আদেশে কুকুরকে নিয়ে আসা হল রাজসভায়।

কুকুরের মাথায় ঘা ছিল। সে বলল, 'মহারাজ! সর্বার্থসিদ্ধ নামে এক ব্রাহ্মণ অকারণে আমায় পিটিয়েছেন।'

রামের আদেশে আনানো হল সর্বার্থসিদ্ধকে।

সর্বার্থসিদ্ধ বললেন, 'মহারাজ! আমি ভিক্ষে করে খাই। এ কুকুর আমার রাস্তা আগলে শুয়েছিল। কত বললাম, সরো, সরো। তা সরল না। তাই আমি একে

মেরেছি। দয়া করে আমায় শাস্তি দিন মহারাজ! তা হলে আর আমাকে নরকে যেতে হবে না।'

(রাম-রাজ্যে ভিক্ষুক ছিল না। এটা মাধুকরী। বৈরাগ্যজাত।)

সভার ব্রাহ্মণরা রামকে বললেন, 'ব্রাহ্মণকে শাস্তি দেওয়া যায় না।'

কুকুর বলল, 'মহারাজ! যদি আমাকে খুশি করতে চান, তা হলে এঁকে 'কালঞ্জরের কুলপতি' করে দিন।'

বিস্মিত রাম তাই করলেন। সর্বার্থসিদ্ধও মহা খুশি হয়ে কালঞ্জরে চলে গেলেন।

রাম তখন কুকুরের এই বিচিত্র প্রার্থনার রহস্য জানতে চাইলেন।

কুকুর বলল, 'মহারাজ! আমিও এক সময় "কালঞ্জরের কুলপতি" ছিলাম। দেবতা আর ব্রাহ্মণদের খুব সেবা করেছি। মনপ্রাণ দিয়ে। কিন্তু, কুলপতির পদ পেয়ে মনে বোধ হয় খুব অহঙ্কার জন্মেছিল। তাই আজ আমার এই দশা।

'ওই ব্রাহ্মণের উনপঞ্চাশ পুরুষ নরকে যাবে। কাউকে সবান্ধব নরকে পাঠাবার সবচেয়ে সহজ রাস্তা হচ্ছে, তাকে দেবতা, ব্রাহ্মণ আর গো-সেবার ভার দিয়ে "কালঞ্জরের কুলপতি" করে দেওয়া।"

এই বলে কুকুর কাশীতে চলে গেল।

(কালঞ্জরের কুলপতি=দশ হাজার মুনিকে অন্ন এবং বিদ্যা দান করেন যে বিপ্রর্ষি। অথবা, বর্তমান বান্দা জেলার 'কালিঞ্জর' নামক পার্বত্য নগরের শাসক)।

সারণ: রাবণের মন্ত্রী।

শুকের সঙ্গে এঁকেও রাবণ পাঠান লঙ্কায় আসা রাম-লক্ষ্মণ আর তাঁদের বানর সেনার খবর সংগ্রহ করতে।

সালকটঙ্কটা: রাবণের মাতৃকুলের এক রাক্ষসী। রাক্ষসী সন্ধ্যার মেয়ে। বিদ্যুৎকেশের স্ত্রী। ব্রহ্মার নাত-বৌ। যমের বোন ভয়া আর ব্রহ্মার ছেলে হেতির পুত্রবধূ। সুকেশের মা। মাল্যবান, সুমালী আর মালীর ঠাকুরমা।

গর্ভবতী হওয়ার পর মন্দর পর্বতে গর্ভমোচন করে স্বামীর কাছে ফিরে যান সালকটঙ্কটা। সদ্যোজাত শিশু সুকেশের কান্না শুনে থমকে দাঁড়ালেন হর-পার্বতী। তাঁরা ষাঁড়ের পিঠে চেপে আকাশপথে যাচ্ছিলেন।

পার্বতী সেই শিশুর কান্না সহ্য করতে না পেরে, শিবকে বললেন, 'প্রভু! এর কান্না আমি আর সইতে পারছি না। আপনি দয়া করে একে এক্ষুনি এর মায়ের সমবয়স্ক করে দিন। আর একে অমর করে দিন। আর একে আকাশে ওড়ার শক্তি দিন।'

পার্বতীকে খুশি করতে শিব বললেন, 'তথাস্তু! তাই হোক পার্বতী!'

'কিন্তু, অন্য রাক্ষসীরাও যদি এইভাবে সদ্যোজাত শিশুকে পরিত্যাগ করে? সেই শিশুদের তবে কী হবে?'

পার্বতী তাই নিজেই এবার বর দিলেন, 'এখন থেকে প্রতিটি রাক্ষস-শিশু জন্মেই তার মার সমবয়স্ক হয়ে যাবে।'

'সুকেশ' দেখুন।

সিংহিকা: এক সাগর-রাক্ষসী।

কামরূপিণী রাক্ষসী সিংহিকার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। ছায়ার সাহায্যে কায়াকে আকর্ষণ করতে পারতেন ইনি।

হনুমান যখন সীতার খোঁজে সাগর লঙ্ঘন করছিলেন, তখন সাগরের ওপর পড়া হনুমানের ছায়া ধরে টান মারেন সিংহিকা।

আচমকা গতিরোধ হওয়ায়, ঘাবড়ে গেলেন হনুমান। এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। কোথাও কাউকে দেখতে পেলেন না। শেষে, তাঁর নজরে এল, সমুদ্র থেকে এক বিকট চেহারার রাক্ষসী উঠে আসছেন। হনুমান বুঝলেন, এ-ই তবে সিংহিকা, যাঁর কথা সুগ্রীব বলেছিলেন।

হনুমান বর্ষার মেঘের মতো নিজের দেহকে বিশাল করলেন। সিংহিকাও আকাশ-পাতাল জুড়ে হাঁ করলেন। ক্ষুরধার বুদ্ধিতে হনুমান তৎক্ষণাৎ নিজের দেহকে একেবারে ছোট করে সিংহিকার মুখে ঢুকে পড়লেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই, নখের আঁচড়ে তাঁর বুক ফাটিয়ে বেরিয়ে এলেন সিংহিকার দেহ থেকে। সিংহিকার ভবলীলা সাঙ্গ হল।

'হনুমান' দেখুন।

সিদ্ধার্থ: দশরথের এক অতি বিশ্বস্ত অমাত্য।

দশরথের মৃত্যুর পর যে-চার দূত ভরত-শত্রুঘ্নকে আনতে কেকয়রাজ্যে গিয়েছিলেন, সিদ্ধার্থ তাঁদের অন্যতম। অন্য তিন দূত হলেন বিজয়, জয়ন্ত আর অশোকনন্দন।

সিদ্ধাশ্রম: সরযূতীরের এক আশ্রম।

ভগবান বিষ্ণু যখন বামনরূপ ধারণ করে এসেছিলেন, তখন এই আশ্রমে বসেই তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করেন তিনি। তাই এই আশ্রমের নাম হয় সিদ্ধাশ্রম।

পরবর্তী কালে বিশ্বামিত্র এখানে তপস্যা করেন। এখানেই তাঁর যজ্ঞভূমি অপবিত্র করে তাঁর তপস্যার ব্যাঘাত ঘটাত মারীচ, সুবাহু আর অন্য রাক্ষসরা। এদের শায়েস্তা করতেই দশরথের কাছ থেকে কিছুদিনের জন্য বালক রামকে এনেছিলেন বিশ্বামিত্র। রাম-লক্ষ্মণ এসে রাক্ষস মেরে এবং তাড়িয়ে, সিদ্ধাশ্রমকে আবার তপস্যার উপযোগী করে তোলেন।

'রাম' এবং 'বিশ্বামিত্র' দেখুন।

সীতা: রামের স্ত্রী। জনকের পালিতা মেয়ে। লব-কুশের মা।

রামায়ণের নায়িকা। জনকের মেয়ে। তাই 'জানকী'। মিথিলার মেয়ে। তাই 'মৈথিলী'। বিদেহের মেয়ে। তাই 'বৈদেহী'। খেতে লাঙলের ফলায় টানা 'সীতায়' এঁকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন বলে জনক এঁর নাম রাখেন 'সীতা'। 'সীতা' মানে লাঙলের দাগ।

মহাদেবের দক্ষযজ্ঞনাশী ধনুক 'সুনাভ' ছিল জনকের কাছে। জনক বললেন, 'সেই হরধনুতে যিনি জ্যা আরোপ করতে পারবেন, তাঁর সঙ্গেই বিয়ে দেব সীতার।'

তেরো বছরের রাম হরধনু ভেঙে ছ' বছরের সীতার মালা জিতে নিলেন। সীতার বোন ঊর্মিলা, মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্তির সঙ্গে বিয়ে হল লক্ষ্মণ, ভরত আর শত্রুঘ্নর।

অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন সীতা। চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রং। টিকোলো নাক। পদ্মের পাপড়ির মতো টানা টানা চোখ। এমন রূপ সে যুগে আর কোনও নারীর ছিল

না। একবার দেখলে চোখ ফেরানো যায় না।

বারো বছর রামের সঙ্গে ঘর করার পর, আঠারো বছর বয়সে পঁচিশ বছরের রামের হাত ধরে সীতাকে বনে যেতে হল। কৈকেয়ীর চক্রান্ত। রাম সঙ্গে নিতে চাননি। সীতা বললেন, 'আপনাকে ছাড়া এক মুহূর্তও আমি বাঁচতে চাই না।'

অত্রিমুনির আশ্রমে মুনির বৃদ্ধা স্ত্রী অনসূয়া সীতাকে দিব্য মালা, কাপড় আর প্রসাধনের অনেক জিনিস দিয়েছেন। সীতাকে আশীর্বাদ করেছেন প্রাণ ভরে।

রাবণের ছলনায় মায়ামৃগের মায়ার ফাঁদে পড়ে রামকে 'সোনার হরিণ' ধরতে পাঠিয়েছেন সীতা।

মায়ামৃগের রাম-কণ্ঠের অনুকরণে 'হা লক্ষ্মণ! হা সীতা! ভাই লক্ষ্মণ! বাঁচাও!' আর্তনাদ শুনে পতিগতপ্রাণা সীতা লক্ষ্মণকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করে পাঠিয়েছেন রামের সন্ধানে।

রাবণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। লক্ষ্মণের সাবধানবাণীর কথা বিস্মৃত হয়েছেন সীতা।

(গণ্ডির কথা বাল্মীকি লেখেননি। লিখেছেন কৃত্তিবাস!)

সাধু-বেশী রাবণকে সরল মনে বিশ্বাস করেছেন সীতা। রাবণ তাঁকে হরণ করেছেন।

পথে জটায়ু রাবণকে আটকাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। সীতা পুষ্পক থেকে তাঁর অলঙ্কার ফেলতে ফেলতে গেছেন।

পঞ্চবটী থেকে রাবণ সীতাকে হরণ করে এনে রেখেছেন লঙ্কার অশোক বনে। সীতা আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন।

দেবতারা দেখলেন, সীতা এ ভাবে দেহ রাখলে তো রাবণবধ হবে না। তাঁরা ইন্দ্রকে পাঠালেন সীতার কাছে। নিদ্রাদেবী সব রাক্ষসকে ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন।

ইন্দ্র সেই সুযোগে দিব্য হবিষ্যান্ন দিলেন সীতাকে। যা খেলে খিদে বা তৃষ্ণা কিছুই থাকে না। ইন্দ্র সীতাকে রাম-লক্ষ্মণের খবর দিলেন।

সীতা আগে রাম-লক্ষ্মণের উদ্দেশে নিবেদন করে, পরে সেই নিবেদিত হবিষ্যান্ন নিজে খেলেন।

রাবণ সীতাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে নানা প্রলোভন দেখালেন।

সীতা ঘৃণা ভরে সে সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে রাবণকে রাক্ষসকুলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিলেন।

রাবণ সীতাকে দু' মাস সময় দিলেন। বললেন, এর মধ্যে সীতা তাঁকে বিয়ে করতে রাজি না হলে রাবণ তাঁকে হত্যা করবেন।

রাক্ষসীরাও রাবণকে পতিরূপে গ্রহণ করার জন্য সীতাকে ভয় দেখাতে লাগল।

সীতা বললেন, 'বরং তোমরা আমাকে খেয়ে ফেলো, সেও ভাল। কিন্তু ও পাপ কথা মুখেও এনো না।'

'শিংশপা' নামে এক গাছে লুকিয়ে থেকে হনুমান সবই দেখছিলেন।

সীতার একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষিণী রাক্ষসী ত্রিজটা অন্য রাক্ষসীদের কাছে তাঁর দেখা দুঃস্বপ্নের কথা বললেন। বললেন, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, রাক্ষসপুরী ধ্বংস হয়েছে। রাম সীতা-উদ্ধার করেছেন। এতে কয়েকজন রাক্ষসী সীতাকে আবার গালিগালাজ

করতে শুরু করলেন।

সীতা নিজের বেণী দিয়ে আত্মহত্যা করতে এলেন সেই শিংশপা গাছের তলায়। 'রাম নাম' শুনে ওপরে তাকিয়ে হনুমানকে দেখতে পেলেন। হনুমান সীতাকে রামের আংটি দিয়ে অভয় দিলেন। সীতা রামকে দেওয়ার জন্য হনুমানকে মাথার 'টিকলি' দিলেন আঁচল থেকে।

হনুমান লঙ্কা পোড়ালেন। রাক্ষসরা তাঁব লেজে আগুন ধরাল। সীতার প্রার্থনায় সে আগুন নিবে গেল হনুমানের লেজ থেকে।

রাবণ সীতাকে রামের 'মায়া মুণ্ড' দেখালে বিভীষণের স্ত্রী সরমা তাঁকে অভয় দিয়েছেন। ইন্দ্রজিতের বাণে অচেতন রাম-লক্ষ্মণকে দেখার জন্য সীতাকে পুষ্পকে করে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছেন রাবণ। সীতা রাম লক্ষ্মণকে মৃত ভেবে কাঁদতে লাগলেন। ত্রিজটা সান্ত্বনা এবং অভয় দিলেন।

মেঘনাদের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে রাবণ ক্ষিপ্ত হয়ে সীতাকে কাটতে গেছেন। অমাত্য সুপার্শ্বের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত ফিরে গেছেন রাবণ।

রাবণের মৃত্যুর পর রামের সন্দেহপূর্ণ কঠোর তিরস্কারে বিদ্ধ হয়ে সীতা লক্ষ্মণকে আগুন জ্বালাতে বললেন। আগুনে প্রবেশ করলেন সীতা।

অগ্নিদেব বললেন, 'সীতা অপাপবিদ্ধা'! রাম সীতাকে গ্রহণ করলেন। সানন্দে। অযোধ্যায় ফিরলেন সকলে।

লোকমুখে কানাঘুষো শুনে সন্তানসম্ভবা সীতাকে পরিত্যাগ করলেন রাম। লক্ষ্মণ তাঁকে রেখে এলেন মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে। মহর্ষি পরম যত্নে এবং শ্রদ্ধায় গ্রহণ করলেন তাঁর কালোত্তীর্ণ মহাকাব্যের নায়িকাকে। সীতা লব-কুশের জন্ম দিলেন। মহর্ষির প্রযত্নে তাঁরা সর্বশাস্ত্রে বিশারদ হয়ে উঠলেন।

সীতা-বিসর্জনের পর বারো বছর কেটে গেছে। 'সোনার সীতা'-কে পাশে নিয়ে রাম 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' করছেন। বাল্মীকির সঙ্গে লব-কুশও এলেন সে যজ্ঞে। দেবনিন্দিত কণ্ঠে রামায়ণ শুনিয়ে সকলকে মুগ্ধ করলেন তাঁরা। রাম চিনতে পেরে তাঁদের বুকে টেনে নিলেন।

সীতাকে আনানো হল। সীতাকে আবার বিশুদ্ধতার প্রমাণ দিতে বললেন রাম। শোকে, দুঃখে, ক্ষোভে, অভিমানে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে সীতা মা বসুন্ধরার কোলে ফিরে গেলেন।

সীতা রামায়ণের সর্বশ্রেষ্ঠা নারী চরিত্র। সীতা যেন সমস্ত রকম ত্যাগ, ধৈর্য, পাতিব্রত্য, পবিত্রতা এবং উদারতার বিমূর্ত মাতৃপ্রতিমা। রাম তাঁর ওপর সুবিচার করেননি। করতে পারেননি। সমাজ আর অপবাদের ভয়ে।

কিন্তু, তিনি নিজের অদৃষ্টকেই দোষারোপ করেছেন। রামকে নয়।

লক্ষ্মণকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। শুধু মায়ামৃগের মায়ায় পড়ে, সাময়িকভাবে বুদ্ধি লোপ পাওয়ায়, লক্ষ্মণকে কিছু কটুকথা বলেছিলেন। স্বামীর প্রাণ রক্ষার্থে। সে জন্য সারাজীবন অনুতাপে দগ্ধ হয়েছেন সীতা।

সীতা যে অত্যন্ত বিদুষী ছিলেন, তা তাঁর বিভিন্ন কথোপকথন থেকেই বোঝা যায়। তবে, তাঁর সব গুণকে ছাপিয়ে গেছে তাঁর সহ্যগুণ। পৃথিবীর মতো সহ্যশক্তি ছিল তাঁর।

আরও তথ্যের জন্য 'রাম' 'জনক', 'লক্ষণ', 'হনুমান', 'বাল্মীকি', 'শত্রুঘ্ন' এবং 'রাবণ' দেখুন।

সীরধ্বজ: জনকের অন্য নাম। 'জনক' দেখুন।

সুকেতু: একজন যক্ষ।
তাড়কা রাক্ষসীর বাবা। মারীচের ঠাকুরদা। ব্রহ্মার বরে হাজার হাতির শক্তি পান ইনি।

সুকেশ: রাবণের মাতৃকুলের এক রাক্ষস। বিদ্যুৎকেশ এবং সালকটঙ্কটার ছেলে। দেববতীর স্বামী। মাল্যবান, সুমালী আর মালীর বাবা। রাবণের মা কৈকসীর ঠাকুরদা।
আরও তথ্যের জন্য 'সালকটঙ্কটা' দেখুন।

সুদক্ষিণা: ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা দিলীপের স্ত্রী। রঘু এবং ভগীরথের মা। অজ-র ঠাকুরমা। দশরথের প্রপিতামহী।
আরও তথ্যের জন্য 'দিলীপ' দেখুন।

সুগ্রীব: বানররাজ। বালীর ছোট ভাই। রাম-ভক্ত। কিষ্কিন্ধ্যার রাজা। অঙ্গদের কাকা। রুমার স্বামী। বউদি (বালীর স্ত্রী) তারাকেও বিয়ে করেছিলেন। এ ছাড়াও অনেক স্ত্রী ছিল।
ঋক্ষরজা একাধারে বালী আর সুগ্রীবের মা এবং বাবা।
(এ বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য 'বালী' এবং 'ঋক্ষরজা' সম্বন্ধে প্রদত্ত তথ্য দেখুন।)
সূর্যের তেজ নারীরূপা ঋক্ষরজার গ্রীবায় (ঘাড়ে) পড়ে। তা থেকেই জন্ম হয় সুগ্রীবের। 'সুগ্রীব' নামও এই কারণেই।
সুগ্রীব, বালীর মতো না হলেও, যথেষ্ট বলশালী এবং বিদ্বান ছিলেন। রামের কাছে সুগ্রীব তাঁর রাজ্য এবং স্ত্রী রুমাকে হারাবার কথা সবিস্তার বলেছেন। কিন্তু, বালীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সুগ্রীব যে বউদি তারাকে বিয়ে করেছেন, সে কথা রামকে বলেননি। কারণ, সুগ্রীব জানতেন, এ কথা জানলে রাম বালীবধে রাজি হবেন না। সুগ্রীবকে রাজ্য পুনরুদ্ধারেও সাহায্য করবেন না।
বালী গুহায় আটকে থাকাকালীন সুগ্রীব রাজা হয়ে হনুমান, নল, নীল, আর তার, এই চারজনকে মন্ত্রী করেন।
সুগ্রীব রামের সঙ্গে চুক্তি করেন, রাম তাঁকে রাজ্য এবং স্ত্রী ফিরিয়ে দিলে তিনিও রামকে সীতা উদ্ধারে সাহায্য করবেন।
বালীবধের পর ('বালী' দেখুন) রাজ্য এবং স্ত্রী ফিরে পেয়ে সুগ্রীব বিলাসে গা ভাসিয়ে দেন। সীতা উদ্ধারের কথা ভুলে যান। লক্ষ্মণের তিরস্কারে তাঁর চেতনা ফেরে।
সুগ্রীব একমাস সময় দিলেন বানরদের। এর মধ্যে সীতার সন্ধান না দিতে পারলে প্রাণদণ্ড।
বিভীষণকে প্রথমে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন সুগ্রীব। এমন কী বন্দি করেও রাখতে চেয়েছিলেন। পরে সে ভুল ভাঙে।

যুদ্ধ আরম্ভের আগে, সুবেল পর্বতের চূড়া থেকে রাবণকে দেখতে পেয়ে এক লাফে রাবণের কাছে পৌঁছেই, রাবণকে ধরাশায়ী করে দেন। রাবণ তখন মায়ার আশ্রয় নিলে, সুগ্রীব পালিয়ে আসেন।

যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন সুগ্রীব। প্রঘস, বিরূপাক্ষ, কুম্ভ, মহোদর ইত্যাদি বীররা তাঁর হাতে প্রাণ দিয়েছেন।

সীতা উদ্ধারের পর রামের সঙ্গে সপারিষদ্ সুগ্রীবও অযোধ্যায় গেছেন।

ভরত তাঁকে 'পঞ্চম ভাই' হিসেবে গ্রহণ করে রামের নিজের থাকবার বাড়িতে তাঁকে থাকতে দিয়েছেন।

রামের মহাপ্রস্থানের সময় সুগ্রীব অঙ্গদকে সিংহাসনে বসিয়ে ছুটে এসেছেন অযোধ্যায়। রামের সঙ্গেই সহমরণে গেছেন।

রামের প্রতি আনুগত্য থাকলেও, দাদার প্রতি অবিচার করেছেন সুগ্রীব। বউদির প্রতিও তাঁর অশোভন দুর্বলতা ছিল। তবে, রামের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং বিশ্বস্ততা ছিল প্রশ্নাতীত।

আরও তথ্যের জন্য 'বালী', 'রাম' এবং 'হনুমান' দেখুন।

সুতীক্ষ্ণ: দণ্ডকারণ্যবাসী, সর্বলোকজয়ী মহাতেজা ঋষি।

মন্দাকিনীর কাছে এঁর আশ্রম ছিল। শরভঙ্গের পরামর্শ মতো, রাম লক্ষ্মণ এবং সীতাকে নিয়ে এঁর আশ্রমে আসেন।

সুতীক্ষ্ণ বললেন, 'দেবরাজ ইন্দ্র এসেছিলেন। কিন্তু, তোমাকে দেখব বলে আমি এই দেহ ত্যাগ করিনি এত কাল। তোমরা এখানেই থেকে যাও।'

রাম এক রাত সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে বাস করে অন্যান্য ঋষিদের আশ্রম দেখার জন্য সীতা আর লক্ষ্মণকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

সুধন্বা: সাঙ্কাশ্যার রাজা।

ইনি সীতা আর হরধনু পেতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মিথিলা আক্রমণ করেন। জনক এঁকে বধ করে ভাই কুশধ্বজকে সাঙ্কাশ্যার রাজা করে দেন।

সুপর্ণ: গরুড়ের অন্য নাম। 'গরুড়' দেখুন।

সুপার্শ্ব (১): এক পাখি।

সম্পাতির ছেলে। জটায়ুর ভাইপো। অরুণ এবং শ্যেনীর নাতি। কশ্যপ এবং বিনতার প্রপৌত্র।

ভাই জটায়ুকে সূর্যের তেজের হাত থেকে বাঁচাতে ডানা মেলে দেন সম্পাতি। তাতে তাঁর নিজেরই ডানা পুড়ে যায়। সম্পাতি পড়ে যান বিন্ধ্য পর্বতে। ছ'দিন পরে তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে।

অক্ষম সম্পাতির জন্য রোজকার খাবার নিয়ে আসতেন সুপার্শ্ব। একদিন সন্ধেবেলা মাংস না নিয়েই ফিরে এলেন সুপার্শ্ব। সম্পাতি যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করলেন ছেলেকে।

সুপার্শ্ব বললেন, 'বাবা! আমি আপনার খাবার আনতে মহেন্দ্র পর্বতে গিয়েছিলাম। সাগর-ফেরা অনেক পাখি ওধার দিয়ে যা[illegible] তাদের শিকার করব বলে ওত পেতে

বসেছিলাম।

'হঠাৎ দেখি, কাজলের মতো কুচকুচে কালো একজন লোক ভোরের সূর্যের মতো উজ্জ্বল রঙের এক পরমা সুন্দরী নারীকে নিয়ে যাচ্ছেন সেই পথে। আপনার খাদ্য হিসেবে তাঁদের ধরতে গেলাম। লোকটি খুব বিনয়ের সঙ্গে তাঁদের ছেড়ে দিতে বলায়, আমি তাঁদের ছেড়ে দিলাম। পরে, আকাশচারী সিদ্ধদের কাছে জানতে পারলাম, যে, লোকটি হলেন লঙ্কেশ্বর রাবণ। আর স্ত্রী-লোকটি হলেন জনকনন্দিনী সীতা।'

রাবণকে বন্দি করে সীতাকে উদ্ধার না করার জন্য সুপার্শ্বকে তিরস্কার করেন সম্পাতি।

সুপার্শ্ব (২): রাবণের এক মামা এবং মন্ত্রী। সুমালী এবং কেতুমতীর ছেলে। কৈকসীর দাদা।

মেঘনাদবধের পর ক্রোধে অন্ধ রাবণ সীতাকে হত্যা করতে গেলে, ইনিই রাবণকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেন। সুপার্শ্ব বলেন, 'এঁকে বধ করে শুধু শুধু স্ত্রী হত্যার পাপ কেন ঘাড়ে নিতে যাচ্ছেন? তার চেয়ে রামকে মেরে এঁকে বিয়ে করে ভোগ করুন।'

সুপার্শ্বর পরামর্শ মনে ধরে রাবণের। সীতা-হত্যার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেন রাবণ।

সুবাহু (১): শত্রুঘ্ন-শ্রুতকীর্তির দুই ছেলের অন্যতম। অন্য ছেলে 'শত্রুঘাতী'। 'সুবাহু-শত্রুঘাতী' দেখুন।

সুবাহু (২): রাবণের অনুচর এক রাক্ষস।

মারীচ আর সুবাহু দলবল নিয়ে নানা রকম মায়ার কৌশলে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ পণ্ড করতেন। যজ্ঞবেদির ওপর রক্ত-মাংস বর্ষণ করতেন। যজ্ঞের সময় শাপ দেওয়া চলে না বলে, বিশ্বামিত্র তাঁদেরকে শাপ দেননি।

এই দুর্বিনীত রাক্ষসদের শায়েস্তা করতে, বিশ্বামিত্র রামকে দশ রাতের জন্য চেয়ে এনেছেন দশরথের কাছ থেকে। সঙ্গে লক্ষ্মণও এসেছেন।

যজ্ঞের ছ' দিনের দিন যজ্ঞবেদির ওপর রক্ত-বৃষ্টি করতে লাগলেন মারীচ, সুবাহু আর তাঁদের অনুচররা। রাম 'মানবাস্ত্র' মেরে মারীচকে একশো যোজন দূরের সমুদ্রে ছুড়ে ফেললেন। 'আগ্নেয়াস্ত্রে' সুবাহুকে আর 'বায়ব্যাস্ত্রে' অন্য রাক্ষসদের মেরে ফেললেন।

সুবাহু (৩): এক বানর সেনাপতি। রামের হয়ে লঙ্কার যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

সুবাহু-শত্রুঘাতী: শত্রুঘ্ন-শ্রুতকীর্তির দুই ছেলে 'সুবাহু' আর 'শত্রুঘাতী'।

লবণাসুরকে বধ করে, শত্রুঘ্ন লবণের রাজ্য 'মধুরা'-কে দু' ভাগে ভাগ করলেন। 'মধুরা' আর 'বিদিশা'। মধুরার রাজ-সিংহাসনে বসালেন সুবাহুকে। আর বিদিশার রাজা করলেন শত্রুঘাতীকে।

সুমতি: ইক্ষ্বাকু বংশের এক রানি।

সগরের অন্যতমা স্ত্রী। কশ্যপের মেয়ে। অন্য মতে, অরিষ্টনেমির মেয়ে। ষাট হাজার ছেলের মা। কেশিনীর সতীন। অসমঞ্জের সৎ মা। গরুড়ের বোন।

ছেলে চেয়ে দুই স্ত্রীকে নিয়ে হিমালয়ে কঠোর তপস্যা করেছিলেন সগর। একশো

বছর পরে ভৃগু বর দিলেন, 'তোমার এক স্ত্রীর গর্ভে একটি ছেলে হবে। তা থেকে তোমার বংশ রক্ষা হবে। আর অন্য স্ত্রীর গর্ভে ষাট হাজার কীর্তিধর ছেলে হবে।'

কেশিনী এক ছেলের, আর সুমতি ষাট হাজার ছেলের বর চেয়ে নিলেন। সেই মতো, কেশিনীর এক ছেলে হল। 'অসমঞ্জ'। এঁর বংশধরদের মাধ্যমে ইক্ষ্বাকু-বংশ রক্ষা পেল।

সুমতি লাউয়ের মতো এক পিণ্ড প্রসব করলেন। তা থেকেই ক্রমে বেরিয়ে এল ষাট হাজার ছেলে। সেই ষাট হাজার ছেলেকে ঘি-ভরা কলসিতে রেখে বড় করা হল। কপিলমুনি এই ষাট হাজার ছেলেকেই ভস্ম করে দিয়েছিলেন। ভগীরথ গঙ্গাকে মর্তে এনে এঁদের উদ্ধার করেন।

'সগর', 'ভগীরথ', 'অসমঞ্জ' এবং 'গঙ্গার মর্তে অবতরণ' দেখুন।

সুমন্ত্র: দশরথের আট মন্ত্রীর অন্যতম। সুমন্ত্র ছিলেন অর্থমন্ত্রী। দশরথের রথও চালাতেন সুমন্ত্র।

রাজপরিবারের যে কোনও সমস্যার সমাধানে বশিষ্ঠ আর সুমন্ত্রের ভূমিকা ছিল প্রশ্নাতীত। সুমন্ত্রের পরামর্শেই, পুত্রেষ্টি যজ্ঞের সময় জামাই ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিয়েছিলেন দশরথ।

কৈকেয়ীর মাও যে তাঁর স্বামীর মৃত্যু চেয়েছিলেন, সুমন্ত্র তা রামের বনযাত্রার সময় প্রকাশ করে দেন। সুমন্ত্র গঙ্গা পর্যন্ত পৌঁছে দেন রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে। সুমন্ত্রও রামের সঙ্গে বনবাসে যেতে চেয়েছিলেন। রাম অনুমতি দেননি। ভরতের সঙ্গে সুমন্ত্রও চিত্রকূটে গেছেন। রামকে ফেরাতে।

সুমন্ত্র রামের মন্ত্রিসভাতেও মন্ত্রী ছিলেন। সুমন্ত্রও সম্ভবত রামের সঙ্গে সহমরণে গিয়ে থাকবেন। অন্তত একশো তিরিশ বছর বেঁচেছিলেন সুমন্ত্র। অবশ্য, বাল্মীকির হিসেবে অনেক বেশি।

আরও তথ্যের জন্য 'রাম' এবং 'দশরথ' দেখুন।

সুমাগধ: রামের বন্ধু এবং বিদূষক-সভাসদ্।

সীতার চরিত্র নিয়ে অযোধ্যার প্রজাদের কানাঘুষোর কথা রামকে প্রথম বলেন ভদ্র। ভদ্রর বক্তব্যকে ইনি সমর্থন করেন। সীতাকে ত্যাগ করেন রাম।

'ভদ্র' দেখুন।

সুমালী: এক বলবান রাক্ষস।

রাবণের দাদামশাই। প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দন্তী, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদ, প্রঘস, ভাসকর্ণ, কুম্ভীনসী, কৈকসী (নিকষা), পুষ্পোৎকটা এবং রাকার বাবা। সুকেশ এবং দেববতীর ছেলে। মাল্যবান এবং মালীর ভাই। কেতুমতীর স্বামী।

মাল্যবান, সুমালী আর মালী—তিন ভাই সুমেরু পর্বতে কঠোর তপস্যা করেন। ব্রহ্মার বরে এঁরা অজেয়, শত্রুহন্তা, চিরজীবী, প্রভুত্বশালী এবং পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে দেবাসুরের ওপর অত্যাচার চালাতে থাকেন। এঁদেরই অনুরোধে ত্রিকূট পাহাড়ের ওপর ইন্দ্রের অমরাবতীর মতোই, অসামান্য সুন্দর লঙ্কাপুরী তৈরি করে দেন বিশ্বকর্মা।

গন্ধর্বী নর্মদার তিন মেয়েকে বিয়ে করেন তিন ভাই। মাল্যবান, সুমালী আর মালী বিয়ে করেন যথাক্রমে সুন্দরী, কেতুমতী আর বসুদাকে।

তিন রাক্ষসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, দেবতা এবং ঋষিরা মহাদেবের শরণ নিলেন।

মহাদেব বললেন, 'আমি তো এদের বধ করতে পারব না। তোমরা বরং বিষ্ণুর কাছে যাও।'

বিষ্ণু বললেন, 'চিন্তা নেই। আমিই এদের বধ করব। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো।'

বিষ্ণুর কাছে তাঁদের নামে নালিশ করার জন্য তিন ভাই বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে চললেন দেবতাদের আক্রমণ করতে।

গরুড়ের মুখে খবর পেয়ে, বিষ্ণু এলেন যুদ্ধ করতে। তাঁর হাতে প্রাণ দিলেন মালী।

সুমালী আর মাল্যবান লঙ্কা ছেড়ে আশ্রয় নিলেন পাতালে। সুযোগ বুঝে লঙ্কা অধিকার করে নিলেন রাবণের সৎ দাদা গন্ধর্বরাজ কুবের।

এর কিছুদিন পরে, সুমালীর নির্দেশে, কৈকসী বিয়ে করলেন বিশ্রবাকে। কৈকসীর ছেলেরা ব্রহ্মার বর পেলে সুমালী তাঁর দৌহিত্র রাবণকে বললেন লঙ্কা অধিকার করতে। রাবণ প্রথমে রাজি হননি। পরে, মামা প্রহস্তের প্ররোচনায়, লঙ্কা অধিকার করেন।

লঙ্কায় রাক্ষস রাজ্য আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখে, খুশি হন সুমালী। রাবণ দেবলোক জয় করতে গেলে, সুমালীও যান তাঁর সঙ্গে। বসু সাবিত্রের গদাপ্রহারে প্রাণ দেন সুমালী।

সুমিত্রা: লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্নের মা। দশরথের দ্বিতীয়া (অন্যমতে, তৃতীয়া) স্ত্রী। মগধরাজের মেয়ে।

কৌশল্যার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন সুমিত্রা। রামকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

রামের সঙ্গে লক্ষ্মণও বনে যেতে চাইলে, সুমিত্রা সানন্দে তাতে সম্মতি দিয়েছেন।বলেছেন, 'রামকে তোমার বাবার মতো, সীতাকে আমার মতো, আর অরণ্যকে এই অযোধ্যার মতো সম্মান করবে।'

রামের জন্য কৌশল্যা যখন শোকে উন্মাদিনী, তখন সুমিত্রা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। বলেছেন, 'দিদি! রাম তো তোমার রত্ন! সে যে পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে যাচ্ছে! তুমি তো রত্নপ্রসবিনী! তুমি কাঁদছ কেন? লক্ষ্মণ আর সীতা যার সঙ্গে আছে, তার জন্য আবার ভয় পাচ্ছ কেন দিদি?'

কৌশল্যার পর সুমিত্রাও দেহত্যাগ করেছেন।

রামায়ণে সুমিত্রা অত্যন্ত অবহেলিতা। তাঁর উল্লেখ যৎসামান্য।

আরও তথ্যের জন্য 'রাম' 'দশরথ' এবং 'লক্ষ্মণ' দেখুন।

সুষেণ: বানর দলপতি। তারার বাবা। বালীর শ্বশুর।

অত্যন্ত দক্ষ শল্য-চিকিৎসক। যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসার ভার ছিল এঁর ওপর। শক্তিশেলে অচৈতন্য লক্ষ্মণের চিকিৎসা ইনিই করেছিলেন। যুদ্ধও করেছেন। বীর রাক্ষস বিদ্যুন্মালী এঁরই হাতে নিহত হন।

সুমুখ (১): এক পাখি। গরুড়ের ছেলে। কশ্যপ এবং বিনতার নাতি।

সুমুখ (২): এক নাগ। নাগরাজ ঐরাবতের বংশে জন্ম এঁর।
চিকুরের ছেলে। আর্যকের নাতি। গুণকেশীর স্বামী। মাতলির জামাই।
মাতলি মেয়ে গুণকেশীর সঙ্গে এঁর বিয়ে দিতে চাইলেন। আর্যক বললেন, 'তা হবার নয়। কারণ, গরুড় আমার ছেলে চিকুরকে খেয়েছেন। বলেছেন, এক মাসের মধ্যেই সুমুখকেও খাবেন।'
মাতলি ইন্দ্রের সারথি। তিনি সুমুখকে নিয়ে এলেন ইন্দ্রের কাছে। বিষ্ণুও তখন ছিলেন সেখানে। বিষ্ণু বললেন, 'ইন্দ্র! সুমুখকে অমৃত খাইয়ে দাও। তা হলেই ও অমর হয়ে যাবে।'
ইন্দ্র কিন্তু সুমুখকে অমৃত খাওয়ালেন না। তবে দীর্ঘায়ু করে দিলেন।
খবর পেয়ে ছুটে এলেন গরুড়। ইন্দ্রকে বললেন, 'এটা কী হল? আপনিই আমাকে নাগদের ধরে ধরে খাওয়ার বর দিয়েছেন। আর এখন আপনিই আবার আমাকে নাগদের খেতে বাধা দিচ্ছেন?'
ইন্দ্র বললেন, 'সুমুখকে অভয় দিয়েছেন আসলে বিষ্ণু। আমি তো নিমিত্ত মাত্র।'
গরুড় নিজের শক্তির কথা ভুলে, বিষ্ণুর কাছে গিয়ে খুব আস্ফালন দেখাতে লাগলেন। বললেন, 'আমি এক ডানাতেই আপনাকে বইতে পারি।'
বিষ্ণু বললেন, 'বেশ! তবে শুধু আমার বাঁ হাতের ভারই বও দেখি। তবে বুঝব তোমার ক্ষমতা।'
বিষ্ণুর বাঁ হাতের ভারে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়লেন গরুড়। মিথ্যে অহঙ্কারের জন্য ক্ষমা চাইলেন বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে সুমুখকে তুলে দিলেন গরুড়ের বুকে। সুমুখকে খাওয়ার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললেন গরুড়।

সুমেরু পর্বত: এক পৌরাণিক পর্বত। সম্ভবত, এখনকার হিন্দুকুশ পর্বত।
বরুণের প্রাসাদ ছিল এর চূড়ায়। সে প্রাসাদ থেকে জ্যোতি বেরোত। মাল্যবান, সুমালী আর মালী এখানে কঠোর তপস্যা করেন। ব্রহ্মার কাছ থেকে বর পান।

সুরভি: স্বর্গের কামধেনু। গোমাতা।
কশ্যপের স্ত্রী। বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনী সহ সমস্ত চতুষ্পদের আদিমাতা। এঁর স্তন থেকে অবিরত দুধ ঝরে পড়ত। সেই দুধ বা ক্ষীরের ধারা থেকেই ক্ষীরোদ সাগরের সৃষ্টি।
দশরথের প্রপিতামহ দিলীপ একবার স্বর্গ থেকে ফেরার পথে সুরভিকে ডিঙিয়ে যান। সুরভি এতে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন। দিলীপকে শাপ দেন, 'আমার মেয়ে নন্দিনীর সেবা করে যদি তাকে তুষ্ট করতে না পারো, তবে তোমার কোনও সন্তান হবে না।'
কুলগুরু বশিষ্ঠের পরামর্শে, স্ত্রী সুদক্ষিণাকে নিয়ে নন্দিনীর সেবা করে, তাঁকে খুশি করেন দিলীপ। নন্দিনীর বরেই রঘু বংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুর জন্ম হয়।
এক মতে, সমুদ্র-মন্থনের সময় ক্ষীরোদ-সমুদ্র থেকে উঠে আসেন সুরভি।
অন্য মতে, প্রজাদের সৃষ্টি করার পর, অমৃত খেয়ে ব্রহ্মা যে ঢেকুর তোলেন, তা

থেকেই সুরভির উৎপত্তি।

কথিত আছে, একবার দুই বলদকে লাঙল টানতে দেখে কেঁদে ফেলেন সুরভি। তাঁর চোখের জল পড়ে ইন্দ্রের গায়ে। ইন্দ্র বুঝতে পারেন, বহু সন্তানের মা হলেও, মায়ের কাছে সন্তান সন্তানই। সবার জন্যই মার প্রাণ কাঁদে।

সুরমা: একজন নাগমাতা।

সাগর-লঙ্ঘনের সময় মৈনাককে স্পর্শ করে হনুমান চলেছেন লঙ্কার পথে।

দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ আর মহর্ষিরা ভাবলেন, হনুমানের শক্তি সত্যি সত্যি কতখানি, তা একবার পরীক্ষা করা দরকার। তাঁরা নাগমাতা সুরমাকে বললেন, 'তুমি ভয়ঙ্করী রাক্ষসী সেজে হনুমানের যাওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করো তো! আমরা পবননন্দনের শক্তি সত্যি সত্যি কতটা, তা একবার পরীক্ষা করতে চাই।'

সুরমা ভয়ঙ্করী রাক্ষসীর রূপ ধরে হনুমানের পথ আগলে দাঁড়ালেন। বললেন, 'দেবতারা আমাকে বলেছেন, তোমাকে খেতে। চটপট আমার মুখে ঢুকে পড়ো তো বাছা! বেশি গোল কোরো না।'

হনুমান বললেন, 'আমি রামের দূত। হনুমান। যাচ্ছি সীতার খোঁজে। তুমি যেখানে থাকো, সেখানেও রামের অধিকার আছে। কাজেই, তোমার উচিত রামকে সাহায্য করা। আমি কথা দিলাম, আমার কাজ শেষ হলে আমি তোমার মুখে ঢুকে পড়ব।'

সুরমা বললেন, 'আগে তো আমার মুখে ঢুকে পড়ো, তারপর না হয় যেখানে যাওয়ার যেয়ো।'

রেগে গেলেন হনুমান। বললেন, 'তবে আমার শরীরটাকে মুখে নেওয়ার মতো বড় হাঁ করো।' বলে হনুমান নিজের শরীরটাকে ফুলিয়ে দশ যোজন (প্রায় ৮০ মাইল) লম্বা করলেন।

সুরমাও মুখের হাঁ করলেন কুড়ি যোজন (প্রায় ১৬০ মাইল) লম্বা।

এ ভাবে, হনুমান নিজের দেহকে বাড়িয়ে ক্রমশ তিরিশ, পঞ্চাশ, সত্তর আর নব্বই যোজন লম্বা করলেন। সুরমাও, হনুমানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, নিজের হাঁ-কে যথাক্রমে চল্লিশ, ষাট, আশি আর একশো যোজন লম্বা করলেন।

হনুমান ক্ষুরধার বুদ্ধি ধরতেন। ঝট করে নিজের শরীরকে একটা বুড়ো আঙুলের মতো ছোট করে তীর বেগে ঢুকে গেলেন সুরমার মুখে। আবার তীর বেগেই বেরিয়ে এলেন।

আকাশে উঠে হনুমান বললেন, 'তোমার কথা রেখেছি। এবার চললাম সীতার কাছে।'

সুরমা খুশি হয়ে বললেন, 'যাও হনুমান! রামের সীতাকে যত তাড়াতাড়ি পারো ফিরিয়ে দাও রামের কাছে।'

সুরা: একজন দেবী। বরুণের মেয়ে।

দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থনের সময় উঠে আসেন সুরা (মদ) দেবী। বরুণের মেয়ে বলে, এঁর অন্য নাম 'বারুণী'।

ক্ষীরোদ সাগর থেকে উঠেই ইনি বলতে থাকেন, 'আমাকে কে নেবেন? আমাকে কে নেবেন?'

দেবতারাই নিলেন সুরাকে। সুরাকে গ্রহণ এবং পান করে দেবতারা হয়ে উঠলেন অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট। সুরাকে গ্রহণ করার জন্যই, দেবতারা হলেন 'সুর'। আর দিতির ছেলেরা, অর্থাৎ দৈত্যেরা, সুরাকে গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করার জন্য, হয়ে গেলেন 'অসুর'।

আরও তথ্যের জন্য 'সমুদ্র-মন্থন' দেখুন।

সূর্য: দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম।

মহর্ষি কশ্যপ এবং দেবমাতা অদিতির ছেলে। মরীচি এবং কলার নাতি। ভগবান ব্রহ্মার প্রপৌত্র। সংজ্ঞার স্বামী। বৈবস্বত মনু, যম এবং যমুনার বাবা। ইক্ষাকু বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইক্ষাকুর ঠাকুরদা। বিশ্বকর্মার জামাই।

অন্যান্য নাম—রবি, ভানু, ভাস্কর, আদিত্য, দিবাকর, দিনমণি, তপন, মার্তণ্ড, অর্যমা, অর্ক, পূষা, সবিতা, সুর, প্রভাকর, বিভাবসু, বিবস্বান্, মিত্র, মিহির ইত্যাদি।

দিনের বেলা গায়ের রং উজ্জ্বল সাদা। এতটাই উজ্জ্বল, যে, খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকানো যায় না। তাকানো উচিতও নয়। উদয় এবং অস্তের সময় জবা ফুলের মতো লাল। তাকানো যায়।

ভোরের সূর্যকে প্রণাম করে ঋষিরা বলতেন—

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥

অর্থাৎ—

'জবা ফুলের মতো লাল, কশ্যপের ছেলে, অতি তেজস্বী, তমোনাশক, সর্বপাপহারী সূর্যদেবকে প্রণাম করি।'

সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে, হুবহু নিজের মতো দেখতে অন্য একটি মেয়েকে সৃষ্টি করলেন সূর্যের স্ত্রী সংজ্ঞা। তার নাম দিলেন 'ছায়া'। ছায়াকে পাঠালেন সূর্যের কাছে। আর নিজে চলে গেলেন উত্তর কুরুবর্ষে। সেখানে নিজে 'স্ত্রী-ঘোড়া' সেজে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

সূর্য প্রথমে সংজ্ঞার চালাকি ধরতে পারেননি। ছায়াকে সংজ্ঞা ভেবে ছায়ার গর্ভে তিনটি সন্তানের জন্ম দিলেন। দুই ছেলে আর এক মেয়ে। বড় ছেলে 'সাবর্ণি মনু'। ছোট ছেলে 'শনি'। আর মেয়ে 'তপতী'।

পরে, সংজ্ঞার চালাকি ধরতে পেরে, সূর্য নিজেও চালাকির আশ্রয় নিলেন। ঘোড়া সেজে গেলেন সংজ্ঞার কাছে। মিলিত হলেন অশ্বিনী রূপিণী সংজ্ঞার সঙ্গে। জন্ম হল দুই 'অশ্বিনী কুমারের'। ঘরে ফিরিয়ে আনলেন সংজ্ঞাকে।

বিশ্বকর্মা মেয়ের কষ্টের কথা ভেবে, সূর্যের শরীরের আট ভাগের এক ভাগ কেটে ফেললেন। সেই টুকরো এসে পড়ল পৃথিবীতে। বিশ্বকর্মা সেই টুকরো থেকে তৈরি করলেন বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, শিবের ত্রিশূল, কার্ত্তিকের তরোয়াল আর অন্যান্য দেবদেবীদের নানারকম অস্ত্রশস্ত্র।

একবার। নারীরূপিণী ঋক্ষরজার অসামান্য রূপে মুগ্ধ হয়ে কামার্ত হওয়ায়, সূর্যের বীর্যপাত হয়। সে বীর্য পড়ে ঋক্ষরজার ঘাড়ে বা গ্রীবায়। তা থেকেই জন্ম হয় সুগ্রীবের। ('ঋক্ষরজা' এবং 'সুগ্রীব' দেখুন)।

দুর্বাসার শিখিয়ে দেওয়া মন্ত্রের শক্তি পরীক্ষা করতে গিয়ে, অবিবাহিতা কুন্তী

কৌতূহলবশত ডাকেন সূর্যকে। কুন্তীর আবেদন নিবেদন অগ্রাহ্য করে সূর্য মিলিত হন কুন্তীর সঙ্গে। জন্ম হয় কর্ণের। লজ্জা ঢাকতে, 'কুমারী-মাতা' কুন্তী জলে ভাসিয়ে দেন সূর্যপুত্র কর্ণকে।

সদ্যোজাত হনুমান সদ্যোদিত লাল সূর্যকে ফল মনে করে খেতে গিয়েছিলেন। সূর্য শিশু হনুমানকে স্নেহের বশে ক্ষমা করেছিলেন। পোড়াননি। ('হনুমান' দেখুন।)

জটায়ু আর সম্পাতি, ইন্দ্রকে জয় করতে, আকাশ পথে যাচ্ছিলেন স্বর্গের দিকে। সূর্যের তেজে ক্লান্ত ভাই জটায়ুকে ছায়া দিতে, নিজের দুই ডানা মেলে ধরেন দাদা সম্পাতি। সম্পাতির দুই ডানাই পুড়ে যায় সূর্যের তাপে। বিন্ধ্যপর্বতে পড়ে যান সম্পাতি। ('জটায়ু' এবং 'সম্পাতি' দেখুন।)

সূর্যলোক জয় করতে এসে রাবণ মামা এবং মন্ত্রী প্রহস্তকে পাঠালেন সূর্যের কাছে। বললেন, 'সূর্যকে বোলো, হয় যুদ্ধ করতে, নয় হার স্বীকার করতে।'

প্রহস্ত সূর্যের বাড়ির দ্বারপাল দণ্ডীকে বললেন রাবণের কথা। দণ্ডী জানালেন সূর্যকে।

সূর্য বললেন, 'দণ্ডী! তুমি যা ভাল মনে করো, তাই করো। হয় রাবণকে হারাও। নয় বলে দাও, যে, আমরা হার মেনে নিচ্ছি।'

দণ্ডী এসে সূর্য যা বলেছেন, তা বললেন রাবণকে। রাবণ নিজেই নিজেকে জয়ী ঘোষণা করে চলে গেলেন। ('রাবণ' দেখুন।)

সূর্যের নাতি ইক্ষ্বাকুর একশো ছেলের এক ছেলে 'বিংশ'-এর বংশে জন্মান রাম। আর অন্য এক ছেলে 'নিমির' বংশে জন্মান জনক। সেই হিসেবে রামের বংশ এবং জনকের বংশ, দুই বংশেরই আদিপুরুষ সূর্যের নাতি ইক্ষ্বাকু। অর্থাৎ, একই সূর্য বংশেরই দুই শাখা 'রঘুবংশ' এবং 'জনক বংশ'।

প্রাচীন জ্যোতিষে, সূর্য নবগ্রহের এক গ্রহ। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে, নক্ষত্র। আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র।

সেতুবন্ধ: ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে লঙ্কার যোগাযোগকারী পৌরাণিক সেতু।

রামের অনুরোধে বিশ্বকর্মার ছেলে নল, রাম, লক্ষ্মণ এবং বানর সেনার সমুদ্রপারের জন্য রামেশ্বর থেকে লঙ্কা পর্যন্ত একশো যোজন (৮০০ মাইল) লম্বা আর দশ যোজন (৮০ মাইল) চওড়া এক অসামান্য সেতু তৈরি করে দেন। মাত্র পাঁচ দিনে।

প্রথম দিনে তৈরি হয় ১৪ যোজন। দ্বিতীয় দিনে ২০ যোজন। তৃতীয় দিনে ২১ যোজন। চতুর্থ দিনে ২২ যোজন। আর পঞ্চম দিনে ২৩ যোজন।

রাম হনুমানের কাঁধে আর লক্ষ্মণ অঙ্গদের কাঁধে চড়ে সাগর পার হন। হাজার কোটি বানর সেনা লাফাতে লাফাতে সেতু পার হয়।

গাছ, পাথর, বালি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল এই মহাসেতু। দেবতা-গন্ধর্ব-সিদ্ধ-মহর্ষিরা আকাশ থেকে সবিস্ময় দেখেছিলেন এই সেতু নির্মাণের মহাকীর্তি। বিভীষণ তাঁর চার সচিবকে নিয়ে গদা হাতে সেতু পাহারা দিয়েছেন।

শাল, অর্জুন, তাল, আম ইত্যাদি গাছ ব্যবহার করা হয়েছিল সেতু বন্ধনে।

আরও তথ্যের জন্য 'রাম' এবং 'নল' দেখুন।

স্বয়ম্প্রভা: একজন তাপসী। ঋষি মেরুসাবর্ণীর মেয়ে। ঋক্ষবিলে ময়দানবের

তৈরি আশ্চর্য প্রাসাদ দেখাশোনা করতেন। সীতার খোঁজে বানররা ভুল করে ঋক্ষবিলে ঢুকে পড়লে, ইনি বানরদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান।

আরও তথ্যের জন্য 'ময় (দানব)' দেখুন।

স্বর্ণমুখী: ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মা। রামের দিদি শান্তার শাশুড়ি। বিভাণ্ডক মুনির স্ত্রী।

স্বর্ণরোমা: জনক বংশের অন্যতম 'জনক' উপাধিধারী রাজা।
সীতার প্রপিতামহ। 'জনক' সীরধ্বজের ঠাকুরদা। হ্রস্বরোমার বাবা।

হনুমান: 'মনোজবং মারুততুল্যবেগং
জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং
শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি ॥'

অর্থাৎ—

'শ্রীরামের দূত, যিনি মন এবং বায়ুর মতোই দ্রুতগামী, বুদ্ধিমানদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি বানরবাহিনীর অধিনায়ক, সেই জিতেন্দ্রিয় পবননন্দনকে অবনতমস্তকে প্রণাম করি।'

সর্বশ্রেষ্ঠ রামভক্ত। পবননন্দন। দশ জন চিরজীবীর এক জন। বানরকুলগৌরব। মহাবীর। হনুমানের মা অঞ্জনা। বাবা কেশরী।

অঞ্জনা পূর্ব জন্মে এক অপ্সরা ছিলেন। ঋষির শাপে বানরকুলে জন্মাতে হয়েছিল।

একদিন অঞ্জনা খুব সেজেগুজে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। পবনদেব তাঁকে দেখে কামার্ত হলেন। পবনদেবের শুধুমাত্র স্পর্শেই, অঞ্জনা মহাবলশালী হনুমানের মা হলেন।

ছোটবেলায়, ভোরের লাল সূর্যকে ফল মনে করে ধরবার জন্য আকাশে লাফ দিলেন হনুমান। আকাশে রাহুকে দেখে, সূর্যকে ছেড়ে রাহুকেই আক্রমণ করলেন। রাহুকে বাঁচাতে এগিয়ে এল ইন্দ্রের ঐরাবত। হনুমান রাহুকে ছেড়ে ঐরাবতকেই ধরলেন।

শিশু হনুমানকে সরাতে ইন্দ্র বজ্র দিয়ে তাঁকে আলতো করে আঘাত করলেন। হনুমান পড়লেন এক পর্বতে। তাঁর বাঁ হনু (চোয়ালের হাড়) ভেঙে গেল। তাই ইন্দ্র নাম দিলেন 'হনুমান'।

ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে হনুমান অচেতন হয়ে পড়ায় পবন রেগে গেলেন। ব্রহ্মা হনুমানকে আবার সুস্থ করে দিলেন।

সব দেবতাদের আশীর্বাদে, অসীম শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠলেন হনুমান। মুনি-ঋষিদের আশ্রমে চলতে লাগল তাঁর নানাবিধ অত্যাচার।

শাপ দিলেন ঋষিরা, 'অনেকদিন শক্তিহীন হয়ে থাকবে। নিজের শক্তি কতটা, তা অন্যে না বলে দিলে জানতে পারবে না।'

বিদ্যা, বুদ্ধি, ভক্তি, বীরত্ব, আনুগত্য সব গুণেরই অসামান্য সমাবেশ ঘটেছিল হনুমানের মধ্যে। একাধারে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ এবং বীরশ্রেষ্ঠ। এ রকম রাজযোটক দেখা যায় না।

হনুমান ছিলেন সুগ্রীবের বন্ধু এবং সচিব। অত্যন্ত পবিত্র জীবনযাপন করতেন হনুমান। আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। হনুমানই সুগ্রীবকে ঋষ্যমূক পর্বতে বাস করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

প্রথম আলাপেই হনুমানের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়েছেন রাম।

সম্পাতির কাছে সীতার সন্ধান পাওয়ার পর জাম্ববানের অনুরোধে এবং অনুপ্রেরণায়, হনুমান মহেন্দ্র পর্বতের চূড়া থেকে এক মহালাফ দিলেন। লঙ্কার দিকে। দশ যোজন (৮০ মাইল) চওড়া আর ত্রিশ যোজন (২৪০ মাইল) লম্বা ছায়া পড়ল তাঁর সমুদ্রের ওপর। একশো যোজন (৮০০ মাইল) পথ অক্লেশেই পার হয়ে হনুমান লঙ্কায় পৌঁছলেন।

হনুমানের বাবার কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন মৈনাক পর্বত। তাই মাথা তুলে হনুমানকে বিশ্রাম দিতে চাইলেন। বিশ্রাম নিলেন না হনুমান। নাগমাতা সুরমা আর রাক্ষসী সিংহিকা হনুমানকে ধরে খাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হনুমানকে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান জানিয়ে এক চড় মারলেন। হনুমান ফিরিয়ে দিলেন এক রাম-ঘুষি।

দেবী বললেন, 'ব্রহ্মা বলেছিলেন, কোনও বানরের হাতে আমার হার হলেই, বুঝতে হবে রাক্ষসকুলের মহাবিপদ উপস্থিত। যাও বীর, তুমি লঙ্কায় প্রবেশ করো।'

লঙ্কায় সীতাকে পাগলের মতো খুঁজতে লাগলেন হনুমান। লঙ্কার ঐশ্বর্য, বিলাস, বাড়ি, রাস্তাঘাট দেখে বিস্মিত হলেন তিনি। ভাবলেন, 'বাবা রে! এ কোথায় এলাম! এ যে ইন্দ্রের অমরাবতীর মতো! ঐশ্বর্য-বিলাসের ছড়াছড়ি!'

অশোক বনে এক শিংশপা (শিশু) গাছে বসে সীতাকে দেখতে পেলেন তিনি। রাক্ষসীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠা সীতা নিজের বেণীবন্ধনে আত্মহত্যা করার চেষ্টায় এলেন সে গাছের তলায়। 'রাম নাম' শুনে চমকে ওপরে তাকাতেই, হনুমানকে দেখলেন সীতা।

সীতাকে রাম-লক্ষ্মণের খবর দিলেন হনুমান। দিলেন রামের আংটি। সীতার কাছ থেকে নিলেন তাঁর মাথার এক 'টিক্‌লি'। আর পেলেন সীতার আশীর্বাদ।

হনুমান তখনই সীতাকে পিঠে করে নিয়ে যেতে চাইলেন রামের কাছে। সঙ্গত কারণেই, সীতা রাজি হননি। রাম ছাড়া অন্য পুরুষকে তিনি স্বেচ্ছায় স্পর্শ করবেন না যে!

এরপর হনুমান লঙ্কা জ্বালিয়েছেন। রাক্ষসরা তাঁর লেজে আগুন দিয়েছে। সীতার প্রার্থনায় সে আগুন নিবেও গেছে।

সীতার খবর নিয়ে হনুমান ফিরে আসায়, রাম-লক্ষ্মণ এবং বানরকুল খুব খুশি হলেন।

যুদ্ধে হনুমানের হাতে প্রাণ দিয়েছেন অসংখ্য রাক্ষস। নাস্তানাবুদ হয়েছেন রাবণ।

যুদ্ধে কখনও ইন্দ্রজিতের, কখনও বা রাবণের অস্ত্রে সংজ্ঞা হারিয়েছেন রাম-লক্ষ্মণ। হনুমান একাধিকবার ঔষধি সমেত গন্ধমাদন পর্বতের গোটা চূড়াটাই তুলে এনেছেন।

হনুমানই সীতাকে যুদ্ধজয়ের সংবাদ শুনিয়েছেন। ভরতকেও রাম-সীতার ফিরে-

আসার খবর দিয়েছেন হনুমান।

সিংহাসনে বসে রাম সীতাকে খুব দামি এক মুক্তোর হার দিয়েছিলেন। সীতা সে হার পরিয়ে দেন হনুমানের গলায়। হনুমানকে বিদায় জানাবার সময় রামও তাঁর বৈদুর্যমণি লাগানো মহামূল্যবান হার নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছেন হনুমানের গলায়।

রামের লীলাসংবরণের সময় হনুমানও তাঁর অনুগামী হতে চেয়েছেন। রাম অনুমোদন করেননি। রাম বলেন, 'যতদিন জগতে রাম-কথা থাকবে, ততদিন তুমি পরমানন্দে এ জগতে থাকো।'

হনুমানের মতো দাস্য ভাব, প্রভুভক্তি, কর্মনিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, বীরত্ব এবং নীতিজ্ঞান জগতে দুর্লভ।

লঙ্কার যুদ্ধে জম্বুমালী, ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, দেবান্তক, ত্রিশিরা, নিকুম্ভ ইত্যাদি রাক্ষসবীররা হনুমানের হাতে প্রাণ দিয়েছেন।

আরও তথ্যের জন্য 'রাম', সুগ্রীব', 'সূর্য', 'অঞ্জনা' এবং 'কেশরী' দেখুন।

হবির্ভূ: একজন ঋষিকন্যা।

রাবণের ঠাকুরমা। রাজর্ষি তৃণবিন্দুর মেয়ে। পুলস্ত্যের স্ত্রী। বিশ্রবার মা। ভগবান ব্রহ্মার পুত্রবধূ। আরও তথ্যের জন্য 'পুলস্ত্য' দেখুন।

হরধনু: বিখ্যাত পৌরাণিক শিবধনু। আসল নাম 'সুনাভ'।

দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করার সময় মহাদেব তাঁর ধনুতে তীর জুড়ে দেবতাদেরও মাথা উড়িয়ে দিতে যাচ্ছিলেন। তখন দেবতারা তাঁর স্তব করলে তিনি তাঁর ওই ধনু দেবতাদের দিয়ে দেন। ওই ধনুই 'হরধনু' (হর=শিব)।

দেবতারা জনকের পূর্বপুরুষ 'দেবরাত'-এর কাছে জমা রাখেন হরধনু। পরে জনক তাঁর বীর্যশুল্কা মেয়ে সীতার পতি নির্বাচনের জন্য ঘোষণা করেন, 'যে এই হরধনু ভাঙতে পারবে, তার গলাতেই সীতা মালা দেবে।'

রাম অবলীলায় এই হরধনু ভেঙে সীতাকে বিয়ে করেছিলেন।

জনকের আদেশে পাঁচ হাজার খুব লম্বা-চওড়া, স্বাস্থ্যবান লোক অতি কষ্টে আট চাকার এক গাড়ি টেনে নিয়ে এল। সেই গাড়ির ওপর এক বিশাল 'লৌহনির্মিত মঞ্জুষায়', অর্থাৎ লোহার সিন্দুকে, রাখা ছিল 'গন্ধমাল্যানুলেপিত', দিব্য হরধনু।

জনক হাত জোড় করে বললেন বিশ্বামিত্রকে, 'মানুষ তো দূরস্থান, সুর, অসুর, রাক্ষস, যক্ষ—কেউই এই দিব্য ধনুতে জ্যা আরোপ করতে পারেনি। একে তুলতেই পারেনি। এতে তীর লাগাতে পারেনি। এর জ্যা ধরে টানতেও পারেনি। হে মুনিবর! আপনি দয়া করে রাজপুত্রদের এই হরধনু দেখান।'

বিশ্বামিত্রের আদেশে, রাম তখন সেই বিশাল ধনুর মাঝখানটা ধরলেন। তারপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে, তাকে অবলীলায় তুলে নিলেন সেই 'মঞ্জুষা' থেকে। অবলীলায় জ্যা আরোপ করলেন। জ্যা ধরে টানলেন।

বাজ পড়ার মতো শব্দ করে হরধনু ভেঙে গেল। বিশাল পর্বত আচমকা ভেঙে পড়লে যেমন ভূমিকম্প হয়, হরধনু ভাঙার শব্দে ঠিক সেই রকমই, ভূমিকম্প হল।

বিশ্বামিত্র, জনক, রাম আর লক্ষ্মণ ছাড়া, বাকি সবাই সেই ভয়ঙ্কর শব্দে আর ভূকম্পনে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

বিস্ময়ে, আনন্দে অধীর হলেন জনক। বললেন, 'মুনিবর! এ কী দেখলাম! আহা! এ যে পরম সৌভাগ্য আমার! আমার সীতা-মার! রামের সঙ্গে সীতার বিয়ে হলে জনক বংশ ধন্য হয়ে যাবে! আপনি দয়া করে অনুমতি দিন মুনিবর! আমার দূতরা অযোধ্যায় যাক। মহারাজ দশরথকে নিয়ে আসুক।'

অনুমতি দিলেন বিশ্বামিত্র। দূত ছুটল অযোধ্যায়।

'রাম', 'সীতা', 'দশরথ', 'জনক' এবং 'বিশ্বামিত্র' দেখুন।

হরিশ্চন্দ্র: সূর্যবংশীয় রাজা। ত্রিশঙ্কুর ছেলে। শৈব্যার স্বামী। রোহিতাশ্বের বাবা।

রাজা হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে দু' রকম কাহিনী প্রচলিত আছে।

১। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে—বরুণের বরে অপুত্রক রাজা হরিশ্চন্দ্রের রোহিতাশ্ব নামে এক ছেলে হয়। বরুণ বলেন, 'এই ছেলেকে আমার কাছে বলি দিতে হবে।'

বলির খবর শুনে পালায় রোহিতাশ্ব। বরুণের শাপে হরিশ্চন্দ্রের পেটে 'উদরী' হল।

বশিষ্ঠ হরিশ্চন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন, 'একটা ছেলে কিনে তাকে বলি দাও।'

হরিশ্চন্দ্র ব্রাহ্মণ 'অজীগর্তের' ছেলে 'শুনঃশেফ'কে কিনলেন। কিন্তু, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কৃপায় শুনঃশেফ প্রাণে বেঁচে গেল।

২। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলছেন—বিশ্বামিত্র এক সিদ্ধিদায়িনী নারীকে পাওয়ার জন্য ধ্যান করছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের জন্য সেই নারী বিশ্বামিত্রের হাতছাড়া হয়ে যায়।

রাগে বিশ্বামিত্র দান হিসেবে দাতা হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্ব নিয়ে, তাঁকে, তাঁর স্ত্রী 'শৈব্যা' আর ছেলে 'রোহিতাশ্ব'কে রাজ্যত্যাগে বাধ্য করেন।

হরিশ্চন্দ্র সপরিবার কাশীতে আসেন। হরিশ্চন্দ্র শৈব্যা আর রোহিতাশ্বকে এক ব্রাহ্মণের কাছে বেচে বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা দেন। তারপর নিজেকে এক চণ্ডালের কাছে বেচে সে পয়সাও বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা দেন।

সর্পাঘাতে রোহিতাশ্ব মারা গেলে, শৈব্যা একাকিনী ছেলের মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে এসে 'কোথায় রাজা হরিশ্চন্দ্র!' বলে বিলাপ করতে থাকেন।

পরস্পরকে চিনতে পারেন রাজা-রানি। ছেলের চিতায় দু'জনেই ঝাঁপ দিতে গেলে চণ্ডালরূপী ধর্ম দেবতাদের এবং বিশ্বামিত্রকে নিয়ে সেখানে এসে হরিশ্চন্দ্রকে স্বর্গলাভের বর দেন। জীবন ফিরে পায় রোহিতাশ্ব। সে রাজা হয়। সস্ত্রীক স্বর্গে যান হরিশ্চন্দ্র।

হ্রস্বরোমা: জনক বংশের এক রাজা। এঁরও উপাধি ছিল 'জনক'।

সীতার ঠাকুরদা। 'জনক' সীরধ্বজের বাবা। স্বর্ণরোমার ছেলে।

পরিশিষ্ট ১

ইক্ষ্বাকু বংশ

(খ্রিস্টাব্দক্রমিক)

নাম	খ্রিস্টপূর্ব	নাম	খ্রিস্টপূর্ব
ইক্ষ্বাকু	৩৭৯৫	রোহিতাশ্ব	৩০২৮
বিকুক্ষি	৩৭৭৭	হরিত	২৯৯২
পরঞ্জয়	৩৭৫৮	চঞ্চু	২৯৫৮
অনেনা	৩৭৩৯	বিজয়	২৯৩৩
পৃথু	৩৭২১	রুরুক	২৯০৯
বিশ্বগম্য	৩৭০২	বৃক	২৮৮৫
আর্দ্র	৩৬৮৩	বাহু	২৮৬১
যুবনাশ্ব	৩৬৬৪	সগর	২৮৩৮
শ্রাবস্ত	৩৬৪৬	অসমঞ্জ	২৮১৪
বৃহদশ্ব	৩৬২৭	অংশুমান	২৭৯০
কুবলয়াশ্ব	৩৬০৮	দিলীপ	২৭৬৬
দৃঢ়াশ্ব	৩৫৯০	ভগীরথ	২৭৪২
বার্যশ্ব	৩৫৭১	শ্রুত	২৭১৯
নিকুম্ভ	৩৫৫২	নাভাগ	২৬৯৫
সংহতাশ্ব	৩৫৩৩	অম্বরীষ	২৬৭১
কৃশাশ্ব	৩৫১৫	সিন্ধুদ্বীপ	২৬৪৭
প্রসেনজিৎ	৩৪৯৬	অযুতাশ্ব	২৬২৩
যুবনাশ্ব	৩৪৭৭	ঋতুপর্ণ	২৬০০
মান্ধাতা	৩৪৫৮	সর্বকাম	২৫৭৬
পুরুকুৎস	৩৪২২	সুদাস	২৫৫২
এসদস্যু	৩৩৮৬	মিত্রসহ	২৫২৮
সম্ভূত	৩৩৫০	অশ্মক	২৫০৪
অনরণ্য	৩৩১৪	—	২৪৮১
পৃষদশ্ব	৩২৭৯	মূলক	২৪৫৮
হর্যশ্ব	৩২৪৩	দশরথ	২৪২৫
সুমনা	৩২০৭	ইলবিল	২৩৯১
ত্রিধন্বা	৩১৭১	—	২৩৫৮
এয্যারুণ	৩১৩৫	বিশ্বসহ	২৩২৫
সত্যব্রত	৩১০০	দিলীপ	২২৯২
হরিশ্চন্দ্র	৩০৬৪	দীর্ঘবাহু	২২৫৮

রঘু	২২২৫
অজ	২১৯২
দশরথ	২১৫৮
রাম	২১২৪
কুশ	২১০০
অতিথি	২০৭৭
নিষধ	২০৫৩
নল	২০৩০
নভ	২০০৬
পুণ্ডরীক	১৯৮২
ক্ষেমধন্বা	১৯৫৯
দেবানীক	১৯৩৫
অহীনগু	১৯১২
রূপ	—
রুরু	—
পারিপাত্র	১৮৮৮
দল	১৮৬৪
ছল	১৮৪১
উক্থ	১৮১৭
বজ্রনাভ	১৭৯৪
শঙ্খনাভ	১৭৭০
কুখিতাশ্ব	১৭৪৬
বিশ্বসহ	১৭২৩
হিরণ্যনাভ	১৬৯৯
পুষ্য	১৬৭৬
ধ্রুবসন্ধি	১৬৫২
সুদর্শন	১৬২৮
অগ্নিবর্ণ	১৬০৫
শীঘ্র	১৫৮১
মরু	১৫৫৮
প্রসুশ্রুত	১৫৩৪
সুগন্ধি	১৫১০
অমর্ষ	১৪৮৭
মহস্বান	১৪৬৩

বিশ্রুতবান	১৪৪০
বৃহদ্বল	১৪১৬
বৃহৎক্ষণ	১৪১৬
গুরুক্ষেপ	১৩৮৬
বৎস	১৩৫৬
বৎসব্যুহ	১৩৩০
প্রতিব্যোম	১৩০৪
দিবাকর	১২৭৭
সহদেব	১২৫১
বৃহদশ্ব	১২২৫
ভানুরথ	১১৯৮
—	—
সুপ্রতীক	১১৭২
মরুদেব	১১৪৬
সুনক্ষত্র	১১১৯
কিন্নর	১০৯৩
অন্তরিক্ষ	১০৬৭
সুবর্ণ	১০৪১
অমিত্রজিৎ	১০১৩
বৃহদ্রাজ	৯৮৬
ধর্মী	৯৬০
কৃতঞ্জয়	৯৩৩
—	—
রণঞ্জয়	৯০৭
সঞ্জয়	৮৮১
শাক্য	৮৫৮
ক্রুদ্ধোদন	৮৩৪
রাতুল	৭৮৪
প্রসেনজিৎ	৭৫৩
ক্ষুদ্রক	৭৩৩
কুণ্ডক	৬৯৩
সুরথ	৬৫৭
সুমিত্র	৬৩৭